বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রথম সংস্করণ, ১৩৬০।

প্রকাশক : শ্রীসরোজনাথ সরকার, এম-এ, বি-এল্।
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

*   *   *

মুদ্রাকর : শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস।
শ্রীপতি প্রেস
১৪, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায়—'সোনার তরী'

'মানসী' পার হইয়া আমরা 'সোনার তরী'তে পৌছিলাম ; এখন হইতে আমাদেরও কেবল দাঁড় বাহিতে হইবে না, পালের জোরেও এই রস-বিচারের ডিঙিখানিতে পারাপার করিতে পারিব। 'মানসী' পর্য্যন্ত কবি-রবীন্দ্র বেশ একটু দোটানার মধ্যে ছিলেন, কবির ব্যক্তি-মানসের তাগিদ তখনও তাঁহার রসদৃষ্টিকে সচ্ছন্দ হইতে দেয় নাই—কবি-প্রেরণাকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছিল ; 'মানসী'র মত কাব্যে, কবিশক্তির পূর্ণবিকাশ-কালেও তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অতঃপর 'সোনার তরী' হইতে যে কাব্যধারা আরম্ভ হইল তাহাতে সেই সব তত্ত্বচিন্তা ও নীতি-সংস্কারকে আর্টের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া কবি সেই আত্মভাবকেই রসোজ্জ্বল করিতে পারিয়াছেন। এখন হইতে কবি-জীবনের যে এক-এক যুগ অতিবাহিত হইবে, তাহাতেও দেখা যাইবে, কবি খাঁটি আর্টিষ্টের মতই রূপের রসসৃষ্টিই কামনা করিয়াছেন, রস-রূপের যত ভঙ্গি ও যত দিক আছে, এবং ভাষা ও ছন্দের কারিগরি যত রকমের হইতে পারে—সেইদিকে তাঁহার কবিপ্রেরণা যেন অনন্যমুখী হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ভুলিলে চলিবেনা যে, ইতিপূর্ব্বে—ঐ 'মানসী'তে পৌছিবারও বহুপূর্ব্বে, কবির কবি-চরিত্রও যেমন, তাঁহার কাব্যমন্ত্রও তেমনই সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা স্বকীয় কবিদৃষ্টি সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, 'মানসী'তে কবি-হৃদয়ের যে গঠন সুগোচর হইয়া উঠিয়াছে, অতঃপর তাহারই অনুরূপ কবি-শক্তির বিকাশ আমরা দেখিতে পাইব। আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের প্রায় আদি হইতেই ভাবাকুলতা ও ভাবুকতার সহিত রসপিপাসার যে দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি, 'মানসী'তে সেই দ্বন্দ্ব আরও সুস্পষ্ট ; তার কারণ, তখন কবি শক্তিরও সমধিক স্ফুরণ হইয়াছে। 'সোনার তরী' হইতে কবির রসপিপাসাই জয়ী হইয়াছে, তাহার একমাত্র হেতু—এতদিনে কবি সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কবি-জীবনের এই লগ্নটির কথা কবি নিজেই এই 'সোনার তরী'রই একটি কবিতায় বড় সুন্দর ও যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

> "সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে
> চমকিয়া হেরিলাম, খেলাক্ষেত্র হ'তে
> কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে,
> আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
> বসি' আছ মহিষীর মত"—ইত্যাদি।
>
> ['মানসসুন্দরী']

আমরাও এখন হইতে তাঁহার "স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হ'তে রণিয়া রণিয়া" যে সঙ্গীত-তান উঠিবে তাহাই মুগ্ধচিত্তে শুনিব।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়া কবিমানসের ভাব-ভূমি পরিদর্শন করা যাইতে পারে, যথা—

(১) মানবিকতা ও মর্ত্ত্যপ্রীতি ; যেমন—'বৈষ্ণব কবিতা', 'আকাশের চাঁদ', 'যেতে নাহি

দিব', 'প্রতীক্ষা', 'গানভঙ্গ', 'পুরস্কার', 'অক্ষমা', 'দরিদ্রা' ও 'আত্মসমর্পণ'। সবগুলি 'সঞ্চয়িতা'য় নাই, যাহা আছে তাহাতেই উহার পরিচয় পাওয়া যাইবে ; যদিও 'বৈষ্ণব কবিতা' ও 'প্রতীক্ষা'র মত কবিতা যে কেন বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সহজ বুদ্ধির অগম্য। "প্রতীক্ষা" কবিতাটির উল্লেখ পূর্ব্বে একাধিক প্রসঙ্গে করিয়াছি, ঐ কবিতাটি প্রবীণ কবির কবি-ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়াই বোধ হয় জাতিচ্যুত হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মূল সুর—ধরার সৌন্দর্য্য ও মানবহৃদয়ের মাধুরী, এক অপরকে যে মহিমায় মণ্ডিত করে তাহারই গৌরব-গীতি। ঐ একটি সুর কবিতা-গুলিতে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিতে প্রবাহিত হইয়াছে ; মানবহৃদয়ের সেই মাধুরী-পিপাসাই ধরার সকল দৈন্য দূর করিয়াছে ; তাহাই ধরণী ও আকাশকে উদাস করিয়া তোলে, জড়কে চেতন করে, তুচ্ছকে মহার্ঘ, এবং নশ্বরকে অবিনশ্বর করে।

(২) কবি-স্বপ্ন ও কবি-জীবন ; যেমন—'সোনার তরী', 'শৈশব-সন্ধ্যা', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'বর্ষাযাপন', 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'মানস-সুন্দরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। এগুলিতে একদিকে যেমন কবির নিজ হৃদয়ের ভাবনা-সংশয়, আনন্দ-বিষাদ, আত্মজিজ্ঞাসা ও সুখ-দুঃখের নিবেদন আছে, তেমনই অপর কয়েকটিতে কবির কবিধর্ম্মের প্রত্যয়ানন্দ কোথাও ছবিতে, কোথাও রূপকে, কোথাও বা ভাবনার আকারে দীর্ঘচ্ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু সর্ব্বত্র কাব্য-রসোল্লাস আছে—সবগুলিই খাঁটি কবি-কাহিনী, কবি যেন একটি স্ব-তন্ত্র কাব্যজগতে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি এ কাব্যে কবি-মানসের সেই দ্বৈধ ঘুচিয়াছে।

৩। রূপক-কবিতা ; যেমন—'সোনার তরী', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'হিং টিং ছট্', 'পরশ-পাথর', 'বিম্ববতী', 'দুই পাখী', 'ঝুলন', 'হৃদয়-যমুনা', 'আকাশের চাঁদ', 'অনাদৃত', 'দেউল', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। এগুলি শুধুই ভাবকল্পনার দিক দিয়া নয়—রচনা-রীতি হিসাবে একটা পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। সবগুলি 'সঞ্চয়িতা'য় নাই—যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট। এই ধরণের কবিতাকে 'সোনার তরী'র একটি বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে ; এমন কবিতা রবীন্দ্রনাথ পরেও লিখিয়াছেন, বোধ হয় সব কাব্যেই কোন-না-কোন ভঙ্গিতে তাহা মিলিবে ; কিন্তু 'সোনার তরী'তে ইহার আধিক্য দেখা যায়। কবিমানসের বিকাশ হিসাবেও এইরূপ কবিতার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। রূপক-কবিতার কবিকল্পনা কোন একটি তত্ত্বকে বা ভাবগত সত্যকে একটি বিশেষ ঘটনা বা চরিত্রে রূপময় করিয়া তোলে ; অথবা, যাহা কিছু বাহির হইতে কবি-চিত্ত স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ তাহা একটা বৃহত্তর ভাব-সত্যের symbol হইয়া উঠে—সেই রূপই রূপক হইয়া উঠে। ইহাও একপ্রকার সৃষ্টি ; ভাব ও রূপের এই সাজুয্য-বিধান রবীন্দ্র-কবিমানসের পক্ষে যে এমন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহার কারণ—সেই মানস স্বভাবতঃই Universal-এর পক্ষপাতী ; একণে তাহাতে রস-কল্পনা যুক্ত হইয়াছে, তাই নির্ব্বিশেষের রস-পিপাসা Particular-কে আশ্রয় করিয়াই তৃপ্ত হইতে চায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের অফুরন্ত উপমা-সম্পদ, এবং কবির শেষ বয়সের রূপক-নাট্যগুলিও স্মরণীয়।

৪। জীবন-দর্শন (Criticism of Life) ; যেমন—'সোনার বাঁধন', 'তোমরা ও আমরা', 'বিশ্বনৃত্য', 'মায়াবাদ', 'খেলা', 'বন্ধন' প্রভৃতি। এগুলি 'সঞ্চয়িতা'য় নাই ; তার কারণ

বোধ হয় এই যে, প্রথমতঃ, এগুলিতে ভাবদৃষ্টির মৌলিকতা, বা কল্পনার তেমন প্রসার নাই; দ্বিতীয়তঃ, পরে এই সকল ভাব রবীন্দ্রকাব্যে আরও গভীর ও অনবদ্য কাব্যশ্রী লাভ করিয়াছে। ইহাও মর্ত্ত্যপ্রীতির আরেক দিক; কেবল ভাবুকতা বা রসাবেশ নয়—মানবজীবন-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় উহাতে আছে।

৫। 'মানসী'র জের; যেমন—'দুর্বোধ', 'লজ্জা', 'প্রত্যাখ্যান' প্রভৃতি প্রেম-বিষয়ক কবিতা। এ ধরণের কবিতার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। এইবার কাব্যপাঠ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

সোনার তরী

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটির অর্থ লইয়া একদা বাংলার সাহিত্যিক-সমাজে একটা ঝড় বহিয়াছিল। একজন বলিয়াছিলেন, কবিতাটি শুধুই দুর্ব্বোধ্য নয়—অর্থহীন, তার কারণ, ইহার ঐ পরিবেশ সম্পূর্ণ অবাস্তব, যেমন—শ্রাবণমাসে কোথাও ধান পাকে না, কাটাও হয় না। আরও হাস্যকর বর্ণনা আছে, যেমন—গ্রাম যদি মেঘে-ঢাকাই হয়, তবে 'মসীমাখা তরুছায়া' দেখা যাইবে কেমন করিয়া? আবার নৌকা যখন 'ভরা পালে' চলিতে থাকে তখন দাঁড় বাহিতে হয় না, কিন্তু উহাতে 'তরী-বাওয়া'র কথাও আছে। এইরূপ অনেক দোষ-দর্শন—যাহাকে 'verbal criticism' বলে, সেইরূপ সমালোচনার বাড়াবাড়ি তাহাতে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল এই যে, ঐ শেষের ঘটনাটির কোন অর্থ হয় না। অতএব ঐ কবিতার সকলই অস্বাভাবিক, উহা একটা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী ছাড়া আর কিছু নয়।

ঐ অভিযোগগুলা যদি সত্যও হয়, তথাপি একটা বড় রহস্য এই যে, তৎসত্ত্বেও ইহার একটি সত্যকার রস-সংবেদনা আছে—হেঁয়ালীর আকারেই উহা আমাদের মনে রসসঞ্চার করে। তাহার কারণ, এ কবিতার একটি অর্থাতিরিক্ত ভাব-ব্যঞ্জনা আছে, কয়েকটি টুকরা-চিত্র এবং ভাবের চকিত চমক—আমাদের চিত্তে একপ্রকার রসোদ্রেক করে, তাহাতেই কবির অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু শুধু রসসৃষ্টি নয়—উহার একটা অর্থও আছে, কবিহৃদয়ের একটা বিশেষ আকুতি উহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সেকালের সেই বাদ-বিতর্কে যাঁহারা কবির পক্ষ সমর্থন করিয়া কবিতার একটি অর্থনির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কিন্তু ঐ কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ রসবোধ ভাবুকতা, ও পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। একজন ঐ প্রাকৃতিক চিত্রের ব্যাখ্যা করিতে—'সোনামুখী' নামে এক ধান্য, এবং তাহা যে ঐ সময়েই কাটা হয়—এই তথ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন; অপর একজন বলিয়াছিলেন—'তরু-ছায়া' অর্থে, তরুর 'ছায়া' নয়—তরুশ্রেণীর দৃশ্যমান 'রূপ' বুঝিতে হইবে; এইরূপ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে তিনি সংস্কৃত শব্দকোষের সাক্ষ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন—'ছায়া' অর্থে শুধুই 'প্রতিবিম্ব' বা 'অনাতপ' নয়, 'কান্তি'ও বুঝায়। কিন্তু উহার ঐ মূল ঘটনাটি—নৌকার উপরে সব ধান তুলিয়া দিয়া

কৃষক শেষে নিজেও তাহাতে পার হইতে চাহিল, এবং স্থানাভাবের জন্য সেইখানেই পড়িয়া রহিল—ইহার ব্যাখ্যা করিতে 'গীতা'র শ্লোক—'কর্ম্মফলত্যাগ' প্রভৃতির নজির উদ্ধৃত হইয়াছিল। এইসব কারণে, কবিতাটি সেকালের পাঠকবর্গকে আশ্বস্ত না করিয়া, বরং বেশ একটু সন্ত্রস্ত করিয়াছিল,—উহার ব্যাখ্যা যে সহজ নয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

রচনার দোষ বা গুণ এই যে, উহাতে একটা রূপকের ঠাট আছে—অথচ সেই রূপক সর্ব্বাংশে একটা 'রূপ' হইয়া উঠে নাই। কবিমানসের একটা ভাবময় situation বা অন্তর-সঙ্কট, বাহিরের ছবির ভাষায় নাট্যীকৃত হইতে চাহিয়াছে; কিন্তু সেই ছবিও ছবি না হইয়া ইঙ্গিতময় হইয়াছে—ছবির দিক দিয়াও একটা পৃথক অর্থ-সম্পূর্ণতা উহাতে নাই। তার কারণ, উহার যতকিছু উপকরণ—কবি সেই ভিতরের ভাবটার প্রয়োজনে উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহার ঐ চিত্রগুলি ভিতরের সেই ভাবটির একটা সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশমাত্র; এইরূপ রচনার স্বপক্ষে এমনও বলা যাইতে পারে—

"Sensible things alone can be expressed fully and directly by sensible terms. Symbols and parable, and metaphors—which are parables on a small scale—are the only means of adequately conveying, or rather hinting, supersensual knowledge." [Herbert Read].

অতএব ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে—কবির আত্ম-হৃদয়ের সেই অর্দ্ধব্যক্ত ভাবটি ধরিতে হইলে—কবিজীবন ও কবিমানসের দিকে তাকাইতে হইবে; রূপক বলিয়া উহার একটা সাধারণ অর্থ করিলেই চলিবে না—কবি নিজেও উহার সেইরূপ একটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে—পরে তাহা উদ্ধৃত করিব, কিন্তু সেই ব্যাখ্যাও আমরা গ্রহণ করিব না, তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রথমেই দেখা যাইবে, এই কবিতা রচিত হইয়াছিল—কবিজীবনের একটি বিশেষ লগ্নে, তখন কবির মনে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে। সে অবস্থা এইরূপ। জীবনের রঙ্গভূমি হইতে দূরে বাস করিয়া, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে তিনি এতদিন ধরিয়া কবিতার যে ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন সেই ফসল এক্ষণে পাকিয়াছে, এবং একটা কবি-জীবনের পক্ষে তাহা অল্প নহে। এই 'সোনার তরী'-কাব্যেই একাধিক কবিতায় কবির কাব্য-কল্পনার অসীমতা এবং তজ্জন্য ক্লান্তিবোধ ও সমাপ্তি-কামনা আছে। এখন সেই মানব-সংসারে ফিরিয়া সেইখানে বাস করিবার কামনা বড়ই বলবতী হইয়াছে, কিন্তু ঐ সোনার ধানগুলির কি হইবে? কে বা তাঁহাকে সেই 'বাঁকা-জল'-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষেতখানি হইতে ওপারের গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবে? এই যে মনোভাব, এবং তাহার ফলে ঐ আকাঙ্ক্ষা—ইহার খুব সহজ ব্যাখ্যা কবির সেইকালের অন্তর-ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে 'এবার ফিরাও মোরে' পর্য্যন্ত, কবির ঐ কামনা যে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্ততঃ মাঝে মাঝে তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তারপর, 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', এবং এই 'সোনার তরী'র কাব্যধারায় একটা ক্রম-পরিণতি ও পূর্ণতার লক্ষণ আছে; সে বিষয়ে কবিও আত্ম-মানসে আশ্বস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার অপর দিকও আছে; কবি সেই কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিরূপ

নিঃসঙ্গ—ইহার পরেও কতকাল তাঁহার সেই অবস্থায় কাটিয়াছে, তাহা আমরা জানি। তাই মাঝে মাঝে বড অবসাদ বোধ হয়; একদিকে যেমন নিজের সেই কবিধর্ম্ম ও কবিকর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যয় হইয়াছে—কালস্রোতে তাহা ডুবিয়া যাইবে না, 'সোনার তরী'তে অর্থাৎ কালজয়ী যশের তরণীতে তাঁহার কবিতাও স্থান পাইবে—এ ভরসাও যেমন আছে, তেমনই, অপরদিকে 'গগনে গরজে মেঘ' এবং 'চারিদিকে বাঁকাজল'—কবিকে বড়ই নিরুৎসাহ করিয়াছে। 'মেঘগর্জ্জন' অর্থে ঋতুর প্রতিকূলতা—অর্থাৎ, ঐ কাব্য ঐ কালের ঐ সমাজে অচল, অথচ—'একাকী গায়কের নহে তো গান, গায়িতে হবে দুইজনে' এবং 'যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে'। 'বাঁকাজল' অর্থেও তাহাই, অর্থাৎ 'বক্র-কুটিল সমালোচনা'। এই অবস্থাই কবির পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছে। কবি একদা আর এক বড় প্রতিভার সম্বন্ধে এই যে বলিয়াছিলেন—

'সহায়তা নাই কৃতজ্ঞতা নাই, কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য্য ও উপবাস সহিষ্ণু অকাতর অনুরাগে চিরজীবন একাকী কাজ করিয়া যাইতে হইবে।'

['বঙ্কিমচন্দ্র'—আধুনিক সাহিত্য]

—তাহা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনেকদিন পর্য্যন্ত—সে প্রতিভার মধ্যাহ্ন ব্যাপিয়া অতিশয় সত্য ছিল, বস্তুতঃ যাঁহারাই অনন্যব্রত হইয়া শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক সাধনার দ্বারা এ সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও ভাগ্যে এ সমাজে কোন সমাদর বা পুরস্কার-লাভ ঘটে নাই। এ কবিতার প্রথম অংশে কবি রবীন্দ্রের কবি-জীবনে একটা সংকট-লগ্ন ও তজ্জনিত মনোভাব ঐরূপ একটি চিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত কবিতার যে ব্যাখ্যা, তাহা কবির বাহিরের জীবন হইতেই আমরা নির্ণয় করিতে পারি, ইহার পরে যে ঘটনা উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কবির নিজ-অন্তরের ইতিহাস। তাহারও ব্যাখ্যা দুরূহ নহে। সেই অবস্থায় কবি স্বপ্ন দেখিতেছেন—ইংরেজীতে যাহাকে বলে "Reverie"। "সোনার তরী" বাহিয়া ঐ যে পুরুষটি'কে আসিতে দেখিতেছেন, এবং 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'—উনি তাঁহার অন্তরের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—যিনি কখনো নারী, কখনো পুরুষের রূপে কবির হৃদয়াসনে বসিয়া তাঁহার সমগ্র কবি-চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ ও কাব্যরচনায় প্রেরিত করেন; এই দেবতাকেই কবি তাঁহার কবি জীবনের আদি হইতে কখনো ভিতরে, কখনো বাহিরে বরণ ও বন্দনা করিয়াছেন। আজ তাঁহাকেই তিনি ঐ নূতন রূপে—যাহা তাঁহারই দান তাহারই গ্রহীতারূপে—দেখিতে পাইলেন। ঐ অকাল-বৈরাগ্য ও অবসাদের অবস্থায় তিনি যখন তাঁহার সেই কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে, এবং সেই বহুযত্ন ও বহুসাধনার পরিপক্ব কাব্য-ফসলগুলিকে কাহারও জিম্মায় রাখিয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন, তখন স্বপ্নে সেই বাসনা যতটুকু যেভাবে পূর্ণ হইতে দেখিলেন, তাহা একটি চমৎকার নাটকীয় ভঙ্গি ধারণ করিয়াছে। নাটকীয় ভঙ্গি বলিলাম আরও এইজন্য যে, উহাতে কবির যেন নিজস্ব কোন অভিপ্রায় বা সজ্ঞান-প্রেরণা নাই—তাহার অর্থ তিনি সবটা নিজেও বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় ও নিরাশ্বস্ত হইয়াছেন, কবিতাটির ঐ অংশ এই কারণেই হেঁয়ালীর মত হইতে

বাধ্য। তাহাতে যে গৌরবময় সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত আছে, তাহা যেন কবিরও অজ্ঞাতসারে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাও নূতন নহে; নিজ কবি-জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার যে আশ্চর্য্য foreknowledge বা পূর্ব্ব-জ্ঞানের পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে একাধিক কবিতায় পাইয়াছি—এই 'সোনার তরী'তেও আরেকটি তেমন কবিতা আছে—এখানে ঐ রূপকটির ব্যাখ্যায় তাহাই পাইতেছি; সে ব্যাখ্যা এই।

কবির কাব্যকীর্ত্তির ঐ সাফল্যবোধ সত্য; যিনি সেই কাব্যের প্রেরয়িতা তিনি 'সোনার তরী'তে তাহা তুলিয়া লইলেন। স্বপ্নের এই অংশে কবির আত্মাভিমান চরিতার্থ হইয়াছে। তারপর, সেই তরণীর কর্ণধাররূপী—কবিরই সেই অন্তর-পুরুষ তাঁহার অপর কামনা পূর্ণ করিলেন না—সেই তরীতে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে সেই ফসলের ক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিলেন না। সেই পুরুষ কবিকে—যে অজুহাতেই হোক—ঐ যে উদ্ধার করিলেন না, তাহার অর্থ, তিনি তাঁহাকে ছুটি দিলেন না, প্রকারান্তরে জানাইয়া গেলেন যে, এখনও ঐ ক্ষেত্রখানিতে তাঁহাকে বহুতর ও মহার্ঘতর ফসল ফলাইতে হইবে,- এখনি ছুটি কোথায়? কবি নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন—

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

['ভাষা ও ছন্দ']

অতএব কবিকে সেই পুরুষ যেন বলিয়া গেলেন—

"Say not now thy task is ended,
Sing the lovely, pure and true,
Sing until thy song is blended
With the song for ever new."

কবি তখন তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঐ যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

--ঐ মোহ ভবিষ্যৎ গৌরবের এতবড় ইঙ্গিত সত্ত্বেও, সাময়িক হৃদয়-বৈকল্যের ঐ বিমূঢ়তা—কি সুন্দর হইয়াছে! এই কবিতায় যাহার গূঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, কবি যেন তাহা নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্যই কবিতাটি হেঁয়ালীর আকার ধারণ করিয়াছে, এবং ঐ রূপকটিও নানারূপ ব্যাখ্যা—বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরাম-স্থল হইয়াছে। কবি নিজেও তেমন ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, তাহার কারণ দুইটি; প্রথমতঃ, ঐ কবিতা লিখিবার কালে তাঁহার কবিজীবনের যে মানস-সঙ্কট ছিল, পরে তাহা ঘুচিয়াছে, অথবা সেই ভাবাবস্থার কোন মূল্য তখন আর নাই; দ্বিতীয়তঃ, সেইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা—কবিতার যেমনই হোক—কবির তত্ত্বদৃষ্টির গৌরব বৃদ্ধি পায়। কবির সেই ব্যাখ্যা এইরূপ—

"মানুষ সমস্ত জীবন ধ'রে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে...। [ঐ 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত'—'সীমা' ও 'অসীমা'র মত—রবীন্দ্রীয় ফিলজফির দুইটি মূল্যবান তত্ত্ব।] যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকুর তলিয়ে যাবার সময় হ'ল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্ম্মের যেটুকু নিত্যফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই ক'রে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে, ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে—তোমার জন্তে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার কি হবে? তোমার জীবনের ফসল যা' কিছু তা' সমস্তই রাখবো, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।"

এই তত্ত্বটি আমাদের এই আধ্যাত্মিক জল-বায়ুর দেশে নূতন নয়; তবু ঐরূপ গভীর অর্থ না করিয়া আরও সহজ ও বালকবোধ্য অর্থও করা যায়, যথা—"কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি"; অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তি-জীবনের কোন চিহ্ন সংসারে বেশিদিন থাকে না, কিন্তু তাহার কীর্ত্তিকে—সেই চাষের 'নিত্য-ফল'টাকে—সংসার সযত্নে রক্ষা করে। কিন্তু তেমন ব্যাখ্যাতেও একটা ছিদ্র থাকিয়া যায়—ঐ 'নিত্য-ফল'টার সহিত সেই ফল-উৎপাদনকারীর নামটা অন্ততঃ টিকিয়া থাকে; অতএব তেমন মানুষের অতখানি আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন হয় না। কবির ঐ ব্যাখ্যাটি আরও গভীর হইলেও, তাহা ঐ কবিতাটির সর্ব্বাংশে সমান খাপ খায় না, 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্তে'র তত্ত্ব, এবং সংসারের ঐ কঠিন নিয়ম কবিতাটিতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকিলেও, ঐ যে 'পুরুষ'—যাহাকে 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'—ঐ পুরুষ কে? উনি কবিরই নিজস্ব ধ্যানলব্ধ কোন ইষ্ট-বিগ্রহ, না সকল মানুষেরই ইহ-জীবনের নিয়ন্তা—বিধাতাপুরুষ বা ভগবান? যদি তেমন কেহও হন, তথাপি এ কবিতায় কবি কি সেই পুরুষকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়া স্বতন্ত্রভাবে বরণ করিতেছেন না? নহিলে তাঁহার কাব্যের 'জীবন-দেবতা'-নামক পুরুষটি কে? সেই 'জীবন-দেবতা' কি সকলের সহিত ঐ একভাবে লীলা করিয়া থাকেন? এই কবিতার কবিকৃত ঐ ব্যাখ্যা এবং আমার এই ব্যাখ্যা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—একটিতে কবিতার উপরে একটা বাহিরের তত্ত্ব আরোপ করা হইয়াছে, এবং অপরটিতে কবিতার মধ্যেই কবিতার অর্থসন্ধান আছে। এই কারণেই আমি গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছি যে, আমি কবিতা পাঠ করিব—কবিকে পাঠ করিব না, এবং কবিতার ব্যাখ্যা কবিতার মুখেই শুনিব—কবির মুখে নয়।

এই কবিতার এইরূপ বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল—নতুবা শেষ পর্য্যন্ত ইহা একটি রবীন্দ্র-কূট হইয়াই থাকিবে। আমি ইহার ঐ কাব্যোচিত ব্যাখ্যাটি বহুপূর্ব্বেই করিয়াছিলাম, এবং স্বর্গত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, তাঁহার প্রয়োজনে দান করিয়াছিলাম—তিনি তখন তাঁহার বিখ্যাত 'রবিরশ্মি' সংকলন ও বিকলন করিতেছিলেন। আমার ঐ ব্যাখ্যাটি, মায় ঐ ইংরেজী কবিতার পংক্তিগুলি—তিনি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার নামটা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ বাধ্য হইয়াই আমাকে ইহা উল্লেখ করিতে হইল, নতুবা আমাকেই পরদ্রব্য-অপহরণের পাপভাক্ হইতে হয়।

কবিতা-পাঠ

এই কবিতার ছন্দ লক্ষণীয়; স্তবকের ঐ গঠন এবং ঐ ১৩ মাত্রার চরণ (৮ + ৫) ভাবের উপযোগী একটি সুর উহাতে যুক্ত করিয়াছে। কবি আরেকটি মাত্র কবিতা এই ছন্দে রচনা করিয়াছেন, তাহাও এই কাব্যেরই কবিতা, নাম—'অনাদৃত', 'সঞ্চয়িতা'য় নাই। তাহাতেও দেখা যায়, দুই কবিতার মধ্যে একটা ভাব-সাদৃশ্য আছে, সেই কারণেই ছন্দ এক-রূপ হইয়াছে; কবিতাপাঠ-কালে সেই কবিতাটির প্রসঙ্গও আবশ্যক হইবে।

কাটিতে কাটিতে ধান। 'কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ।

বাঁকাজল করিছে খেলা। এখানে 'বাঁকা' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে; 'নদী বাঁকিয়া উহাকে বেষ্টন করিয়াছে'—এমন অর্থও করা যায় বটে, কিন্তু ভিতরকার অর্থ—'কুটিল, বক্র, প্রতিকূল'। 'কবিতা প্রসঙ্গ' দেখ।

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা, ইত্যাদি। তাই বড় সুন্দর; ঐ মেঘ প্রাণে স্বজন-বিরহ জাগায়; জলবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষেতখানিতে নির্ব্বাসিত অবস্থায় পরপারের ঐ গ্রাম 'অলকা'-স্বপ্নের মত। 'তরুছায়া মসীমাখা'—কবিতা-প্রসঙ্গ দেখ।

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। অনেকের মতে, এই কবিতায় কবির 'জীবন-দেবতা'র প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। 'জীবন-দেবতা' নামটি এখনও তৈয়ারী হয় নাই, আরও পরে 'চিত্রা'য় ঐ নামটি পাওয়া যাইবে। এই 'জীবন-দেবতা' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের একটা নূতন তত্ত্ব নয়—একটি একই ভাবের ক্রম-পরিস্ফুট বিকাশমাত্র; আমি 'প্রথম পর্ব্বে' ইহার সবিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। অতএব, ঐ যে "মনে হয় চিনি উহারে" তার কারণ, কবির অন্তরে উহা চিরদিন বাস করিয়াছে; তিনি চিরদিনই তাঁহার ব্যক্তি-আমিটার উপরে একটা পৃথক 'কবি-আমি'র—সমগ্র কবি-জীবনের নিয়ন্ত্রী এক অপরা-শক্তির—অধিষ্ঠান অনুভব করিয়াছেন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ('প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য), আত্মভাব-সাধনার সহায়রূপে এইরূপ এক ইষ্টমূর্ত্তির স্থাপনা কবি বিহারীলালেই সর্ব্বপ্রথম দেখা দিয়াছে; বিহারীলালের পর রবীন্দ্রনাথ সেই সাধন-পন্থাকে আপনার মত করিয়া লইয়াছেন। ইহা কবিদের 'সরস্বতী' নয়—কাব্যেরই অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পিত, কবিকুলপূজিত সেই দেবতা নহে। উহা কবি-ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-কল্পনার স্বতন্ত্র ইষ্টদেবতা—ভগবৎ-সাধনায় প্রত্যেক সাধকের পৃথক ইষ্টমূর্ত্তির মৎ; তফাৎ এই যে, ঐ মন্ত্রও যেমন শাস্ত্র বা সম্প্রদায়বিশেষের মন্ত্র নয়, তেমনই ঐ ইষ্টমূর্ত্তিও কবিরই ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি। অতএব, উহার নাম—'সারদা', 'মানসলক্ষ্মী', 'জীবন-দেবতা', বা 'আমার তুমি'—যাহাই হোক না কেন—মূলে উহা কবিরই সেই অপর 'আমি'—তাহা আর কাহারও 'আমি' বা একটা সাধারণ 'আমি', বা 'ভগবান-আমি' নয়; সেই 'ভগবান'ও কবিরই ভগবান, তাঁহারই 'আত্মাবধূ' বা 'হৃদয়-বল্লভ'; সাধারণ মানব-মনের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই; এই কারণে, ঐ দেবতার সহিত কবির যে লীলা—যতকিছু ভাব-অভাব, আনন্দ-সংশয়—তাহার কোন

সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলিবে না। এখানেও কবি যাহা দেখিতেছেন, তাহা আমাদিগকে কবির দিক দিয়া দেখিতে হইবে।

শুধু তুমি নিয়ে যাও, ইত্যাদি। ঐ কাব্য ফসল সম্বন্ধে কবির একটি গৌরব-বোধ আছে; তাঁহার সেই দান যে প্রত্যাখ্যাত হইবে না, এমন বিশ্বাস তাঁহার আছে। আরও কারণ, ঐ 'সোনার তরী'র কর্ণধার কবির নিজেরই সেই ইষ্টদেবতা—যাঁহার প্রেরণায় তিনি ঐ কাব্য-সকল রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে, কবি সেই দেবতাকেই কালের স্রোতে তরণী বাহিয়া 'সোনার-ধান'-সংগ্রহকারীর রূপে দেখিতে পাইতেছেন, কেবল আত্ম-মানসেই নয়—আকাশ-গঙ্গায় ভ্রমমাণ একটি পৃথক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত! ঐরূপ চিনিতে পারাব ফলে এমন আশা হইয়াছে যে, তাঁহারই প্রেরণায় রচিত ঐ কবিতাসম্ভার তিনি গ্রহণ করিবেন, কবিও তাঁহার ইষ্টদেবতাকে তাহা সমর্পণ করিয়া ধন্য হইবেন।

এখন আমারে লহ করুণা করে'। এই পংক্তিটিতে অর্থের একটু গোলযোগ আছে। সরল অর্থ এইরূপ—'আমাকেও তোমার নৌকায় তুলিয়া লও, এই জলবেষ্টিত নির্জ্জন দ্বীপ হইতে উদ্ধার কর।" কিম্বা উহার আরও আধ্যাত্মিক অর্থ এই হইতে পারে—'আমাকে সকল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত কব'। কিন্তু তাহা হইলে, ঐ 'জীবনদেবতা'র অর্থও অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে কবির কবি-জীবনের কোন স্বতন্ত্র সম্পর্ক থাকে না। এই অর্থ দুই কারণে ঐ কবিতার অন্তর্গত স্থান কাল-পাত্রেব উপযোগী নয়; প্রথমতঃ, কবির সেই অন্তর-পুরুষ মুক্তিদাতা ভগবান নহেন,—কবিরই স্বকীয় ইষ্টদেবতা। দ্বিতীয়তঃ, ঐ 'সোনার তরী'ও আত্মার নিত্য-নিবাসের স্থান নহে। এমন প্রার্থনাও কবিব পক্ষে সঙ্গত নয়, অন্ততঃ কবি তাঁহার কবি-জীবনের যে সন্ধিক্ষণে ঐ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাব মনোভাব ঐরূপ হইতে পারে না। অতএব, উহাব ঐ সরল সহজ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ইত্যাদি। সেই পুরুষ এই কথা বলিয়া কবির প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। ইহার পরে, কবি আরেক কবিতায়, ঐ 'সোনার তরী'তেই তাঁহার কবিজীবনের অধিষ্ঠাত্রীর সহিত 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়াছেন। সেখানে তিনি সেই দেবতাব যে-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, তাহাও তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর মূর্ত্তি; তখন কবির এইরূপ বৈরাগ্যভাব নাই—তৎপরিবর্ত্তে, কাব্যসাগরের অজানা অকূল মহারহস্য তাঁহাকে ভয়ে-বিস্ময়ে, আশায়-আশঙ্কায় রোমাঞ্চিত করিতেছে; যে বিপুল অনাবিষ্কৃত কাব্য-সাগর তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইবে, তাহার উদ্বেগও যেমন. তেমনই সেই মানসীর মোহিনী-রূপ ও রহস্যপূর্ণ হাসিব আশ্বাস কবিকে বিহ্বল করিতেছে। এই প্রথম কবিতার সহিত ঐ শেষ কবিতাটিও মিলাইয়া পড়িতে হইবে, তবেই একালে কবির মনোভাব ঠিক কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে—কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হইবে না।

যাহা ছিল লয়ে গেল সোনার তরী। এই কাব্যের আবেকটি কবিতায়, এমনই রূপকের ছন্দে কবি তাঁহার কবিতার একটা আশ্রয়লাভ, বা সমাদরলাভ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। এই অপর কবিতায় দেশবাসীদের অবহেলা ও অবজ্ঞার জন্য যে

অভিমান আছে—বর্ত্তমান কবিতাটিতেও তাহা আছে; ঐ 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা' এবং 'চারিদিকে বাঁকাজল' তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে। এখানে কবির কাব্যবিধাতাই কবিতাগুলিকে চিরকালের 'সোনার তরী'তে তুলিয়া লইলেন, কবির আত্মপ্রত্যয় বা অভিমান তাহাতেই চরিতার্থ হইল; অপর কবিতাটিতে আরও বাস্তব একটা পরিণামের পূর্ব্বজ্ঞতা আছে। সেইকালে স্বদেশে তাঁহার কবিতা কিছুমাত্র আদৃত হয় নাই, এ অভিযোগ এখানে আরও স্পষ্ট, যথা—

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নয়ন নীচু।
যা' ছিল চরণে রেখে
ভূমিতল দিনু ঢেকে—
সে কহিল দেখে দেখে
"চিনিনে কিছু"
শুনি' রহিলাম শির করিয়া নীচু।

তারপর—

সারাটি রজনী বসি' দুয়ার দেশে,
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে।
সুখহীন, ধনহীন
চলে' গেনু উদাসীন,
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।
['অনাদৃত']

—এখানেও কবিতাগুলি অন্যত্র ঠাঁই পাইল। এই কবিতাটি শুধুই কবিজীবনে কবির একটা ভাবাবস্থার রূপকই নয়, ইহার একটি পৃথক মূল্য আছে। ঐ যে, দেশে তাঁহার কবিতার আদর হইল না—বিদেশে হইল, এ কবিতার ঐ স্পষ্ট ইঙ্গিত পরে কিরূপ সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা জানি। নিজ ভবিষ্যৎ কবি-কীর্ত্তির সম্বন্ধে এইরূপ দৈবজ্ঞসুলভ জ্ঞান আমরা পূর্ব্বে একাধিক কবিতায় দেখিয়াছি। 'সোনার তরী' কবিতাটির ব্যাখ্যায় ঐ কবিতাটির প্রাসঙ্গিক মূল্য কিরূপ, তাহাও আমরা দেখিলাম।

'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা'

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই যুগ্ম-কবিতায় রবীন্দ্র-কবিমানসেরও যেমন, তেমনই রোমাণ্টিক রস-কল্পনার একটি অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে, সৌন্দর্য্য প্রেমের এমন রোমান্স-রস বাংলাকাব্যে—এমন কি রবীন্দ্র-কাব্যেও—আর কোথাও এমন অনবদ্য বাণী-রূপ লাভ করে নাই। ঐ যে কবি-মানসের কথা বলিয়াছি, তার কারণ, প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে

একটি বিশেষ inhibition বা প্রকাশ-ভীরুতা আছে—'মানসী'র কবিতাগুলিতে যাহার লক্ষণ অতিশয় স্পষ্ট, তাহাই এ কবিতার প্রেরণা হইয়াছে; তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঐ মনোভাব কবি-রবীন্দ্রের সৌন্দর্য্য-প্রেমের ও আর্টচর্য্যার কতখানি সহায় হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, এই কবিতা-দুইটির কল্পনামূলে যে আরেক সূত্র আছে, তাহার একটু আলোচনা করিলে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম ও কবিকর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কবি এই কবিতার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন টেনিসনের The Day-Dream-শীর্ষক কবিতা হইতে। সেখানেও সেই কবিতা—The Sleeping Palace, The Sleeping Beauty, The Arrival এবং The Revival—এই চারি পর্ব্বে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুই ভাগে ঐ চারিটির কাজ করিয়া লইয়াছেন। টেনিসনের কবিতার ঐ চারিটা নাম পড়িলে মনে হইবে, রবীন্দ্রনাথ বুঝি ঠিক ঐ কাহিনীটি ঠিক ঐভাবে অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা নয়। টেনিসনের কবিতার ঐ বিষয়টা নিশ্চয় তাঁহার কবি-মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কল্পনা সম্পূর্ণ আপন পথে, তাঁহার কবিপ্রকৃতি ও কবিধর্ম্ম অনুসারে—সেই ইঙ্গিতটি মাত্র গ্রহণ করিয়া—প্রেম ও সৌন্দর্য্যের বিরহ-মিলন-তত্ত্বটি আরেক রঙে রঙ্গীন করিয়াছে; মনে হয়, কবি যেন টেনিসনের ঐ কল্পনাকে যতকিছু মর্ত্ত্য-মলিনতা—স্থূল আদর্শের সুলভ রস-রসিকতা—হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে—দিবা-স্বপ্ন (Day Dream) নয়—চিরদুর্লভের স্বপ্নলোকে 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে' প্রসারিত করিয়াছেন। ঐ মাত্র দুইটি সংক্ষিপ্ত কবিতার আকারে ভাব যেমন ঘনীভূত, তেমনই তাহা অন্তহীন অসমাপ্তিতে সকল আয়তন ছাড়াইয়া গিয়াছে।

এইবার উভয় কবির কবিমানস তুলনা করিলে, এই কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যের একটি গূঢ় লক্ষণ পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবে। টেনিসনও একটি রূপকথাকে আশ্রয় করিয়াছেন—"The reflex of a legend past"; তাঁহার রাজবাড়ী ও রাজসভা সহসা কোন যাদুমন্ত্রে শতাব্দীকাল নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল, অর্থাৎ তাহাতে জাগ্রত-জীবনের কোন তরঙ্গ—সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কোন প্রাণ-হিল্লোল জাগিত না—

Here all things in their place remain,
As all were ordered ages since.

সেই ঘুমের দেশে স্বর্গদূতের মত এক রাজপুত্র আসিয়া আবার সকলকে জীবনের সুখ-দুঃখের—কান্নাহাসির দোলায় দুলাইয়া দিবে, তাহারা পুনরায় জীবনের সেই 'pleasing anxious being'—উদ্বেগ-অশান্তির বিষামৃত পান করিয়া ধন্য হইবে।—

Come, Care and Pleasure, Hope and Pain,
And bring the fated fairy Prince.

পরিশেষে এ কবিতায় রাজপুত্র ও রাজকন্যার যে মিলন হইল—সে মিলনে প্রেমের সুধাপান আছে; দেহের মিলনে জাগ্রত হৃদ্‌পিণ্ডের একত্র-স্পন্দন আছে; সেই প্রেম নিদ্রিতার নিদ্রা বা স্বপ্নকে নয়—নিদ্রাভঙ্গকেই একটা পরম আশীর্ব্বাদরূপে বরণীয় করিয়াছে।—

O eyes long laid in happy sleep!
O happy sleep, that lightly fled!

O happy kiss that woke thy sleep !
O love, thy kiss would wake the dead !

আসলে, টেনিসনের কবিতায় জীবন ও প্রেম, এই দুইয়ের মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই কবিতার এইটুকু পরিচয়ই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

অপরপক্ষে, কল্পনার ঐ সূত্রটুকুমাত্র ধরিয়া আমাদের কবি যে কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেই হয়। এই কবিতার ঐ রূপকথাটি রূপকথারই কল্পলোকে, এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের অতৃপ্ত পিপাসায়—জগতের রাজসভাকেও যেমন, নর-নারীর যুগল মিলনের প্রেমসুখসম্ভোগকেও তেমনই, জাগ্রত জীবন ও পরিতৃপ্ত কামনার নিম্নাধিকারে ঠেলিয়া দিয়া—দুর্ল্লভ বল্লভ-বিরহের একটি অপরূপ গাথা হইয়া উঠিয়াছে। এ রস খাঁটি রোমান্স-রস—অপার্থিব-রমণীয়তার রস। ইংরেজ কবি রাজপুত্র ও রাজকুমারীর মিলন ঘটাইয়াও শেষে, ঐ রোমান্স-রসের অনুরোধে, তাহাদিগকে সুদূর অজানার রাজ্যে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করাইয়াছেন বটে, যথা—

And o'er the hills and far away
Beyond their utmost purple rim,
Beyond the night, across the day,
Through all the world she follow'd him.

—এবং তাঁহার পূর্ব্বে কবি কীট্‌স্‌ও (Keats) তাঁহার সেই অমর কবিতার প্রেমিক-যুগলকে এমনই দেশ কালের পরপারে প্রস্থান করাইয়াছেন—সেখানেও বর বধূকে বলিতেছে—

"For o'er the southern moors I have a home for thee."

* * * * *

And they are gone ; aye ages long ago,
These lovers fled away into the storm.

[*St. Agnes' Eve.*]

—অর্থাৎ, ওই প্রেম ও প্রেমের মিলন-সুখ এই জীবন ও জাগ্রত ভুবনের দান হইলেও, নিত্যকার পরিচিত জগৎ হইতে দূরে কোন সুদূর দুর্গম বলভি-গৃহে তাহার বাসর-শয়ন রচনা করিতে হয়; ইংরেজ কবিগণ ঐটুকু মাত্র রোমান্স তাহাতে যুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা তাহাতেও তৃপ্ত নয়; ঐ যুগল কখনও মিলন-শয়নে আলিঙ্গন বদ্ধ হইবে না, এমন কি, ভাব-সম্মিলনেও নহে; উভয়ে উভয়ের নিকটে সুদূর-দুর্ল্লভ হইয়াই থাকিবে; নহিলে, যাহা অসীম-সুন্দর, তাহাকে সীমার বাঁধনে বাঁধিলে—রূপের রূপকথাকে স্বপ্ন হইতে জাগরণে টানিয়া আনা হয়। ঐ চিরবিরহই সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের অনন্ত রাত্রি, তাহাতে মিলনের তৃপ্তি নাই বলিয়াই প্রেম এমন সুন্দর হইয়া উঠে। মিলনে যাহার অবসান হয়—প্রেমের সেই হৃদয়-বেদনাকে—সেই অতৃপ্তিকে সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন আরও মধুর করিয়া তোলে; তাই সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিবার জন্য, ঐ বেদনাই হৃদয়ে বহিয়া—

দুগ্ধফেন-শয়ন করি' আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

এবং স্বপ্ন ভাঙিলে—

নিভৃত ঘরে পরাণমন একান্ত উতলা—
শয়ন শেষে নীরবে বসে' ভাবিছে রাজবালা
— কে পরালে মালা!

রাজপুত্রও সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের রসাবেশে বিহ্বল হয়—

দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি,
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন-ভরা লাবণ্যে নিরালা!

খাঁটি সৌন্দর্য্য-রস, তথা রোমান্টিক লিরিক-কল্পনার দিক দিয়া এ কবিতা যে টেনিসনের কবিতাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্যকে এমন কামনার ধন করিয়া—সকল হৃদয়ানুভূতির উপরে তাহাকেই স্থান দিয়া, এই যে রঙ ও রেখার—ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব্ব কারিগরিতে—বিলাতী আর্টের Pre-Raphaelite-রীতিকেও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া, এ কবিতা সৌন্দর্য্য-রসের নির্য্যাসকেই যেন ঐ রাজকন্যার রূপে সাকার করিয়া তুলিয়াছে,—তাহাতে রবীন্দ্র-কবিমানস ও আর্ট-কল্পনার হরগৌরী-মিলন হইয়াছে, কবি যেন তাঁহার কবি-স্বপ্নকে—অন্তরের একটি গহন-গূঢ় উৎকণ্ঠাকে—সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। সেই যে মানসীতে—

দিবস নিশি ধরে' ধ্যান করি তাহারে,
নীলিমা-পরপারে পাবো তার দেখা কি?

*   *   *   *   *   *

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে
তাহারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ-ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
['বিরহানন্দ'

— ঐ 'বিরহের ছায়াতল'ই সুশীতল, উহাই 'বিরহের স্বর্গলোক'। অথবা —

কখনো বা চাঁদের আলোতে
কখনো বসন্ত-সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ মুরতিখানি জেগে উঠে মনে।
['পুরুষের উক্তি'

তারপর সেই—

মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।
['মেঘদূত'

—সেই সকলই এই দুইটি কবিতায়—আর্টের মোক্ষধামে—চিরনির্বৃতি লাভ করিয়াছে; প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দ্বন্দ্বে সৌন্দর্য্যই জয়ী হইয়াছে, অর্থাৎ প্রেমের পিপাসা সৌন্দর্য্য-পিপাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

কবিতা-পাঠ

প্রথম কবিতাটির ('নিদ্রিতা') ছন্দ—৫ + ০-এর পর্ব্বভাগ; ঐ ছন্দের ঐ সুর এ কবিতার কেমন উপযোগী হইয়াছে!

শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা, ইত্যাদি। প্রকৃতি-চিত্রাঙ্কনের এই সূক্ষ্মতা—ভাষা ও ছন্দের সহিত মিলিয়া অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করিয়াছে, পড়িবামাত্র সমগ্র চিত্রটি চোখের উপরে ভাসিয়া উঠে; বাংলাকাব্যে এমন শব্দচিত্র অল্পই আছে।

দুগ্ধফেন-শয়ন করি আলা- রূপকথার ভাষা; 'আলা'—'আলো'র এই প্রাচীন রূপটি কাহিনীর প্রাচীনতা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি, ইত্যাদি। মনের অবস্থার এইরূপ বর্ণনা রূপ-কথাকেও বাস্তব করিয়া তোলে।

কমলফুল-বিমল শেজখানি, ইত্যাদি। এইখান হইতে Sleeping Beauty বা নিদ্রিতার রূপবর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, বাংলাকাব্যে আর কোথাও ইহা নাই, অথচ ইহা কাব্যকল্পনার একটি উৎকৃষ্ট বিষয়। কবি কীট্‌সও (Keats) তাঁহার কবিতায় (St. Agnes' Eve) নিদ্রিতার এমন সৌন্দর্য্য-বর্ণনা করিতে পারেন নাই।

বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা। সেই রূপ দেখিয়া বুকে যে বেদনা জাগিল তাহাও মধুর। সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটি অসীমের ব্যঞ্জনা আছে; যাহা অসীম তাহা দুর্ল্লভ, কিন্তু সেই দুর্ল্লভতার বেদনা একটি মধুর রসাবেশের মত।

মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি, ইত্যাদি। টেনিসনের কবিতায় আছে—

She sleeps : her breathings are not heard
In palace chambers far apart.
The fragrant stresses are not stirr'd
That lie upon her charmed heart.
She sleeps : on either hand upswells
The gold-fringed pillow lightly pressed .
She sleeps, nor dreams, but ever dwells
A perfect form in perfect rest.

[*The Day-Dream*]

—ঐ 'perfect form in perfect rest' আমাদের কবির ভাষায়—

দেখিনু তারে, উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি···

—আরও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। অন্যত্র—

'চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়'

['নিদ্রিতা'—কড়ি ও কোমল]

['কড়ি ও কোমলে' এই নিদ্রিতা-চিত্রের একটি খসড়া আছে; সেখানে চিত্র-রস অপেক্ষা ভাব-রস অধিক; এদিক দিয়া 'সোনার তরী'তে কবির সৌন্দর্য্য-সাধনার পূর্ণতর বিকাশ লক্ষণীয়।]

পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা, ইত্যাদি। রূপসীর উরজ-যুগলের সহিত পূজার ফুলের তুলনা দেশী বা বিলাতী কোন কাব্যেই নাই; কালিদাস "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা" লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও পূজার ফুল নহে। এ কবি রমণীর দেহলতায় প্রস্ফুটিত ঐ পুষ্পদুইটিকেও সৌন্দর্য্য-পূজায় নিয়োগ করিয়াছেন; সেই সৌন্দর্য্যের পবিত্রতা-রক্ষার জন্য উহাতে কামনার লেশমাত্র নাই। 'কড়ি ও কোমলে'র "হৃদয়-আসন" কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

আপনভরা লাবণ্যে নিরালা। টেনিসনের কবিতাতেও ঐ 'নিরালা' কথা আছে, সেখানেও 'palace chambers far apart' বলা হইয়াছে; কিন্তু এখানে ঐ সংক্ষিপ্ত ভাষায় আরও গূঢ় অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সৌন্দর্য্য আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—উহা 'আপনাতে আপনি বিকশি' উঠিয়াছে। 'নিরালা' অর্থে 'নিঃসঙ্গ', এখানে—সর্ব্বসংস্রবশূন্য, অর্থাৎ নিজ-মহিমায় স্বতন্ত্র, আর কিছুকে উহার প্রয়োজন নাই।

পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দু'টি, ইত্যাদি। তুলনীয়—

"—the flame o' the taper
Bows towards her and would underpeep her lids,
To see the enclosed lights, now canopied
Under those windows, white and azure-laced
With blue of heaven's own tinct.'

[*Cymbeline. Act 2,*]

ভূর্জ্জপাতে কাজল মসী দিয়া, ইত্যাদি। প্রাচীন কাব্যের ভাষা, রূপকথার পক্ষে বড় উপযোগী হইয়াছে। পাতি অর্থে—'পত্রী', খাঁটি বাংলা। এ যেন ভাষারও একটি কারুকলা বা নক্সার কাজ—ইহাও কবিতার রোমান্টিক রূপ-রস বৃদ্ধি করিয়াছে।

ইহার পর ঐ দ্বিতীয় কবিতা—'সুপ্তোত্থিতা'। ছন্দের পরিবর্ত্তন লক্ষণীয়; পূর্ব্বের কবিতায় নিদ্রার স্বপ্নাবেশ ছিল, তাই ছন্দও একটু মন্থর ছিল; এ কবিতায় জাগরণের চমক ও চাঞ্চল্য আছে, তাই ছন্দে একটা দোল লাগিয়াছে; ছন্দ সেই একই —পাঁচমাত্রার পর্ব্বভাগ, কিন্তু প্রতিচরণে পর্ব্বের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় তাল দ্রুততর হইয়াছে।

অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া, ইত্যাদি। এইরূপ বর্ণনাই রূপকথার রীতি; মহাকাব্যেও এইরূপ নামের সংখ্যা বাড়াইতে হয়।

আপন পানে নেহারি চেয়ে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

যেথা কি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

['নিদ্রিতা'—কড়ি ও কোমল]

পড়িল নাম, পড়িল ধাম, ইত্যাদি। কবি ইহার বহুপরে, পত্র পাওয়ার একটি ভিন্নতর ভাবাবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন; তাহাতে জানিবার ব্যাকুলতা আর নাই, অতৃপ্তির রোমান্টিক রসের পরিবর্ত্তে একটি মিস্টিক পরিতৃপ্তি আছে; যথা—

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি, এই সুখ,
কারেও আমি দেখাবো নাকো সিটি।
লিখন আমি নাহিক' জানি,
বুঝিনা কি যে রয়েছে বাণী,
যা' আছে থাক, আমার থাক তাহা।
পেয়েছি এই সুখে আছি,
পরাণে উঠে বাঁশরি বাজি'
পেয়েছি-সুখে পরাণ গাহে আহা।

[উৎসর্গ—১১

ওখানে ঐ চিঠি যাহার, নায়িকা তাহাকে হৃদয়ে পাইয়াছে, তাই চিঠির ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন আর নাই—'পাওয়াতে'ই সকল অর্থ হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এখানে নায়িকা পত্রের ঐ প্রেমের ভাষা বুঝিয়াছে, কিন্তু প্রণয়ীকে দেখে নাই,—সেই না-দেখা ও না-পাওয়ায় যে অসীম উৎকণ্ঠা তাহাই মধুর, কারণ তাহাতে সৌন্দর্য্য-পিপাসার মাদকতা আছে।

[সৌন্দর্য্য যেখানে মানস-পিপাসা মাত্র, সেখানে প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে একটা বিরোধ আছে; একটিতে হৃদয়-ধর্ম্মের প্রাধান্য, অপরটিতে মানস-ধর্ম্মের। যেখানে প্রেম ও সৌন্দর্য্য এক হইয়া গিয়াছে সেখানে সজ্ঞান রূপ-পিপাসা নাই, একরূপ মিস্টিক ভাবাবেশ আছে (যেমন বিহারীলালের কবিতায়)। আবার খাঁটি Aestheticism বা আর্ট-তন্ত্রের সাধনায় একরূপ নির্ব্বাণ-মোক্ষ ঘটে—ঐ রোমান্টিক গীতি-কল্পনার Ego বা অহংটাও তাহাতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; কি ভিতরে, কি বাহিরে কোন নীতির বন্ধন থাকে না, একরূপ অবশ আত্মরতির সুখ-সম্ভোগই পরমার্থ হইয়া উঠে। তাহাকেই আর্টের জীবন্মুক্তি বলে, সেও একরূপ শূন্যবাদ।]

শীতল-ছায়া নদীর পথে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে
কাঁকণে।

['দিনশেষে'—চিত্রা

একটি আছে গোপন কথা, ইত্যাদি। স্বপ্নাবস্থায় যে আমাকে তাহার প্রাণ

সঁপিয়াছে—যাহার এই প্রেমপত্র আমাকে এমন আকুল করিয়াছে—সে কে? তাঁহার পরিচয় গোপন হইয়াই রহিল। ইহাও সেই প্রশ্ন—

কো তুঁহু বোলবি মোয়?
বাঁশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়।

[ভানুসিংহের পদাবলী]

কেমন বীর-মুরতি তার, ইত্যাদি। এই যে অপরিচয়ের সৌন্দর্য্যধ্যান ইহাতে কল্পনার কোন বাধা নাই, রাজকন্যা 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' সেই চিরদুর্ল্লভের মূর্ত্তি গড়িতেছে; তাহাকে দেখিলে এই কল্পনা-সুখ হইতে সে বঞ্চিত হইত।

পার্শ্বে যেন বসিয়াছিল, ইত্যাদি। বৈষ্ণব কবিতার সেই 'পূর্ব্বরাগ'—রাধার মুকুলিত তনুলতায় নবানুরাগের সরস-শিহরণ স্মরণীয়। তুলনীয়—

"কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী,
সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি।"

এমনি ধীরে একটি ক'রে, ইত্যাদি। এই শেষ স্তবকটির ভাবার্থ:—বহিঃপ্রকৃতির যতকিছু শোভা, তাহার হাসি-কান্নার বিচিত্র উৎসব সকলই ঐ একটি প্রশ্নের উত্তর-অভাবে রাজকন্যার জীবনে নিরর্থক হইয়া গেছে। তুলনীয়—

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।
এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রবো আমি একা।
ব্যর্থ হয় ব্যর্থ হয় এদিন-রজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

[উৎসর্গ—২৩

এ কবিতা অনেক পরে লেখা, তবু ভাবসাদৃশ্য খুব স্পষ্ট; তাই ঐ শেষের স্তবকটিতে যে আর্ত্তশ্বাস আছে তাহা কবির কবিজীবনেরও একটি lyric cry বলিয়া মনে হয়—'সোনার তরী'র এই কবিতাটিতে তাহারই বীজ রহিয়াছে। ঐ 'অর্থহীন এ বিশ্বভুবন' এবং 'অনন্ত প্রেমের ঋণ'—এই দুইটি বাক্যে কবির যে অন্তরের কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা accidental বা সাময়িক ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না; ঐ 'বিশ্বভুবন' এবং 'প্রেম' এই দুইয়ের সঙ্গতি-সাধনের চেষ্টাই যেমন রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্গূঢ় প্রেরণা, তেমনই, এ কবিতার ঐ 'কে পরালে মালা' সেই একই আকুতির একটি মনোহর রূপক।

হিং টিং ছট

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত Satire বা ব্যঙ্গ-কবিতা; 'মানসী'তে এইরূপ কয়েকটি কবিতা আছে, কিন্তু তাহার ব্যঙ্গরস এমন তীক্ষ্ণ ও সুরচিত নয়। এই শক্তি রবীন্দ্র-সাহিত্যে নানা মাত্রায়, ও নানা রসের মিশ্রণে, প্রায় শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিল, কিন্তু এ কবিতায় তাঁহার বিদ্রূপ-বাণ যেমন নির্ম্মম ও বিষদিগ্ধ হইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কোন কবিতায় হয় নাই—একমাত্র 'কল্পনা'র 'উন্নতি-লক্ষণ' কবিতাটি ইহার সহিত তুলনীয়। এই সব তীক্ষ্ণ শরসন্ধানের লক্ষ্য সর্ব্বত্রই প্রায় এক—দেশীয় রক্ষণশীল সমাজ ও হিন্দুয়ানীর মূর্খতা-সুলভ গর্ব্ব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম ও কবিমানসের একটি বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে পূর্ব্বাপর কবি-পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, পরে যথারীতি কবিতাটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিব।

রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তি-উন্মেষের পূর্ব্বে, আমি তাঁহার যে প্রখর বুদ্ধি বা মানস-শক্তি-বিকাশের কথা বলিয়াছি ('প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য) সেই শক্তি তাঁহার কবিপ্রতিভার সহিত চিরদিন যুক্ত ছিল; ইহার কারণ, তাঁহার সেই আত্মভাবমূলক (subjective) স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান বা স্বকীয় ভাবনা-ধারণার—শুধুই Idealism নয়—'masterful egoism'। আরও কারণ, তিনি ছিলেন সেকালের নবধর্ম্ম-প্রণেতা ও সমাজ-সংস্কারক, মনস্বী ও আদর্শনিষ্ঠ পুরুষের পুত্র; এজন্য যুক্তি ও সত্যের নীতিনিষ্ঠা রক্তগত সংস্কারের মতই তাঁহার স্বভাবে বিদ্যমান ছিল। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাচীন সমাজের দুর্ব্বল চিন্তা বা মোহজনিত সেন্টিমেন্টের উপরে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এজন্য কবিযশ লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রবন্ধে ও সমালোচনায় ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন; পরে ঐ সমাজ ও তাহার চিরাগত সংস্কারের ভক্তি ও বিশ্বাসকে উত্তরোত্তর কঠিনতর আঘাত হানিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কবিতায় তাঁহার যে মনোভাবের পরিচয় আছে, উত্তরকালের সর্ব্ববিধ রচনায়—বিশেষ করিয়া কয়েকখানি নাটকে—তাহার কুশলতর অভিব্যক্তি হইয়াছে। অতএব একহিসাবে, তাঁহাকে আজন্ম—Protestant বা প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিবাদী বলা যাইতে পারে। ইহাও সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির যুদ্ধঘোষণা; সেই প্রাচীন সমাজের অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যেও যদি জীবনীয় বা শ্রেয়স্কর কিছু থাকে—বিশাল

জনসমাজকে, তাহাদের হৃদয়-মনের উপযোগী কোন ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবার কোন উপায় তাহাতে থাকে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে তিনি কখনও রাজী ছিলেন না। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, একজন যেমন অতি মাত্রায় আত্মতান্ত্রিক—বহুর বাস্তব জীবন-সমস্যার সহিত সম্পর্কহীন, অপরজন তেমনই, অতি উচ্চ আদর্শকেও—জনগণের বুদ্ধিভেদ না করিয়া—তাহাদের জীবনে যতখানি সফল করিয়া তোলা সম্ভব, তাহার জন্য—সে সকলের উচ্ছেদ কামনা করেন নাই; একজন প্রেমিক, আরেকজন moralist বা কঠোর নীতিধর্ম্মী।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাতেই নয়, সমগ্র কাব্যসৃষ্টিতে অতিসূক্ষ্মভাবে এই মনোভাব বিদ্যমান আছে। তাঁহার কাব্যে নীতি-সংস্কারমুক্ত জীবনের সবল অভিব্যক্তি নাই, বরং তাহার সম্পর্কে বিমুখতাই আছে, ইহার কারণ, ঐ মনোভাব। কেবলমাত্র মানুষের দুর্ব্বলতাকে বা জীবনধর্ম্মের অবমাননাকে ধিক্কৃত না করিয়া, তিনি good ও evil, সত্য ও অসত্য, নীতি ও দুর্নীতির সেই আত্মতান্ত্রিক আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন—এজন্য তাঁহার কাব্যে, যাহাকে 'acceptance of life' বলে তাহা নাই। একজন বড় বিদেশী সমালোচক বলিয়াছেন—

"He (কবি ও কাব্যরসিক) becomes a philosopher and an artist, and remembers not that he is an upright man...A man must be interested in passions to comprehend their full effect, to count all their springs, to describe their whole course."

—নীতিধর্ম্মী moralist বা আত্মতান্ত্রিক আদর্শবাদী হইলে, মানুষের জীবনকে তেমন গভীর করিয়া দেখিতে পারে না—কুসংস্কার, কুপ্রবৃত্তি, পাপ, মিথ্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু—

"They are diseases; if a man is content to blame them he will never know them...you will never be able to unfold their vast system and to display their fatal greatness."

[H. A. Jaine: *History of English Literature*]

মহাকবি গেটের একটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যথা,—

"Superstitions are the poetry of Life"। মানুষের ঐ কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তিগুলাকে কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যে কাব্য-নাটকে তাহাদিগকে গাঢ়তর বর্ণে চিত্রিত করিলে জীবনকেই অস্বীকার করা হয়, তাহার গভীরতম রহস্যকে রস-রূপ দান করিয়া জীবনকাব্যের কবি হওয়া যায় না।

বর্ত্তমান কবিতার প্রসঙ্গে এই যে এত কথা বলিতে হইল, তাহার কারণ কি, পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস, তথা কবিধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ রচনাগুণে স্ফুটতর হইয়াছে: এই ব্যঙ্গই তাঁহার কবিদৃষ্টির সহায় হইয়া উচ্চতর কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

কবিতা-পাঠ

প্রসিদ্ধি আছে যে, সেকালের একজন খ্যাতনামা লেখক এই কবিতাটির সাক্ষাৎ লক্ষ্যস্থল; তাঁহার রচনায় কোনরূপ যুক্তি বা সত্যের আলোক থাকিত না, যাহা থাকিত, তাহা যুক্তিহীনতা

ও দুর্বোধ্যতার জয়গান। ইনি হিন্দুব গৌরব-প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের দলভুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ধর্ম্মনীতির চ্যাম্পিয়ন—তিনি একবার বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাঁহার আদর্শ-বিচ্যুতির জন্য আক্রমণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঐ লেখকের হাস্যকর পণ্ডিতম্মন্যতা সম্ভবতঃ কোন একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে আরও অসহ্য হইয়াছিল, তাই এই কবিতায় তিনি সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে, তথা ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীর অদ্ভুত চরিত্রকে বিদ্রূপের অগ্নিবাণে অঙ্গারকৃষ্ণ করিয়াছেন।

প্রথম স্তবক। স্বপ্নটির রচনাকৌশল লক্ষণীয়। উহা শুধুই অসংলগ্ন নয়, সেই অসংলগ্নতাব মধ্যেও একটি গূঢ় অর্থ নিহিত আছে—একটা সামান্য বেদে নির্ব্বোধ রাজাকে (প্রাচীনতার মহিমাকে) কেমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে! "হিং টিং ছট"—একে স্বপ্ন, তাহাতে আবার বেদের ভাষা, সুতবাং তাহা অর্থহীন; কিন্তু যাহারা স্বপ্নে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিকটে ঐরূপ শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ অতি গভীর। 'স্বপ্নমঙ্গলের কথা'—অর্থাৎ, বাস্তব-জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া, যাহা অবাস্তব ও যুক্তিহীন তাহারই জয়গান।

দ্বিতীয় স্তবক। 'বালবৃদ্ধ'—অর্থ, সে রাজ্যে অতিবিশ্বাসী বালক ও জড়বুদ্ধি বৃদ্ধেরাই বাস করে। 'ভুঁইফোড'—ইহার সাধারণ অর্থ, যাহার কোন মূল নাই, ভিত্তি নাই।

তৃতীয় স্তবক। 'টিকি শুদ্ধ মাথা' এবং 'অনুস্বর বিসর্গেব স্তূপ'—প্রাচীন শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতি কটাক্ষ। কোন বিষয়ে ইহাদের স্বাধীন চিন্তা বা বাস্তবদর্শিতা নাই; শাস্ত্রবাক্যের শব্দার্থ ও ব্যাকরণ এবং বস্তুসম্পর্কহীন নৈয়ায়িক তর্ক ছাড়া ইহারা আর কিছুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না; যাহা নিতান্তই অর্থহীন তাহাবও ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ কবিতে পারিলেই হইল, অথবা যাহা অপ্রাকৃত তাহাকেই একটি দুজ্ঞেয় মহিমায় মণ্ডিত করিতে হইবে।

চতুর্থ স্তবক। 'যবন পণ্ডিত'—ইংরেজ মনীষী। যাহা কিছু সূক্ষ্ম বিচারের বা কল্পনার বস্তু, তাহার প্রতি ইংরেজ জাতির চরিত্রগত বিদ্বেষ আছে; বাস্তব ও ব্যবহারিক সমস্যা ছাড়া আর কিছুকেই তাহারা বিচারযোগ্য মনে করে না। কবি এইরূপ চরিত্রকে ঐ ব্যাধির উপযুক্ত প্রতিষেধক বলিয়া প্রথমেই উহার অবতারণা করিয়াছেন।

পঞ্চম স্তবক। 'ফবাসী পণ্ডিত' ইংরেজের মত বেরসিক নয়—সুরসিক ও শিষ্টাচার সম্পন্ন, রাজা ও রাজসভার সম্মান ক্ষুণ্ণ না করিয়া কেমন মিষ্ট ভাষায় সত্য কথাটি বলিয়া গেল! 'অর্থ না থাক, কিন্তু শুনিতে কি মিষ্ট!'—প্রকারান্তরে ব্যঙ্গ করিয়াই গেল।

ষষ্ঠ স্তবক। এই স্তবকে কবি গল্পের আবরণ ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে দেশীয় সমাজকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। 'ধর্ম্মপ্রাণ জাতি'—রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। 'স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!'—ভাব এই যে, স্বপ্নই যদি না রহিল তবে আমাদের ধর্ম্ম থাকিবে কেমন করিয়া? 'ধর্ম্মরাজ্যে পুনরায় শান্তি এল ফিরে'—এই বাক্যে লেখক ব্যঙ্গেরও সংযম হারাইয়াছেন—এগুলি স্থূলহস্তের আঘাত।

সপ্তম স্তবক। 'গুরুমারা চেলা'—ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী পণ্ডিত। ইংরেজী বিদ্যার দ্বারাই ইহারা ইংরেজের মতামতকে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করে। সেকালের ঐ নব্যহিন্দু সম্প্রদায়—যাহারা বিলাতী আদর্শের নিন্দা করিত—তাহারা সকলেই কিন্তু তাহাদের ইংরেজী বিদ্যার গৌরব জাহির করিতে ছাড়িত না। রবীন্দ্রনাথ এখানে, স্পষ্টই রামমোহন-বিদ্যাসাগর যুগের পর বঙ্কিমযুগের সেই Hindu Revival-কে—ইংরেজী Rationalism বা যুক্তিবাদের পরিপন্থী নব্য হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ে একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং অপরদিকে গোঁড়া-হিন্দুধর্ম্ম—এই দুইয়ের বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। নব্য হিন্দুগণ ঐ দুইয়ের কোনটাই গ্রহণ করে নাই—বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া-হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তথাপি নব্যহিন্দুকেও রক্ষণশীল সমাজের সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুযোগ ঘটিত, তার কারণ, ইংরেজীশিক্ষিত নব্যহিন্দুরাও তাঁহাদের হিন্দুত্ব-গৌরব বাড়াইবার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করিত। এই 'গুরুমারা চেলা'দের লক্ষ্য করিয়াই কবি পরে 'উন্নতি-লক্ষণ' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

পণ্ডিত ধীর, মুণ্ডিত-শির,
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি,
তিলক-রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
এম- এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দ্দান্ত!

[কল্পনা]

এই স্তবকে কবি বাঙালীর যে আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে বাঙালী-মাত্রেরই মুখ-দর্পণ নহে—তার প্রমাণ, কবি নিজেও বাঙালী; তথাপি ইহার কয়েকটি কথা সাধারণভাবে সত্য। "এতটুকু যন্ত্র হ'তে এত শব্দ হয়"—ইহা সত্য হইলেও ভাল ও মন্দ—দুই অর্থেই সত্য। 'পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল'—ইহা নব্য ইংরেজী শিক্ষিতদের সম্বন্ধে সত্য হইলেও, আদি বাঙালী চরিত্র ইহার ঠিক বিপরীত। 'ব্যাখ্যায় করিতে পারি' ইত্যাদি—ইহা ইংরেজী শিক্ষারই ফল নহে, ইহা সংস্কৃত-পাণ্ডিত্যের একটি বড় গুণ। রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার 'জয়-পরাজয়' নামক ছোট-গল্পে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 'পুণ্ডরীক'কে দিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

অষ্টম স্তবক। প্রথম স্তবকের স্বপ্নরচনার মত, এই স্তবকে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা-রচনায় কবির কূটকৌশলী কল্পনা ও বিদ্রূপ চরমে উঠিয়াছে, দুর্ব্বোধ্যকে আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলাই এই ব্যাখ্যার বাহাদুরী। উহাতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দ—কতক পারিভাষিক, কতক অতিভাষিক—এমন স্রোতের মত অনর্গল ছুটিয়াছে যে, তাহাতেই স্বপ্নের মহিমা ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে; তাহাই সকলকে আপ্যায়িত করিল, কারণ, অর্থ অপেক্ষা স্বপ্নের গৌরব-প্রতিষ্ঠাই অধিকতর আবশ্যক।

নবম স্তবক। 'হয়ে গেল জল'—এই শ্লেষ-বাক্য কবির নিজেরই; কারণ, তাহাদের উহা বুঝিবার প্রয়োজনই নাই; স্বপ্নটা উড়াইয়া না দিলেই হইল—যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা তাহাবা চাহে নাই। অতএব কবি যে শ্লেষ করিয়াছেন, তাহা উহাদের পক্ষে অর্থহীন। 'শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল'—ইহাও কবিরই কথা; তাহারা নির্ম্মলতা চাহে না, বরং ঘনীভূত রহস্যের আবরণ তাহাদের প্রাণকে অধিকতর তৃপ্ত করে।

দশম স্তবক। সমগ্র কবিতাটির মর্ম্মার্থ বা কবি-ভাষ্য—এই স্তবকের ঐ কয়পংক্তি—'স্বপ্নমঙ্গলে'র উহাই ফলশ্রুতি, যথা—

> বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
> সত্যেবে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
> যা' আছে তা' নাই, আর নাই যাহা আছে,
> এ কথা জাজ্জ্বল্যমান হবে তাব কাছে।

পরশ পাথর

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই রূপক-কবিতাটির স্বল্প পরিসবে মনুষ্য জীবনেব একটি সুমহান ট্র্যাজেডি যে চমক সৃষ্টি কবে তাহাতে ইহাকে একটি উচ্চাঙ্গের কবিতা বলা যাইতে পারে। রূপক হিসাবেও এমন অনবদ্য রচনা আরেকটির উল্লেখ কবা যাইতে পারে—'খেয়া'র "বালিকা বধূ"।

এ কবিতার কল্পনা-গৌরব এই যে, ইহাতে মানুষের মহতী আকাঙ্ক্ষা ও তাহার নিত্যনিষ্ফলতার সেই তত্ত্বই একটি অপূর্ব্ব কাহিনীর আকারে আমাদের হৃদয়গোচর হইয়াছে; নিয়তি-নির্জ্জিত মানুষের ঐ পরাজয়ই তাহার পিপাসাকে মহিমান্বিত করে। এক কথায়, ঐ 'ক্ষ্যাপা'—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"—এই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জ্ঞানের 'ভূমা'কে পাইতে চায়,—খণ্ডের পরিবর্ত্তে সে এক অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করিবে। ইহারই সাধনায় কত জ্ঞান-যোগী, কত বিজ্ঞানী তাহাদের সারাজীবন উৎসর্গ করিয়াছে, বারবার নিষ্ফল হইয়াও

সেই মহারহস্য-ভেদের প্রয়াস ত্যাগ করে নাই; তাহাদের সেই মহান আত্মোৎসর্গ—সেই martyrdomই—যুগেযুগে মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার ক্রমশঃ দূর করিতেছে।

কবিতার ভাবার্থ এই। পৃথিবীতে সকল কালেই এমন দুই-একজন মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মনের ক্ষুধা অসীম—কোন ক্ষুদ্র, খণ্ড জ্ঞান তাহাদের সেই পিপাসা তৃপ্ত করে না। উহাদের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা অধ্যাত্ম-পন্থায় যোগাসনে না বসিয়া, এই জগৎ-দৃশ্যের মধ্যেই সেই পরম-তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চায়; যে মহা-নিয়মটি লাভ করিলে কোন ভেদ-জ্ঞান আর থাকে না, সকলই এক পরম সত্যের সুবর্ণদ্যুতি ধারণ করে—জ্ঞানের সেই পরশ পাথরের সন্ধানে সারাজীবন কাটাইয়া দেয়। সাধারণ মানুষের চক্ষে ইহারা পাগল। এই কবিতার ঐ 'ক্ষ্যাপা'ও তেমনই একজন; সে এই অতল অপার সৃষ্টি-রহস্যের সমুদ্রতীরে সেই 'পরশ পাথর' খুঁজিতেছে, তাহার শত ইঙ্গিতময় কল্লোলধ্বনি সে যতই শোনে ততই প্রাণের আকুলতা বৃদ্ধি পায়,—তরঙ্গতাড়িত বেলাভূমিতে যে উপলরাশি আদিকাল হইতে ঐ সমুদ্রের ক্রীড়নক হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যেই সে সেই মহাতত্ত্বের সন্ধান করে; তাহার বিশ্বাস, ঐ অতিক্ষুদ্র ও সামান্যের মধ্যেই বিপুল বিরাটের রহস্য নিহিত আছে, তাহারই স্পর্শে সর্ব্ব পদার্থ একই পরম পদার্থ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু মানুষের দেহ দুর্ব্বল, আয়ুষ্কাল পরিমিত; তাহার কামনা যত বড়, শক্তি সেই অনুপাতে বড়ই কম। এইখানে নিয়তির সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয়, সে যুদ্ধে সে হারিয়াও হার মানিবে না। ক্ষ্যাপার সেই সন্ধান দীর্ঘকালব্যাপী হইবারই কথা; কিন্তু দেহের ও মনের শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসে; ক্রমাগত নিষ্ফল সন্ধানের শেষে এমন অবস্থা হয় যে, অভ্যাসটাই থাকিয়া যায়, মন আর সজাগ থাকে না। এই অবস্থায় সেই ট্র্যাজেডি ঘটিল; সে একবার সেই অবস্থায়, দৈবক্রমে সেই তত্ত্ব—সেই ফরমুলাটি—পাইয়াছিল কিন্তু তখন তাহা লক্ষ্য ক'রে নাই। আজ হঠাৎ সেই পাওয়ার একটা প্রমাণ চোখে পড়িতেই সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; মানবভাগ্যের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি হইতে পারে? ঐ যে—

'ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা!'

—কবি যে কোথা হইতে এইরূপ ট্র্যাজেডির তথ্য আহরণ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-সাধকদের জীবনেতিহাস হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহারাই জ্ঞান-বারিধিকূলে সারাজীবন ধরিয়া উপলখণ্ড আহরণ করেন—সেই সব সর্ব্বত্যাগী মহাভিক্ষুর জীবন-সায়াহ্ন অনেকের পক্ষে যেমন করুণ, তেমনই, নিষ্ফলতা সত্ত্বেও তাঁহাদের সেই নিষ্ঠা—নৈরাশ্যের অন্ধকারেও সংকল্পের সেই দৃঢ়তা—মানুষমাত্রেরই নমস্য।

অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল 'ভর।
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

—কবি এমনই দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা "সেই হতাশের নিষ্ফলের দলে" যাহারা, তাহাদিগকে নিজ হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কিন্তু এমন কবিতাও,—এমন সুস্পষ্ট-সুন্দর রূপকও আমাদের অতিপণ্ডিত রসবেত্তাদের কাব্যব্যাখ্যায়—'শিব গড়িতে বানর গড়া'র মত—একটি নীতি উপদেশের বাহন হইয়াছে! সেই ব্যাখ্যা এইরূপ (বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য আমার)—

"মানুষ ক্ষ্যাপার মতো জীবনের দুর্লভ ক্ষণের অনুসন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে [দুর্লভ ক্ষণটি কি ?]···সে সদাই ভাবিতেছে স্পর্শমণি পাইলে জীবন সার্থক হইবে। [সে সদাই ভাবে! বোধ হয়, ভাবিয়া ভাবিয়াই পাগল হইয়াছে।] ··অর্থাৎ, জীবনকে পাইতে হইলে বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন পদার্থের স্পর্শ প্রয়োজন। ['জীবনকে পাওয়া'—কোন্ জীবন ? কেমন জীবন ? একটা জীবন তো সে পাইয়াছে।] কিন্তু কর্ম্মজীবনের মধ্য দিয়াই যে তাহার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া চলিয়াছে তাহা সে জানে না ; [ইহারই নাম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—'কর্ম্মজীবন' ও 'জীবনের 'পরিপূর্ণতা'—ইহার জন্য কোন তপস্যা করিতে হয় না, আপনিই তাহা হইয়া যায় ; কারণ, কর্ম্ম কে না করিতেছে ? বৃক্ষলতাও করিতেছে—ফুল ফুটাইতেছে, ফল ফলাইতেছে।] · দৈনন্দিন কর্ম্ম অভ্যাসের ফলে জীবনের পরম মুহূর্ত্তগুলিকে সে উপেক্ষা করিয়া চলে, তাহাদের দিকে ফিরিয়া তাকায় না। [তার কারণ, সে কবি নয়, তাহার সে অবকাশ নাই—তাই 'সুন্দর মুহূর্ত্ত' তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়। কি দুর্ভাগ্য!] অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করে তাহার অন্তহীন কর্ম্মশৃঙ্খলের ভিতর দিয়া জীবনের চরম সার্থকতাকে সে কোন দুর্লভ ক্ষণে লাভ করিয়া গিয়াছে। ['লাভ করিয়া গিয়াছে'—অর্থাৎ, 'লাভ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে' ; সে একটা এমন বস্তু যে, লাভ করিয়াও ফেলিয়া আসা যায়—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ বাহিরের বস্তু।] সে জানিতে পারে নাই কখন তাহার কঠিন লৌহময় জীবন স্বর্ণময় হইয়াছে। ['কঠিন লৌহময় জীবন'—তাহার ঐ লৌহশৃঙ্খলটা ? জীবন স্বর্ণময় হইল, কিন্তু সেই স্বর্ণময়তা তাহার চৈতন্যকে স্পর্শ করিল না—জীবনের সঙ্গে চৈতন্যের অস্পৃশ্যতা-সম্পর্ক এমনই!] . সেই পরশ পাথর সে পাইয়াছে বটে, কিন্তু জ্ঞানতঃ নহে। [কবিতায় আছে—সে পরশ পাথর পায় নাই, কেবল শিকলটা সোনা হইয়া গিয়াছে। তারপর, ঐ অজ্ঞানে-পাওয়ার কোন অর্থ হয় না--পূর্ব্বে বলিয়াছি।]·· ক্ষ্যাপা বোঝে না যে, সে যাহার সন্ধানে ফিরিতেছে তাহা কোন বিশেষ বস্তু নহে, সেটি জীবন-ধারার সমগ্র সাধনা, বিশেষের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান নিরর্থক। [যাক্! সমস্ত রূপকটাই বৃথা হইয়া গেল! ঐ বিশেষটাই রূপকের প্রধান অবলম্বন, উহাকে দিয়াই নির্ব্বিশেষের অর্থ করিতে হয়। তাহা হইলে 'পরশ-পাথর খোঁজার' কোন অর্থ নাই! ব্যাখ্যাটি অতি গভীর বটে ; ক্ষ্যাপা সেই "সমগ্র সাধনা"কে পাইয়াও বুদ্ধির দোষে হারাইয়াছে। কিন্তু 'সমগ্র সাধনা'কে তো 'জীবন-ধারা'র কোন একটা অংশে বা লগ্নে পাওয়া যায় না ; জীবনের সম্পূর্ণতা বা শেষ না হইলে সাধনার সমগ্রতা মিলিবে কেমন করিয়া ?]

[রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫

আমি উপরে ঐ যে ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করিলাম, এবং অন্বয়মুখে তাহারও একটু টীকা করিতে বাধ্য হইলাম, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে—রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদ ইতিমধ্যে কোন্ ব্রহ্মাস্বাদে পৌছিয়াছে! কবিতাটির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কবি যে চরিত্রটি ও তাহার যে সুমহতী সাধনার পরিচয় এত প্রকারে—উপমায় ও অর্থের ব্যঞ্জনায়—দিয়াছেন, এবং শেষে যে ট্র্যাজেডির মহিমাও নিজ কণ্ঠে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা রাত্র্যন্ধের অ-রসিকতা নিবারণ করিতে পারে নাই। ঐ ক্ষ্যাপা নাকি একটা বড় ভুল করিয়াছিল, সে যাহা খুঁজিয়াছিল, তাহা সংসারের বাহিরে—ঐরূপ নির্জ্জন বেলাভূমিতে মিলিবে না; তাই সংসারত্যাগী ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর মত ক্ষ্যাপার ঐ শাস্তি হইয়াছে। আসল কথা, কবি রবীন্দ্র শেষে যে, একটি ধর্ম্ম-মন্ত্রের গুরু হইয়াছিলেন সেই ধর্ম্মের তত্ত্বটি একালের এই কবিতার উপরেও আরোপ করিতে হইবে। সেই ধর্ম্ম-তত্ত্বের নাম—'স্বভাব-মুক্তি'; অর্থাৎ, কোন সাধনা বা তপশ্চরণের প্রয়োজন নাই, চাই প্রাকৃতিক জীবন-লীলার আনন্দ-সম্ভোগ, তাহাতেই নিঃশ্রেয়স-লাভ হইবে। তাই ক্ষ্যাপার ঐ কাহিনীতে কোন ট্র্যাজেডি নাই, সে সত্যই বুদ্ধিহীন, ছন্নমতি। তাহার ঐ পরিণাম দর্শনে সকল বুদ্ধিমান মানুষ যেন আশ্বস্ত হয়, বুদ্ধিহীনেরা সাবধান হয়।

কবিতা-পাঠ

দুটো নেত্র সদা যেন ··নিজের আলোকে। শুধুই উৎকৃষ্ট উপমা নয়—একটা চরিত্রকে, তাহার বাহিরের মূর্ত্তি ও অন্তরের পিপাসা সমেত একেবারে চিত্রবৎ চাক্ষুষ করিয়াছে। 'নিজের আলোকে'—উপমাটির সার্থকতা লক্ষণীয়, ক্ষ্যাপার পক্ষে—"নিজের দীপ্ত হৃদয়ের উৎসাহে।" এইরূপ উপমা রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তির একটি অনন্যসাধারণ লক্ষণ।

তার এত অভিমান—'কবিতা প্রসঙ্গ' দেখ।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু, ইত্যাদি। ঐ সিন্ধুই—বিরাট বিশাল সৃষ্টি-সমুদ্র। সে যেন কিছুতেই তাহার গোপন তত্ত্ব মানুষকে জানিতে দিবে না—তাহার সকল চেষ্টাকে পরিহাস করে। 'কুটিকুটি'—'কুটোকুটি'ও হয়।

কাম্যধন আছে কোথা, ইত্যাদি। ইহাই বৈজ্ঞানিকের সাধন-মন্ত্র! সৃষ্টির পরম রহস্য সৃষ্টির মধ্যেই আছে, উহার ভিতর দিয়াই তাহাতে পৌছিতে হইবে।

একদিন বহুপূর্ব্বে, ইত্যাদি। সমুদ্র-মন্থনের পৌরাণিক কাহিনীকে কবি একটি নূতন অর্থে অর্থবান্ করিয়াছেন; এখানে তাহা ঐ মূল রূপকটির সহিত কি চমৎকার মিলিয়াছে!

নিকষে সোনার রেখা। অনাদি অন্ধকারে প্রথম আলোর প্রকাশ। আলোকই বিধাতার আদি সৃষ্টি—এ কল্পনা অতি পুরাতন।

পা টিপিয়া—এই ইডিয়মটির অর্থ না জানা থাকায় অনেকের ইহাতে হাস্যোদ্রেক হয়। বাংলা ভাষার শিষ্ট রীতি (Standard usage) জানা না থাকিলে, সাহিত্য-রস—বিশেষ করিয়া কাব্যরস আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য যাঁহার সেই ভাষাজ্ঞান নাই, অতিবড় পণ্ডিত

হইলেও তিনি কাব্য-বিচারের অধিকারী নহেন। ঐ বাক্যটির সোজা অর্থ—'অতিশয় সন্তর্পণে', বা 'একাগ্রচিত্তে'।

বহুকাল দুঃখ সেবি', ইত্যাদি। দেবতারাও শেষে কাম্যধন পাইয়াছিলেন; ঐ সমুদ্র হইতেই 'লক্ষ্মী', অর্থাৎ পরম সৌন্দর্য্যরূপিণী, সর্ব্বদ্বন্দ্ব-নিরসনকারিণী সেই আনন্দ-প্রতিমার উদ্ভব হইয়াছিল।

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ। এই স্তবক ও পরের স্তবকে ক্ষ্যাপার নিঃসঙ্গ সাধনা ও নিষ্ফলতার বিষাদময় চিত্র, এবং পরে, এই রূপক-গল্পটির প্রধান গ্রন্থি যাহা, সেই ঘটনার বর্ণনা আছে। ক্ষ্যাপার অজ্ঞাতসারে তাহার কোমরের শিকল কখন এক নুড়ির স্পর্শে সোনা হইয়া যাওয়া—এই যে ঘটনা, ইহা যেমন পরশ-পাথরের প্রসিদ্ধি অনুসারে স্বাভাবিক, তেমনই ঐ একটির উপরেই রূপকের মূল মর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। মনে হয়, কবি এইরূপ একটা গল্প কোথাও শুনিয়া থাকিবেন, পরে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া এমন একটি তত্ত্বকে রূপময় করিয়া তুলিয়াছেন।

আশা গেছে…খোঁজার অভ্যাস। 'কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ।

আর সব কাজ ভুলি ওই তার ব্রত। পূর্ব্বে সমুদ্রের স্বভাব অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

কাম্যধন আছে কোথা   জানে যেন সব কথা
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।

—সম্ভবতঃ উহা ক্ষ্যাপারই দুইকালের দুইরূপ ধারণা।

ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা। ইহার মত হতাশ আর কি হইতে পারে। ইহাকেই বলে—"Sorrow's crown of sorrow"। বস্তুতঃ এই বাক্যটি একটি 'কবি-বচন' হইবার যোগ্য।

নুড়ি কুড়াইত কত। ঐ 'নুড়ি'র একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও করা যায়, এবং সে ব্যাখ্যা ক্ষ্যাপার ঐ পরশ-পাথর-সন্ধানের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়, যথা,—

"Nothing is clearer than that all things are all things... Did Sir Isaac think what he was saying when he made his speech about the ocean? Did he mean to speak slightingly of a pebble?...a body which knows all the currents of force that traverse the globe, which holds by invisible threads to the ring of Saturn and the belt of Orion!—a body from the contemplation of which an archangel could infer the entire inorganic Universe as the simplest of corollaries!—a throne of the all pervading Deity, who has guided its every atom since the rosary of heaven was strung with beaded stars

[O. W. Holmes: *Autocrat of the Breakfast Table*

—উপরের ঐ রচনাটিও একটি কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় আমাদের শালগ্রাম-শিলার তত্ত্ব উহাই।

পশ্চিম দিগ্‌বধূ দেখে সোনার স্বপন। ইহাকেই বলে কবি-কল্পনার অব্যর্থতা; একদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাও যেমন, অপরদিকে তাহা ঐ কাহিনীর ঐ লগ্নে কি গূঢ় অর্থ বহন করিতেছে! "পশ্চিম আকাশ সোনা হইয়া গিয়াছে"—সে যেন ক্ষ্যাপারই সেই স্বপন!

সে শকতি নাহি আর, ইত্যাদি। শেষের এই পংক্তিগুলিতে কবির হৃদয় ক্ষ্যাপার হৃদয়ে মিলিয়াছে; ইহা শুধুই সহানুভূতি বা অনুকম্পা নয়—এ যেন সেই মহামনা বীর-সাধকের "Grand attempt and grand failure !-কে কবি-হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন।

দুই পাখী

কবিতা-প্রসঙ্গ

(আর একটি রূপক-কবিতা; ভাব খুব সহজ, রূপকের রূপ-রচনাও যথাযথ হইয়াছে। বনের পাখী, অর্থাৎ মুক্ত-স্বাধীন মানুষ, যেমন, ইংরেজ, বা সেকালের কোন জাপানী ভদ্রলোক; খাঁচার পাখী, যেমন—আমরা; শাস্ত্রশাসন ও বিজেতার শাসন-শৃঙ্খলে মন পিঞ্জরাবদ্ধ। যদি দৈবক্রমে এই দুই মানুষ পরস্পরের বন্ধুতা কামনা করে, তবে কেহ কাহাকেও বুঝিতে পারিবে না; একজনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি, অপরের তাহাতেই ভয়। সবচেয়ে শোকাবহ এই যে, বন্দী অবস্থাই শেষে এমন সুখকর এবং শান্তিময় বোধ হয় যে, বাহিরের অজানাকে জানিবার ও নিজ শক্তির নব নব পরীক্ষার দ্বারা নির্ভয় হইবার বা আত্মপ্রসারের আনন্দ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষামাত্র থাকে না; এজন্য ঐ দুইজনের জগৎ স্বতন্ত্র—বন্ধু হইলেও সমপ্রাণ হওয়া অসম্ভব।) রূপকটির এইরূপ সহজ ব্যাখ্যা করা যায়, অন্যরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে—যদি তাহা সর্ব্বাংশে এইরূপ মিলাইয়া লওয়া যায়।

কবিতা-পাঠ

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব। ইহা স্পষ্টই অধীনতার কথা।

শিখানো বুলি তার। গুরু-উপদেশ বা শাস্ত্রবচন, স্বকীয় অনুভূতি বা আত্মপ্রত্যয়ের উল্লাস তাহাতে নাই। 'বনের গান' উহার ঠিক বিপরীত; মুক্তআকাশের তলে, বনস্থলীর শ্যামল শোভার প্রেরণায় কণ্ঠ আপনি সঙ্গীতমুখর হইয়া উঠে। আমাদের দেশে, এককালে কাব্যরচনাতেও স্বাধীন কল্পনা বা স্বকীয় অনুভূতির অবকাশ ছিল না; অলঙ্কার-শাস্ত্রের শাসনে ও বাঁধা পদ্ধতিব অনুসরণে সেই কাব্য কৃত্রিম ও জীবনাবেগ-বর্জ্জিত ছিল।

খাঁচাটি পরিপাটি—ঢাকা চারিধার। 'খোলা' চাই না, 'ঢাকা'ই স্বস্তিকর। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় এই জীবনের বিরুদ্ধে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ ও প্রতিবাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আছে; এই অসাড়তা ও তামসিক আত্মসন্তোষের 'অচলায়তন' তাঁহার স্বাতন্ত্র্য-পিপাসাকে ক্রমশঃ উগ্রতর করিয়াছে।

নিরালা সুখকোণে বাঁধিয়া রাখো আপনারে। তুলনীয়—

তার অলস বেদন করিবে যাপন
অলস রাগিনী গাহিয়া
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে বাখিয়া জীবন
ঘুমেব দোলায় দুলাবে।

['ভৈরবী-গান'—মানসী

তৎপরিবর্ত্তে—

পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে-উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে· ·
প্রাণ দিয়ে দুঃখ স'যে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভাল মন্দ সাথে।

['বঙ্গমাতা'—চৈতালী

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'শুধু দিন যাপনেব শুধু প্রাণধারণেব গ্লানি,
সরমেব ডালি,
নিশিনিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপেব
ধূমাঙ্কিত কালি ·

['বর্ষশেষ'—কল্পনা

শকতি নাহি উড়িবার। ইহাই মূল কথা, ঐ দীর্ঘ বন্ধন-দশা আত্মাকেই পঙ্গু করিয়া দিয়াছে।

যেতে নাহি দিব

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে, কবিং মন সেই Particular-কে কেমন Universal করিয়া দেখে—তাহারই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলিবে, আরও দেখা যাইবে, তাঁহার কল্পনাব রূপ (একটা দৃশ্য বা ঘটনা) কেমন রূপক হইয়া উঠে,—মনেব সেই শিল্পশালার দুয়ারটি এখানে খোলা রহিয়াছে। বাস্তব জীবনের একটি নিত্যকাব হৃদয়-বেদনা, এবং তাহাতে ঐ অবোধ অবুঝ বালিকা-কন্যার ব্যবহার—ইহা হইতেই কবির অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় নিজ কল্পনা-শক্তির যোগে, একটি বিশ্বব্যাপ্ত প্রেম-কাতরতা আবিষ্কার করিয়াছে। সেই প্রেম ঐরূপ বিদায় দেওয়ার নিয়তিকে স্বীকার করিয়াও, অন্তরে অস্বীকার করার একটি আশ্চর্য্যশক্তি ধারণ করে। এই তত্ত্বটিকে মানব-হৃদয় হইতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রসারিত করিয়া কবি এই অতি-

চঞ্চল জগৎ-দৃশ্যের মধ্যে একটা অচঞ্চল কিছুকে উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছেন, সে যেন—

চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবি মানব-জীবন ও মানুষের সংসারকে যখনই যে-রূপে দেখেন, তাহা মানবের দিক দিয়া যতটা, তার চেয়ে বেশি ঐ সৃষ্টিরহস্যের দিক দিয়া। এই কবিতাও একটি রূপক, তফাৎ এই যে, কবি নিজেই রূপকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কবিতা-পাঠ

প্রথমে একটি বাস্তব ঘটনার যতদূর সম্ভব নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—যেমন 'গানভঙ্গ' কবিতাটিতে। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের একটি অভ্যন্তর-দৃশ্য; বিদেশ যাত্রাকালে, আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথা দমন করিয়া, গৃহিণী ও স্নেহময়ী পত্নীকর্তৃক যতদূরসাধ্য স্বামীর প্রবাস-কালীন ছোট খাটো অভাব-মোচনের আয়োজন; বর্ণনাটিতে উৎকৃষ্ট গল্পের রীতি লক্ষণীয়। তারপর সেই অতিকরুণ বিদায়-সম্ভাষণ; মনে হইল বিদায়ের পালা এতক্ষণে শেষ হইল—কঠিন অস্ত্রোপচার শেষ হইল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এক অতিশয় অপ্রত্যাশিত দৃশ্য—"বাহিরে দ্বারের কাছে বসি' অন্যমনে কন্যা মোর চারি বছরের।" এইখান হইতেই কবিতা আরম্ভ; ঐ কন্যার আচরণ, তাহার হৃদয়ের অবুঝপনা কবির চক্ষে সহসা একটা Revelation বা দিব্য-দর্শনের মত উদ্ভাসিত হইল। 'মাগো আসি' তাহার উত্তরে—'যেতে আমি দিব না তোমায়'—এ যেন আর কাহার বাণী! যেন বিশ্বের জননী-হৃদয় ঐ কন্যার কণ্ঠে আপন অধিকার ঘোষণা করিতেছে।

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে…কী শকতি পেয়ে, ইত্যাদি। ঐ বয়সের ঐ অজ্ঞানই তো দিব্য-জ্ঞান; পরে আর সেই দিব্য-অনুভূতি থাকে না। ইংরেজ কবিও বলিয়াছেন—

Behold the child among his new-born blisses
A six years' darling of a pigmy size.

তারপর—

Thou, whose exterior semblance doth belie
  Thy soul's immensity .
Thou best philosopher, who yet dost keep
Thy heritage ; thou eye among the blind,
That deaf and silent, read'st the eternal deep,
Haunted for ever by the eternal mind.

[Wordsworth : *Ode : Intimations of Immortality*

শুভ্র খণ্ডমেঘ……..নীলাম্বরে শুয়ে। একটি উৎকৃষ্ট রবীন্দ্রীয় উপমা;

প্রাকৃতিক পদার্থকে এমন জীবিতের প্রাণী-রূপ দেওয়ার যে কবিকর্ম তাহাও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। তুলনীয়—

সাদা সাদা ডোবা-ডোবা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা-দেলা ভুলি।

[বিহারীলাল

কী গভীর দুঃখে মগ্ন, ইত্যাদি। এইখান হইতে ভাবুকতা বা দার্শনিক চিন্তাধারা সুরু হইয়াছে।

এ অনন্ত চরাচরে······সবচেয়ে পুরাতন, ইত্যাদি। সকল বিচ্ছেদ, সকল মৃত্যু বা নিত্য-তিরোধান সত্ত্বেও, একটা ধরিয়া রাখার চেষ্টা বা ইচ্ছা—সকল অস্থিরতার মধ্যে একটা স্থিতির আকাঙ্ক্ষা—যেন কিছুতেই নিবৃত্তি হইতে চায় না। সেই অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষার চির-অপূর্ণতাই সৃষ্টির সর্ব্বস্তরে একটি অপূর্ব্ব বিষাদের ছায়া সঞ্চার করিয়াছে।

নাহি শুনে কেউ, নাহি কোনো সাড়া। একদিকে অন্ধ জড়-প্রকৃতির ঐ নির্ম্মম লীলা, অপরদিকে চেতনার উচ্চস্তরে ঐ অসহায় ক্রন্দন। তুলনীয়—

এ প্রলয় মাঝখানে অবলা জননী প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী,
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন স্নেহময়ী।
* * *
জড়দৈত্য শক্তি হানে মিনতি নাহিক মানে
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এই দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙা গড়াময়,
চিরদিন অন্তহীন জয়-পরাজয়।

['সিন্ধুতরঙ্গ'—মানসী

[রবীন্দ্র-কবিমানসের সেই এক ভাববীজ এখানেও দেখা দিয়াছে]

আমি ভালবাসি যারে, ইত্যাদি। এই কারণে, এবং এই অর্থে প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়। আরেক কবির সেই বাণী স্মরণীয়—

"Man has but to will it and there shall be
no evil in the world." [Shelley]

—সেটা জীবনের বাস্তব-ক্ষেত্রে, নিয়তির সহিত সাক্ষাৎ-যুদ্ধে, এটা ভাবের ক্ষেত্রে—নিয়তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া। উভয়ের তত্ত্ব একই; মানুষের আত্মা আর সকলের চেয়ে বড়, সেই আত্মার শক্তি কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে সকল নশ্বরতাকে নস্যাৎ করিতে পারে। কিন্তু এখানে কবি বাহিরের ঐ পরাজয়কে—মানব-ভাগ্যের বাস্তব ট্র্যাজেডিকেই মহিমান্বিত করিয়াছেন।

সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। অন্তরের সেই দৃঢ়-প্রত্যয়—প্রেমের সেই অপরাজেয়তা, বিধিরই বিধান, নহিলে ক্ষুদ্র মানুষের অন্তরে ঐ আকাঙ্ক্ষা জাগিবে কেন? কিন্তু এত বড় বিশ্বাস সত্ত্বেও, অতি ক্ষীণ তনুলতার ঐ গর্ব্ব অশ্রুময় হইয়া উঠে, কারণ, ঐ অধিকার-ঘোষণা শুনিয়া 'মৃত্যু হাসে বসি'—ইহাও মানুষ বিস্মৃত হইতে পারে না।

মরণপীড়িত সেই চিরজীবী প্রেম। 'প্রেম চিরজীবী', তাহা মরে না—কেবল সে 'মরণ-পীড়িত', অর্থাৎ মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ-পীড়া তাহাকে সহিতেই হয়। উহাই সমগ্র জগৎকে একটি বিষাদ-কুয়াসায় ম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

চঞ্চল স্রোতের নীরে, ইত্যাদি। উপমাটি যেমন কবিত্বময়, তেমনই তত্ত্ব-গভীর। ঐ 'মেঘের মায়া'র কথা কবি পূর্ব্বে আরেকবার বলিয়াছেন—

যমুনার ঢেউ সন্ধ্যাবর্ত্তীন
মেঘখানি ভালবাসে,
এও চলে যায় সেও চলে' যায়,
অদৃষ্ট বসি' হাসে।

['মায়া'—মানসী

এখানে ঐ অশ্রুবৃষ্টিভরা মেঘই—প্রেম; 'নদীর চঞ্চল স্রোত'—জগৎপ্রবাহ, তাহাই মৃত্যুর স্রোত; সেই স্রোত একঠাঁই বসিয়া থাকে না, জলও এক জল নহে; উপরকার মেঘের ঐ ছায়া যেমন তাহার উপরে স্থির হইয়া থাকে, তেমনই প্রেমও চিরস্থির। এখানে মেঘের গমনশীলতা নয়, তাহার ছায়ার ঐ স্থিরতার সহিত স্রোতোজলের অস্থিরতার তুলনামাত্র করা হইয়াছে। উপমার কেবল ঐ দিকটাই গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বের কবিতাটিতে মেঘও একটা মায়া।

এই 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির সহিত 'বলাকা'-কাব্যের তুলনা করিলে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি বা কবি-মানসের যে পূর্ণ-রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এমনও বলা যাইতে পারে—এ কবিতার ঐ ভাব রবীন্দ্রনাথের এককালের কবি-ভাব মাত্র, 'বলাকা'য় যে কবি-মানসের অভিব্যক্তি আছে তাহাই কবিধর্ম্মের মূলমন্ত্র; তাহাই আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল কবি-প্রেরণার উপরে, অর্থাৎ, কল্পনার রসাবেশ বা কাব্যকলা-কুতূহলকেও গৌণ করিয়া, একটি ব্যক্তিগত, স্বতন্ত্র তত্ত্ববাদ (cult) রূপে বিদ্যমান্ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁহার কবিজীবনে, তথা সমগ্র কাব্যধারায় কবিদৃষ্টির যে একনিষ্ঠা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা কোন্ অর্থে কতখানি সত্য, পূর্ব্বে আমি তাহার আভাস দিয়াছি, পরে সে আলোচনার বহু অবকাশ মিলিবে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, কবিজীবনের সেই বাহিরের দিকটার—আমাদের মতে যেটা বড় দিক, সেই রস-সৃষ্টির দিক দিয়া—তিনি এক তীর হইতে অপর তীরে 'খেয়া'-পার হইয়াছিলেন; এককালে মানব-হৃদয়সুলভ ব্যথাকে যে ভাবে আরতি করিয়াছিলেন, পরে ঐ বিশ্বজীবন-বাদ, বা নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দ ও তাহার আনন্দবাদের দ্বারা তাহাকে একরূপ অস্বীকার করিয়াছিলেন—সকল বন্ধন ও নিয়তির নিয়মে বাস্তব সমস্যাকে

মূঢ়তা ও কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। 'বলাকা'য় কবি-মানসের সেই রূপান্তরের একটি মধ্যঅবস্থার পরিচয় আছে। তখন ঐ স্থিরতাই মিথ্যা হইয়াছে, সব কিছুকে বক্ষে বাঁধিয়া রাখিবার ঐ আকুলতা—ঐ প্রেমই একটা মোহ; ঐ যে—

প্রলয়সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে…
সম্মুখ উর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিবনা, দিবনা যেতে"।

—উহাই মূঢ়তা। বরং সেই 'চঞ্চলা'ই মঙ্গলময়ী, উহা আত্মার সকল বন্ধনপাশ যেমন মোচন করে, তেমনই সেই 'নটী' (নটরাজ-জায়া)—সেই 'চঞ্চল অপ্সরী'—

তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

এবং—

নিক তোবে টানি
মহাস্রোতে,
পশ্চাতেব কোলাহল হ'তে
অতল আঁধাবে, অকূল আলোতে।

['চঞ্চলা'—বলাকা

ঐ প্রেমও আত্মার গ্লানিকর একটি বন্ধন, তাই—

যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ-সিংহাসন…
দিয়েছ তা' ধূলিবে ফিরায়ে।

['শা-জাহান'—বলাকা

প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট মনোভাব—কবির প্রকৃতিগত একটা লক্ষণ হিসাবেই—আমি পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্র-কবিজীবনের এই মধ্যাহ্নকালে, কবির সেই আত্মতান্ত্রিক ভাবমন্ত্র ততখানি বিকাশলাভ করে নাই, কাব্যরসই জয়ী হইয়াছে, তাই আমরা এক্ষণে সেই রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যই মুগ্ধচিত্তে অনুসরণ করিব।

মানসসুন্দরী

কবিতা-প্রসঙ্গ

(এই অতিদীর্ঘ কবিতাটি সৌন্দর্য্যস্বপ্নাতুর কবিপ্রাণের একটি অলস-অবশ আত্মবিগলিত গীতোচ্ছ্বাস। ইহার প্রধান কাব্যগুণ—প্রেমিক-প্রেমিকার বাস্তব মিলনসুখ-সম্ভোগের জবানীতে কবির মানসবাসিনী অশরীরী সৌন্দর্য্য-দেবতার প্রতি প্রেম-নিবেদন; কিন্তু প্রেম অপেক্ষা সৌন্দর্য্যপ্রীতির তীব্র sensuousness-ই ইহার ভাষাকে ফেনোচ্ছল মদিরার মত সর্ব্বেন্দ্রিয়-

গ্রাহিণী করিয়াছে। এই কবিতায় কবি তাঁহার কবি-জীবনের আশা ও নিরাশা—সেই সৌন্দর্য্য-স্বপ্নের অন্তহীন আকুলতা, এবং এক অকূল অচিহ্নিতের পথে সুদূর-দুর্ল্লভের যে অভিসার, তাহার ক্লান্তি ও অবসাদ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই অতৃপ্তি তাঁহাকে যেন আর উদ্‌ভ্রান্ত না করে, যেন তাহা চিরতরে শান্ত হয়, এই বলিয়া দীর্ঘ কবিতার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন—

এসো তৃপ্তি, এসো শান্তি,
এসো প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি', শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি-শয়নে।

সমস্ত কবিতাটিকে কবি রবীন্দ্রের সেই পূর্ণযৌবন কালের একটি অকপট আত্মনিবেদন বলা যাইতে পারে; তাহাতে এই কয়টি লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ মানসসুন্দরী একান্তভাবে কবির নিজ জীবনের ইষ্টদেবতা, তাহা শেলীর Intellectual Beauty বা বিহারীলালের 'সারদা' নয়; অতএব তাঁহার কাব্যমন্ত্র আরও আত্মতান্ত্রিক, বা Egoistic। দ্বিতীয়তঃ, ঐ যে মানসী-কাব্যবধূর সহিত কবিরপ্রেমসুখ-সম্ভোগ, উহায় যাহা কিছু আর্ত্তি ও ব্যাকুলতা—সকলই সৌন্দর্য্য-প্রেমের 'মানস-পিপাসা', এজন্য ঐ 'মানসসুন্দরী' নামটিও বড় যথার্থ হইয়াছে; 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তিনি শেষে যে "নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা"র ধ্যান করিয়াছেন—এই 'মানসসুন্দরী'ও সেই একই দেবতা। উহাতে কবি-হৃদয়ের সেই প্রেম-পিপাসা নাই—যে-প্রেম মানব-হৃদয় ও বিশ্বজগৎ এই দুইয়ের মধ্যে সত্যকার যোগস্থাপন করে; সর্ব্বভয়, সংশয়, দুর্ব্বলতা ও আত্মপরায়ণতা দূর করিয়া মানবাত্মার মুক্তিসাধন করে, যাহার উদ্বোধনে কবিগণ এই মাটির পৃথিবীতেই মানুষের মর্ত্ত্যজীবনকে মহিমান্বিত করেন, অথবা—"They seek no wonder but the human face",—উহা সেই অধ্যাত্ম-গভীর হৃদয়-পিপাসা নয়, নিছক মানস-পিপাসার সৌন্দর্য্য-প্রেম। কবি শেলী তাঁহার কবি-হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, আত্মার আত্মীয় ('Sister of my soul'), সেই প্রিয়তমার উদ্দেশে গাহিয়াছেন—

"See where she stands! a mortal shape indeed
With love and life and light and deity
And motion which may change but cannot die;
And image of some bright Eternity:

এবং—

I know
That love makes all things equal, I have heard
By my own heart this joyous truth averred—
The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship blends with God...

[*Hymn to Intellectual Beauty*

সেই সৌন্দর্য্য-দেবতাকেই সম্বোধন করিয়া শেলী বলিয়াছেন—

"Thus let thy power, which like the truth
Of Nature on my passive youth •

Descended, to my onward life supply
Its calm—to one who worships thee,
And every form containing thee,
Whom, Spirit fair, thy spells did bind
To fear himself, and love all human kind.

[*Ibid*

বিহারীলালও তাঁহার 'সারদা'কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষে বিরাজমান,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা!

[সাধের আসন

রবীন্দ্রনাথের ঐ 'মানসী' বা কবিহৃদয়ের ঈশ্বরী যে কেমন সৌন্দর্য্যের আদর্শ-স্বরূপিণী তাহা কবির এই কথাগুলিতেই বুঝিতে পারা যাইবে—

কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি। সঙ্গীত তোমার
কতদূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে
বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম।...
বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে, আছে এক মহা উপকূল,
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

(—এই সৌন্দর্য্য জগৎ-সংসার বা মানবজীবন-সম্পর্কিত নয়, ইহা একটি অতিদূর দিব্যধামেই বিরাজ করে। ইহাই কবি রবীন্দ্রের সেই যৌবনকালের কবি-স্বপ্ন—অর্থাৎ পূর্ণপ্রস্ফুটিত জীবন-মুকুলের মানস-পরাগ; অতএব ইহাতেই তাঁহার কবি-প্রকৃতির একটা মূল লক্ষণ নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে।)

তথাপি, এ কবিতায় শেলীর প্রভাবও আছে। শেলীর সেই ইষ্টদেবতা মহাপ্রেমময়ী হইলেও, তাহার সৌন্দর্য্য মর্ত্ত্যের এই নশ্বরতায়—সুখ-দুঃখ, আলোক-আঁধারের অস্থির আবর্ত্তনে—স্থিরদীপ্তি ধারণ করিতে পারে না। তবু, সেই সৌন্দর্য্যের মূলে আছে প্রেমেরই দীপ্তি তাহা কবির ব্যক্তিমানসের সৌন্দর্য্য-পিপাসা নয়; তাই শেলী সে সৌন্দর্য্যের জগৎব্যাপী অধিষ্ঠান কামনা করিয়া এই জীবনে ও জগতে (শুধুই আত্ম-মানসে নয়), তাহার সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে—এমন কি, রক্তমাংসের মানবীরূপেও তাহাকে লাভ করিতে অধীর হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'তে তাহার ছায়া থাকিলেও, সে-কামনা শেলীর মত নয়; তাহা

প্রেম নয়,—নিছক সৌন্দর্য্য-পিপাসা। শেলীর 'এপিসাইকিডিয়নে'ও যেমন, তেমনই সমগ্রভাবেও তাঁহার কাব্যের মূলপ্রেরণা—একটা অতিগভীর আধ্যাত্মিক পিপাসা—রবীন্দ্রনাথের মত তাহা Intellectual বা মানস-পিপাসা নয়। সে কাব্যে ঐ পিপাসার সঙ্গীত একটি হোমাগ্নি-শিখার মত কাঁপিতেছে, তাহাতে প্রেমের অনল-দীপ্তি ছাড়া আর কিছু নাই। কিন্তু সেই অনল বাদ দিয়া কেবল ঐ দীপ্তিটুকুর—হৃদয়ের সেই প্রেমকে বাদ দিয়া কেবল ঐ সৌন্দর্য্যটুকুর পৃথক ধ্যান যদি সম্ভব হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের সেই সৌন্দর্য্য-ধ্যানকেও শেলীর সৌন্দর্য্য-ধ্যান বলা যাইতে পারে। শেলীর সেই "Spirit of Beauty" প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে প্রতিভাসিত হয় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণচ্ছায়ার মত; সেও এক অর্থে—abstract, অশরীরী; তাই তাহার নাম "Intellectual Beauty"। তথাপি তিনি তাহার ঐ মূর্ত্তি-ধারণ শুধু কল্পনা করেন নাই, সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তার কারণ—ঐ প্রেম; নিজের বাহিরে, বহির্জ্জগতে দোসররূপে তাহাকে পাইবার কামনা; সেজন্য বহির্জ্জগৎটাকেও চাই। রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'র ঐ মানবী-রূপধারণ—শেলীর কামনার মতই বটে, তথাপি একটা বড় পার্থক্য আছে; রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' রূপে ও অরূপে স্বচ্ছন্দচারিণী—'ব্যক্তিতে' ও 'অব্যক্তে' কোন বিরোধ নাই; তাহা কখনো 'ভাবময়', কখনো 'মূরতি',—

জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।

—সে একটা তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে—খাঁটি Intellectual; ভাব ও রূপ দুই-ই তাহাতে এক। এজন্য রবীন্দ্র-কবিমানসের অধিষ্ঠাত্রী ঐ মানস-সুন্দরী, জগৎ ও জীবনের বাহিরে—ঊর্দ্ধে অতিদূরে, কবিরই বাসনাবাসিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

(আরও একটি লক্ষণ আছে। কবিহৃদয়ের ঐ সৌন্দর্য্যের প্রেরণা মুখ্যতঃ সাঙ্গীতিক; এ কবিতায় কবি-প্রাণের সেই সাঙ্গীতিক মূর্চ্ছনা শুধু ভাষায়, ভাবে ও ঝঙ্কারেই তীব্র হইয়া উঠে নাই—বার বার ঐ সঙ্গীত কথাটির উল্লেখও লক্ষণীয়। এই সকল হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রকাব্যের মূল প্রেরণা যেমন সাঙ্গীতিক তেমনই তাহা অতি সূক্ষ্ম মানস-ধর্ম্মী (Intellectual)—তাহাতে খাঁটি সৌন্দর্য্য-প্রেম বা আর্টের রস-প্রেরণাই প্রবল।)

(অথচ এ কবিতায় কবি প্রিয়া-সম্মিলনের যে প্রেম-সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেই একটা বাস্তবের রং লাগিয়াছে। আর্ট যদি Imitation, বা বাস্তবের অনুকৃতি হয়, তবে বাহিরের জীবন হইতে এমন চিত্র উদ্ধৃত করা উৎকৃষ্ট আর্টের নিদর্শন; সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকেই 'স্বভাবোক্তি' অলঙ্কার বলে। তা ছাড়া, আর একটা নজীরও আছে; কবি তাঁহারই একটি কবিতায় ('বৈষ্ণব-কবিতা') বৈষ্ণব-কবির উদ্দেশে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার এই অত্যুচ্চ-ভাবস্বর্গ-বাসিনীর সহিত, তাঁহার সেই রাধার সহিত—ঐরূপ প্রেম-লীলার বর্ণনা পাঠ করিয়া বলিতে পারি—

'সত্য করে' কহ মোরে, হে রবীন্দ্র-কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি ?…)

বিজন বসন্ত রাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ? এত প্রেমকথা……
চুরি করে লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে ?'

['সোনার তরী'র এই কবিতাটিও 'সঞ্চয়িতা' হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে ! কি অপূর্ব্ব সঞ্চয়ন]

কবিতা-পাঠ

আজন্মসাধনধন …কবিতা, কল্পনালতা। অতি সত্য কথা ; রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-জীবন নাই বলিলেই হয় ; ঐ কাব্যসাধনাই তাঁহার সারাজীবন ব্যাপিয়া আছে । 'কল্পনালতা'—আদরের নাম, যেমন—'স্নেহলতা', 'স্বর্ণলতা' ; 'রাণী'ও এমনই আদরের ডাক—নামের সঙ্গে যুক্ত হয়, যথা—'উষারাণী', 'করুণারাণী' ।

এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা, ইত্যাদি। তীব্র রূপরসপিপাসা (sensuousness) লক্ষণীয়। তুলনীয়—

The sweetness seems to satiate the faint wind
And in the soul a wild odour is felt
Beyond the sense :

[Shelley : *Epipsychidion*

রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্ত হরষে। অনুভূতিই ভাষা হইয়া উঠিয়াছে শব্দযোজনা কি অপূর্ব্ব !

মুগ্ধ তনু মরি যায়…বুঝি টুটে টুটে। তুলনীয়—

And from her lips, as from a hyacinth full
Of honey-dew, a liquid murmur drops.
Killing the sense with passion.

[*Ibid*

অর্দ্ধেক অঞ্চল পাতি, ইত্যাদি। তুলনীয়—

এসো এসো বঁধু এসো,
আধ-আঁচোরে বোস.
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

[প্রাচীন গান

উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ, ইত্যাদি। এ ভাষা সম্পূর্ণ নূতন, উহার ঐ আলঙ্কারিক রীতি খাঁটি ইংরাজী। প্রথম খণ্ড—'পর্ব্বশেষে' দ্রষ্টব্য।

নবস্ফুট পুষ্পসম। উপমাটি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। বড় ফুলের কুঁড়ি প্রথমে নুইয়া থাকে, পরে ফুটিয়া উঠিলে তাহা উর্দ্ধমুখ হয়।

বসি মোর কোলে…অর্ধ-নিমীলিত আঁখি। কাব্যের আদিরস-উদ্দীপন ইহা অপেক্ষা মাত্রাপূর্ণ অথচ সংযত শোভন হইতে পারে না। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলির সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে, সেই রূপতৃষ্ণা আরও গভীর ও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

অন্ধকার নেমে আসে চোখে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

'বনের ছায়া ধরার চোখে দিয়েছে পাতা টানি'

['অপেক্ষা'—মানসী

এই উপমাটি কবির বড় প্রিয়; 'মানসী'র ঐ কবিতাতেই ছবিটি আরও সুন্দর হইয়াছে—

নিবিড় ঘন বনের রেখা আকাশ শেষে যেতেছে দেখা
নিদ্রালস আঁখির 'পরে ভুরুর মত কালো।

বিহারীলালেও আছে—

গন্ধ বায়ু ঝুরু ঝুরু,
কাঁপে তরুরেখা ভুরু,
আরামে পৃথিবীদেবী এখনো ঘুমায় রে।

['সাধের আসন'

ঐ একই উপমা পরে আরেকটি কবিতায় দেখা দিয়াছে—

নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো।

['বিদায়-অভিশাপ'

দোঁহে মোরা রব চাহি' অসীম নির্জনে। তুলনীয়—

'অন্ধকারে নিকট করে আলোতে করে দূর'

['অপেক্ষা'—মানসী

বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি…গ্রাসি। ভাষা একটু অস্পষ্ট, অর্থ—'বাহিরে' আর সবই অন্ধকারে—'বিষণ্ণ-বিচ্ছেদে'—পৃথক হইয়া আছে, কেবল আমরা দুইজন তাহার একপ্রান্তে নিবিড় মিলনে এক হইয়া আছি। 'বিষণ্ণ-বিচ্ছেদ'—ইংরেজী রীতি।

শুধু এক প্রান্তে তার·· প্রলয়মগন, ইত্যাদি। তুলনীয়—

'প্রলয়ে যেন সকল যায়, হৃদয় বাকি রাখে'

['অপেক্ষা'—মানসী

এবং—

.... We shall be one
Spirit within two frames, oh ! wherefore two ?
One passion in twin hearts ,......
One hope within, two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,
One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation.

[*Epipsychidion*

[এই পর্য্যন্ত 'মানসসুন্দরী'র আবাহন, এবং মিলনানন্দের কথা। ইহার পর কবির সহিত তাহার দীর্ঘ পরিচয়ের কাহিনী—কবির কবি-জীবনের পূর্ব্ব-ইতিহাস।]

পৃথিবীর প্রতিবেশিনীর মেয়ে। 'প্রতিবেশিনীর মেয়ে' বলিয়াই বাল্যপ্রণয় সম্ভব হইয়াছিল; অপর অর্থেও ইহা সত্য—পৃথিবী হইতে কিছু দূরে না হইলে কল্পনার প্রসার হইবে কেমন করিয়া? কবিতাটির এই অংশে কবির অন্তরবাসিনী কবিতার personification একটি পৃথক কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্যে আমরা কবির কবিতা-বধূর যে পরিচয় পাই, এবং 'জীবন-স্মৃতি' প্রভৃতি আত্মকাহিনীতে কবির বাল্যজীবনের যে চিত্র আছে তাহাই এখানে একটি রূপকের ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে; ইহাতে কবির সেই একেশ্বরী প্রিয়ার প্রতি প্রেম কেমন পূর্ণ-কণ্ঠে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও লক্ষণীয়।

দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, ইত্যাদি। এই চিত্র এতই বাস্তব যে, মনে হয়, ঐ 'মানসী' এককালে কোন কিশোরী বা নব-যুবতীর রূপে কবির মনোহরণ করিয়াছিল। সেই বয়সের কবিতাতেও ইহার আভাস আছে। ('প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য)

সহসা চকিত হয়ে··মহিষীর মত। এই সময়টির কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'মানসী' হইতে কবির 'অন্তঃপুরে, গৌরবের ভরে মহিষীর মত' কাব্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। প্রথম দুই লাইনে মিলের দোষ আছে (সঙ্গীতে—হ'তে), এমন দোষ রবীন্দ্র-কাব্যে নাই বলিলেই হয়, তাই চোখে লাগে।

সুন্দর শাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> একদা সুক্ষণে
> আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে,
> চন্দন-চর্চ্চিত ভালে, রক্ত পট্টাম্বরে,
> উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীতে।

['স্বর্গ হইতে বিদায়'—চিত্রা

এখন হয়েছ মোর...জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পরে কবি তাঁহার কবি-জীবনের নিয়ন্তাবোধে 'জীবন-দেবতা'-রূপে যাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাহা যে কোন্ অনুভূতির স্ফুটতর রূপ, এই কবিতায় তাহার প্রমাণ আছে। কবি-জীবনের আরম্ভেই তিনি যে একটি অপরা-শক্তিকে, কখনো বাহিরে, কখনো অন্তরে, তাঁহার কবিকর্ম্মের প্রেরণারূপিনী বলিয়া বরণ করিয়াছেন, এখানে তাহাকেই আরও গভীর ও একান্তভাবে, নিজ অন্তরবিহারিণী 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী' রূপে দৃঢ়প্রত্যয় করিয়াছেন। 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতাটিতেও ইহাকেই তাঁহার অন্তর-পুরুষরূপে দর্শন করার কথা আছে। পরে তাঁহার কবিমানসের পূর্ণতর বিকাশকালে ঐ শক্তিই কবির গূঢ়তর ও বৃহত্তর ব্যক্তি-সত্তার প্রতীকরূপে বন্দিত হইয়াছে। ঐ প্রেম তখন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে—তখন এই 'মানসসুন্দরী' কাব্যসাধনার মন্ত্র-গুরুরূপে পূজা পাইয়াছে। তাহারও পরে ঐ 'অন্তর-পুরুষ' একটা 'বড়-আমি' হইয়া তাঁহার কবিজীবনের ও কাব্য-সাধনার শেষ পর্ব্বে কোন্ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিব—

'চিত্রা'র 'জীবন-দেবতা' কে, তাহাও যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে। আসলে, ঐ যে একটি আত্ম-জিজ্ঞাসা উহা আদৌ নূতন নয়, কবির আত্মমুখী ভাবনায় তত্ত্বটি অনেক আগে কবি-চিত্তে মূল বিস্তার করিয়াছে।

কোথা সেই অমূলক হাসি অশ্রু, ইত্যাদি। কবি তাঁহাব সেই বাল্যরচনাগুলির কথা বলিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বর্ত্তমান রচনায় সুপরিণত কাব্যশ্রীও বর্ণনা করিতেছেন। "পরির্ণ-দেহ মঞ্জরিত বল্লবীর মত"—ইহা তাঁহার কবিতার ভাষা; সে যে কেমন তাহা আমরা দেখিতেছি। "স্বর্ণবীণা তন্ত্রী হতে বণিয়া রণিয়া"—ইত্যাদি—সেই ভাষার অপূর্ব্ব শব্দ-ঝঙ্কার, 'স্বর্ণবীণা'ই বটে!

কোন্ বিশ্বপার আছে তব জন্মভূমি, ইত্যাদি। কবিতা-প্রসঙ্গ দেখ।

গানের পুলকে বিমুগ্ধ কুরঙ্গসম। আমি রবীন্দ্র-কাব্যের এই সঙ্গীত-প্রেরণার কথা বার বার বলিয়াছি—এ কাব্য মুখ্যতঃ সঙ্গীতাত্মক। শেলীর কাব্যও সঙ্গীত—অগ্নিশিখার মত আকাশমুখী; তাহাতে আত্মার ঐ পিপাসা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে একটা বড় ভাবকে বাহন করিয়া; সেই ভাবই মুখ্য। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গীত ভাবকে আশ্রয় করে ঐ সঙ্গীত-রসের আলম্বন-স্বরূপ, কবির প্রাণ যথার্থই সেই সঙ্গীতের সুরেই কুরঙ্গের মত মুগ্ধ। এই সঙ্গীত-পরায়ণতার কথা কবির অনেক কবিতায় আছে; 'পুরস্কার' শীর্ষক কবিতায় কবি এই সঙ্গীতেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—

> যে রাগিণীসদা গগন ছাপিযা
> হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিযা,
> অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিযা
> বিশ্বতন্ত্রী হ'তে।
> যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিযা
> চিত্ত কুহরে উঠে কুহরিয়া—
> অশ্রু-হাসিতে জীবন ভরিযা
> ছুটে সহস্র স্রোতে।

['পুরস্কার'—সোনার তরী

আমি যে সৌন্দর্য্য-পিপাসার কথা বলিয়াছি, তাহাও ঐ সঙ্গীত-রসের সগোত্র, ('প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য)। মনে রাখিতে হইবে—সঙ্গীত সকল আর্টের, সকল কলাবিধির আদি আদর্শ।

এর কোন ভাষা আছে ···কোন তৃপ্তি আছে?—তাই সঙ্গীতই সেই পিপাসা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার, ইত্যাদি। এই অপার বিস্ময় ও আকুল উৎকণ্ঠা কবি একটি পৃথক কবিতায় আরও কাতরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

> আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।
> বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্ত গিরির চরণতলে।
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না বলে॥

['নিরুদ্দেশ যাত্রা'—সোনার তরী

আছে এক মহা-উপকূল মোদের দোঁহার গৃহ। এই সৌন্দর্য্য-পাথারের কূল নাই, তাই বাসনারও তৃপ্তি নাই। তবু প্রাণ বলিতেছে, একটা কোথাও ইহার কূল বা বিশ্রাম-স্থান আছে, সে আর কিছু নয়—তোমার সহিত মিলন, সেই অনন্তে লীন হওয়ার নামই এই সৌন্দর্য্যের পারে-যাওয়া। সেই মিলন-তীর্থেই 'মোদের দোঁহার গৃহ'—এই অকূলের কূল-চিহ্ন। এই যে মিলন-পিপাসা—ইহা সৌন্দর্য্যরসে ডুবিয়া একরূপ ব্রহ্ম-সমাধির আকাঙ্ক্ষা। শেলীও এইরূপ 'মোদের দোঁহার গৃহ' মনে মনে গড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা জীবনেই প্রেমামৃত আস্বাদনের জন্য, কেবল, পৃথিবীর এই সৌন্দর্য্য-প্রকৃতির এই মনোহর চিত্রপট—সেই মিলন-বাসর মধুরতর করিয়া তুলিবে।—

Be this our home in life...
...meanwhile
We two will rise sit and walk together
Under the roof of the blue Ionian weather...
Or linger where the pebble-paven shore
Under the quick faint kisses of the sea
Trembles and sparkles with ecstasy,
Possessing and possessed by all that is
Within that Calm circumference of bliss,
And by each other, till to love and live
Be one

[*Epipsychidion*

—এখানেও সৌন্দর্য্যরস-বিভোরতা কম নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্য, প্রেমকেই উজ্জীবিত করে—**'till to love and live be one'**।

হাসিতেছ ধীরে। এইখানে আরেকটি পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে, কবি তাঁহার 'মানসী'র সহিত পূর্ণমিলনের অচেতন-পুলক আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ হরণ করি লহগো সবলে। তুলনীয়—

এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে' ...
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে'—
অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ।

['পূর্ণমিলন'—কড়ি ও কোমল

নগ্নবক্ষে বক্ষ দিয়া···তোমার তরঙ্গ-পানে। তুলনীয়—

And we all talk, until thought's melody
Become too weak for utterance...
Our breath shall intermix, our bosoms bound
And our veins beat together.

[*Epipsychidion*

শুধু ভুলে গিয়ে বাণী কাঁপিব সঙ্গীতভরে। ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তরতর প্রেরণা।

দাও সেই প্রকাণ্ড প্রবাহ······উদ্দাম চলিয়া। জীবন অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে পূর্ণতা নাই ; ঐরূপ এক বিপুল সঙ্গীতময় উচ্ছ্বাসে এই ক্ষুদ্রতা ও শূন্যতা পূর্ণ করিয়া, এক মুহূর্ত্তে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে বাসনা হয়।

এইখানে আরেক পর্ব্ব শেষ হইল। এইবার কবির ভাবনা-কল্পনা আরেক দিকে ফিরিয়াছে ; ইহাতেও শেলীর প্রভাব আছে।

পরজন্মে তুমি কি গো, ইত্যাদি। এ কল্পনার মূলে আছে সেই 'ভাব ও রূপে'র নিত্য-সম্বন্ধ—'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি'। তুলনীয়—

In many mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought.

[*Epipsychidion*

শেলীর কল্পনায় পরজন্মও যেমন নাই, তেমনই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকার কল্পনাও নাই ; তার কারণ, শেলী নিছক সৌন্দর্য্যের পূজারী নহেন।

এখন ভাসিছ তুমি, ইত্যাদি। এখান হইতে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে সকল মূর্ত্তি-রচনা (personification) করিয়াছেন, তাহা কবিদের স্বাভাবিক কবিত্ব-বিলাস—সেই 'mytho-poetic imagination' ; এ কবিতার কবি-স্বপ্নের পক্ষে উহা বড় উপযোগী হইয়াছে।

সন্ধ্যার কনকবর্ণে, ইত্যাদি। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক যতকিছু সৌন্দর্য্যের মধ্যে। তুলনীয়—

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল······
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,
অয়ি অসম্বৃতে।

['উর্ব্বশী'—চিত্রা

শরৎ-প্রত্যুষে উঠি······বকুলতলায়। কবি কীট্‌স্‌ও (Keats) শরৎ-লক্ষ্মীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

Sometimes whoever seeks abroad may find
Thee sitting careless on a granary-floor,......
Or on a half-reaped furrow sound asleep,

Drowsed with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers :

[*Ode to Autumn*

একেলা বসিয়া যবে···মাতৃহীন বালকের মতো। এখানে 'মানস-সুন্দরী' শুধুই প্রেয়সী নয়—করুণাময়ী মাতৃরূপিনীও বটে ; অতএব, এখানে বিহারীলালের 'সারদা'র একটি চকিত আভাস আছে ; সেই 'সারদা' একাধারে সবই, এবং বিশেষ করিয়া—'করুণাময়ী'।

স্তব্ধ রজনীর প্রান্ত হ'তে······নয়ন চুম্বন কর, ইত্যাদি। তুলনীয়—

She hid me as the moon may hide the night ..
From its own darkness .....
And sat beside me, with her downward face
Illumining my slumbers···
And I was laid asleep, spirit and limb.

[*Epipsychidion*

সেই তুমি মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা, ইত্যাদি। এইখান হইতে আবাব যে বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বের চিত্রগুলির কোন মূলগত পার্থক্য নাই ; ওখানে ব্যাপ্তির মধ্যেও যে-রূপ এখানে ব্যক্তিতেও তাহাই পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে ; অতএব এখানে ভাবের অতি বিস্তার আছে।

সর্ব ঠাঁই হতে······করিয়া হরণ। ইহা কবির কবি-মানসের একটি স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া ; তাঁহার কাব্যে প্রায়ই রূপসৃষ্টির অন্তরালে একটা রূপকের—নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা থাকে।

শ্রাবণে দিগন্তপারে, ইত্যাদি, তুলনীয়—

হেরিয়া শ্যামলঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

['নব-বিরহ'—কল্পনা

সে দৃষ্টি না জানি······পরিপূর্ণ বাণীভরে নিশ্চল নীরব। পূর্ব্বে আছে 'নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া অন্তর রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া', ইহা তাহারই প্রকার ভেদ। তুলনীয়—

And it die
In words to live again in looks, which dart
With thrilling tone into the voiceless heart
Harmonizing silence without a sound.

[*Epipsychidion*

জানি, আমি জানি, সখী, ইত্যাদি। আরেক ভঙ্গিতে সেই একই ভাবের পুনরাবৃত্তি।

আমার অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা, ইত্যাদি। তুলনীয়—

আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা,
তুমি আমারি যে তুমি আমারি।
মম অসীম গগন বিহারী।

['মানস-প্রতিমা'—কল্পনা

মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতে ঠিক ইহাই আছে। বর্ত্তমান কবিতায় কবি এই কথাই পূর্ব্বে আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

> মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
> অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
> এখনি ইন্দ্রিয়-বন্ধ বুঝি টুটে টুটে!

এই অতিদীর্ঘ কবিতায় অতিবিস্তার যেমন, তেমনই পুনরুক্তি-দোষও ঘটিয়াছে;—কবিতাটি ভাবঘন না হইয়া সুর-দীর্ঘ হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল বড় কবিতাই এইরূপ।

বাজিবে তোমার সুর ....সদা সুমঙ্গলজ্যোতি। তুলনীয়—

> Thy light alone like mists o'er mountains driven
> ......Or moonlight on a midnight stream
> Gives grace and truth to life's unquiet dreams.

[Shelley : *Hymn to Intellectual Beauty*

কার এত দিব্যজ্ঞান, ইত্যাদি। অর্থাৎ, তুমি যে মানবী-রূপ ধারণ করিতে পারো না, ইহা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? কবি ইতিপূর্ব্বে একটা বড় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন —'কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি', এখানে পুনরায় তাহারই অবতারণা করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে প্লেটোর 'Doctrine of Ideas' স্মরণীয়; তাহাতে উক্ত গ্রীক্ দার্শনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দৃশ্যজগতে যত 'মূর্ত্তি' আছে, তাহাদের প্রত্যেকের একটি ভাবময় আদি-রূপ অদৃশ্য জগতে বিদ্যমান আছে। এই তত্ত্বটি এমনই মৌলিক ও চমকপ্রদ যে ইহার অনুভাবনায় যুরোপীয় কবি ও দার্শনিকদের মানসে একটি ভাব-সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে; 'Platonic' কথাটিও ঐরূপ Idealism-এর অর্থ বহন করে।

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> Music when soft voices die
> Vibrates in the memory—
> Odours, when sweet violets sicken
> Live with the sense they quicken...

[Shelley

ঐ একই উপমার এখানে একটু অর্থান্তর আছে,—এখানে ঐ সূক্ষ্মরূপে স্থূলের ব্যাপ্তির কথাটাই আসল।

অন্যত্র—

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
> গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।...
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

['আবর্ত্তন'—উৎসর্গ

গৃহের বনিতা ছিলে, ইত্যাদি। বিহারীলাল ঠিক ইহার উল্টা তত্ত্বের উপরে জোর দিয়াছেন—

মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে,
যে যেমন তার ঘরে
তেমনি মুরতি ধরে।

[সাধের আসন

এবং—

তোমার মুরতি ধরে'
কে এসেছে মোর ঘরে ? .....
প্রেম স্নেহ ভক্তি ভাবে দেখি অনিবার
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার !

[ঐ

এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে, ইত্যাদি। ইহাই সেই "ব্যক্ত ও অব্যক্তের" তত্ত্ব, ['কড়ি ও কোমলে'র 'প্রাণ' কবিতাটির কবিকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য] এই ভাব-বীজটিও কবি-মানসে একটি দৃঢ় সংস্কাররূপে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়—কবি যে সৌন্দর্য্যের ধ্যান করেন ঐ তত্ত্বই তাহাকে সমূলক করিয়াছে। পরে এই ভাব-বীজটিকে তিনি একটি মন্ত্রের আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া -আসা—
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

['আবর্ত্তন'—উৎসর্গ

রজনী গভীর হ'ল, ইত্যাদি। এতক্ষণে কবি আপন অন্তর হইতে বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইলেন। পদ্মাতীরে রাত্রি নামিয়াছে, সেই রাত্রির রূপ ও পল্লীজীবনের একটি করুণ মাধুর্য্য তাঁহার সেই ভাবাবস্থার সঙ্গে মিলিয়া গেল--বিশ্বপ্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্যকেই তিনি একটি বিশেষ রূপে ধরণীর এক প্রান্তে, জলস্থল ও আকাশে নিরীক্ষণ করিয়া এক অপরূপ বেদনার অশ্রুভারে বিবশ হইয়াছেন।

অর্ধ-অচেতন ভাবে মনোমাঝে পশি ইত্যাদি। কবি এতক্ষণ ভাবের আবেশে আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাতেই মগ্ন ছিলেন, এখন নিজের সেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইতেছে—সন্দেহ হয়, সে কি সত্য ? এই কথাগুলির দ্বারা কবি কৌশলে তাঁহার সেই ভাবনা-কামনায় যে আত্মাভিমান প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা সম্বরণ করিয়াছেন ; সেই সঙ্গে গভীর পিপাসার গভীরতর অতৃপ্তি—সকল মহৎ কামনার যে দুঃখ, তাহাও অনুভব করিয়াছেন। নিরাশার এই গভীর বেদনা হইতে কোন ভাবপন্থী (Idealist) কবিরই অব্যাহতি নাই ; শেলীও শেষে এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছেন—

Woe is me!
The winged words on which my soul would pierce
Into the height of Love's rare Universe
Are chains of lead around its flight of fire
I pant, I sink, I tremble, I expire!

[*Epipsychidion*

অন্তহীন অশ্রু পারাবার উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে। তুলনীয়—

Tears, idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart and gather to the eyes!

[Lord Tennyson

এখানেও সেই—"Tears from the depth of some divine despair"।

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি, ইত্যাদি। 'নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে'—কারণ, উহাই একমাত্র উপায়। পূর্ব্বে কবি একবার 'মানস-সুন্দরী'র 'মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি' এবং ঐরূপ ঘুম পাড়ানোর কথা বলিয়াছেন—'তরুণ করুণাময়ী দাও তুমি দেখা' ইত্যাদি। পরে এই কাব্যের আরেক স্থানে কবি ঐ মানসসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় এই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

এখন বারেক শুধাই তোমায়—
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে।
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না বলে।

['নিরুদ্দেশ যাত্রা'—সোনার তরী

—এমনই একটা ক্লান্তি ও অবসাদের সুর এই কাব্যের প্রথম কবিতাটিতেও দেখা দিয়াছে ('সোনার তরী'); সেখানেও—'কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' এবং এখন 'আমারে লহ করুণা করে'।

('মানস-সুন্দরী' কবিতাটির কাব্য-সৌন্দর্য্য কেমন, ইহার ভাষার সঙ্গীতোচ্ছল রূপরসই যে ইহার প্রধান গৌরব, সে কথা বলিয়াছি; ইহাও বলিয়াছি যে, আত্মভাবাবেশের অবশ কল্পনা কবিতাটির ভাবসংহতি ও গঠন-সৌষ্ঠব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তথাপি, ভাষার ঐ অপূর্ব্ব গীতঝঙ্কার ও বর্ণনার অতিসূক্ষ্ম বর্ণবিলাস ভাবুকতার সহিত যুক্ত হইয়া কবিতাটিকে যেন একটি দীর্ঘ গীতিসুরে পরিণত করিয়াছে; অর্থাৎ, ভাবের কোন সুসম্বদ্ধ পারম্পর্য্য না থাকিলেও, ইহাতে একটি ভাবাবস্থার (mood) পূর্ণ প্রতিবেদন আছে—গানের ধর্ম্ম তাহাঁই।

কবিতা হিসাবে ইহাতে একটি স্পষ্ট ও পৃথক ভাববস্তু নাই; তাহার কারণ, কবি ইহাতে 'অর্দ্ধ-অচেতনভাবে, স্বপ্ন-মুগ্ধ মতো' আপন কবি-হৃদয়ের সহিত স্বগত-আলাপ করিয়াছেন, তাহাতে ভাব ও অভাব, তৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা, সম্ভোগ ও বেদনা, রূপপিপাসা ও তত্ত্ব-

জিজ্ঞাসা—সকলই কেবল একটি ভাবাবস্থাকে আশ্রয় করিয়া তরঙ্গিত হইয়াছে মাত্র; সেই তরঙ্গগুলির উপরে কবির যে মানসধর্ম্ম ক্ষণে ক্ষণে আলোকপাত করিয়াছে—কবির যে আত্ম-পরিচয় আছে, তাহাই মূল্যবান। 'কবিতাপাঠ'কালে আমি সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-প্রেরণা কি; কবি-মানসের বিকাশে সেই প্রেরণা কোন্ তন্ত্রের বা তত্ত্বজিজ্ঞাসার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; অন্য কবিদের সহিত তুলনায় তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কিরূপ; ঐ সৌন্দর্য্যবাদের Idealism কবিকে কোন্ ভাব-জগতে উত্তীর্ণ করিয়াছে;—তাহা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছি। কবি-মানসের সেইরূপ পরিচয়ের দিক দিয়া এই কবিতা সার্থক হইয়াছে। ঐকাল পর্য্যন্ত কবি কর্ত্তৃক নিজ-কবিমানসের ঐ stock-taking—তাঁহার এ-যুগের কাব্যগুলির আর্ট বা রসরূপ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। উহাই কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-যুগ—একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্থাৎ, কি কল্পনায়, কি রূপ-রসে [পরবর্ত্তী যুগের নিছক ভাবসাধনা, বা মানস-প্রধান (Intellectual) কাব্যকলার বাণীরূপ-সৃষ্টিতেও নয়] এই কালের কাব্যেই কবি-প্রাণ ও কবি-রবীন্দ্রের কবি-প্রতিভার যুগপৎ পূর্ণস্ফূর্ত্তি হইয়াছে।

দুর্বোধ

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই প্রেম-কবিতাগুলি 'মানসী'র কবিতাগুলিরই জের; কেবল লক্ষণীয় এই যে, এগুলি শুধু ভাবে নয়, ভাষায় ও রচনা-নৈপুণ্যে আরও উপভোগ্য হইয়াছে। প্রেমের প্রবলতর আবেগ (Passion) অথবা গভীর হৃদয়ানুভূতি (feeling) অপেক্ষা সেই মানসিক উৎকণ্ঠাই এই সকল কবিতায় একটি নূতন রস-রূপ সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রেম অতিশয় আত্মসচেতন, প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়ের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ব্যবধান কিছুতেই ঘোচেনা; তাই শুধুই হৃদয়ে অনুভব করিলে বা পাইলেই চলিবে না—বুঝিতে হইবে। যে-প্রেম না বুঝিয়া 'পায়', এবং সেই 'পাওয়া'য় না-পাওয়ায় কোন পৃথক হিসাব থাকে না—যে-প্রেম সকল বুঝা ও না-বুঝার উপরে, ইহা সেই প্রেম নয়। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। তথাপি, এ প্রেম যেমনই হোক, এ কবিতায় যে একটি রস আছে—এবং সাধারণ নরনারী-জীবনের ঊর্দ্ধে একটা যে সূক্ষ্ম কামনা-বেদনার মনোজীবন আছে, তাহার চিত্রও কম উপভোগ্য নহে।

কবিতা-পাঠ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে। প্রণয়ীর মূল বক্তব্য এই যে—'আমার প্রেম' বলিতে 'আমার সমগ্র হৃদয়', সে হৃদয় তো সামান্য নয়—যেমন বিশাল, তেমনই গভীর; তাই তাহা বুঝিতে না পারাই স্বাভাবিক। তুমি বুঝিতে পারো না, কিন্তু আমি আমার হৃদয়ের সেই অসীমতা দেখিয়া বিস্মিত হই। এ কবিতায়, প্রণয়ী তাহার ভালবাসা নিবেদনের ছলে নিজেরই

প্রেমিক হৃদয়ের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে; উহার ঐ প্রেমও প্রকারান্তরে আত্মপ্রেম। প্রণয়িনী যে তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ,—প্রণয়ীর সেই প্রেমে আত্মদান নাই—পরকে আপন করা নাই; সে আপনাতেই আপনি বিভোর হইয়া থাকে, প্রেমকে একটা ভাবরূপে আস্বাদন করিয়াই চরিতার্থ হয়। এখানেও প্রেমিকের ঐ উক্তিগুলির সহিত তুলনীয়—

'সমগ্র মানব তুই পেতে চাস
একি দুঃসাহস।'

—এই জন্যই বুঝিতে না পারাই তো স্বাভাবিক।

দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা। অদ্ভুত 'দেওয়া' বটে! 'ধারণা' করিতে দেওয়া! এ ভালবাসার 'ধারণা' চাই, অর্থাৎ প্রাণে নয় মনে বুঝিতে হইবে।

এ যদি শুধু হইত মণি, ইত্যাদি। পুরাণো প্রেমের গানে নায়িকার দুঃখ তাহাই, মণি বা ফুলের মত সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিয়া নিত্যসঙ্গ লাভ করিতে চায়, তাহাতেই তিলেক বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা ও ঘনিষ্ঠ মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

'মণি নও মানিক নওযে হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নওযে কেশের করি বেশ'।

[প্রাচীন গীত

অথবা—

কহে একজন লয় মোর মন
এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া
হ'রে মিলাইয়া পরিবে সাজে॥
আর জনে কয় এই মহাশয়
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদি জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥

[ভারতচন্দ্র

এখানে কিন্তু ঐরূপ নিরন্তর নিবিড় মিলন-সুখই প্রেমের নিঃশ্রেয়স নয়, প্রেমাস্পদের মনখানি সম্পূর্ণ জানিতে না পারিলে প্রেমের নিঃসংশয়তা ঘোচেনা।

এ তবু তোমার রাজধানী। প্রণয়িনী না জানিলেও প্রণয়ীর দুঃখ নাই—সে তো নিজে জানে। তাহার প্রেম কত মহৎ। ঠিক এই ভাবটিই আরেক ভঙ্গিতে 'মানসী'র এক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে, সেখানে নায়িকাই নায়ককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছে—

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাওনি যদি দেখিতে পাবে না আর
মিছে মরি ব'কে।

["আমার সুখ"

এ প্রেম সর্ব্বত্রই একার প্রেম, এবং তাহা ব্যক্তির আত্মমানসেই চরিতার্থ হইয়া থাকে। আবার কল্পনায় প্রেমকে (প্রেমিকাকে নয়) অসীম সুন্দর করিয়া প্রাণ গীতিরসে অভিষিক্ত হয়; কোন 'মানবী' নয়—তাহার মানসী-প্রতিচ্ছায়াই সে-প্রেমের রাজধানীতে রাণী হইয়া বিরাজ করে।

গভীর হৃদয় মাঝে····· ধ্বনির মতন। ইহাই উৎকৃষ্ট কাব্যরস, ভাষায় ও ভাবে একটি চমৎকার গীতিসুর সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ঐ সঙ্গীত—অনন্তের; উহার ঐ হৃদয়-বিধুরতা, তাহার সহিত কোন রক্ত-মাংসের প্রেমিকার সম্পর্ক নাই। এ যেমন প্রেমের কবিতা, তেমনই আধুনিক যুগের এক ইংরেজ কবি (Rupert Brooke) 'প্রেমহীন' কবি-মানসের যে একটি স্বীকারোক্তি রচনা করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে পাঠ করিবার উপযুক্ত; আমি তাহার একটি বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—কাব্যরসপিপাসু পাঠক তাহা হইতে কাব্যবিচারের একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; যথা—

বলেছিনু মিছাকথা—'আমি তোমা বড় ভালবাসি।'
প্রবল সাগর-বন্যা বহে না যে রুদ্ধ হ্রদ-জলে!
সে দুরূহ দুঃখ সহে—দেব কিম্বা মূঢ় মর্ত্ত্যবাসী
তোমা সম; রুচি নাই সে নির্ম্মল মধু-হলাহলে।
প্রেমী হয়ে ঊর্দ্ধ-স্বর্গে—অতি-সুখে মূর্চ্ছিত চেতনা,
প্রেমী নামে রসাতলে—উল্কাসম অগ্নিবেগবান্!
আধ-আলো-অন্ধকার মহা-শূন্যে ভ্রমে কতজনা
কাঁদিয়া ছায়ার পিছে, নাহি জানে—এমনি অজ্ঞান—
ভালবাসে কিনা বাসে, বাসে যদি কেবা সেই প্রিয়া!
হয়তো কাব্যেরি বধূ, কিম্বা কোন চিত্রিত পুত্তল,
অথবা তামসী-ভালে নিজ-মুখ হেরি' মুগ্ধ হিয়া।
বড় একা-একা থাকে, ভালবাসে ভালবাসা-ছল,
দুঃখ নাই, সুখও নাই—দিন কাটে মৃদু নিঃশ্বসিয়া!
আমিও তাদেরি দলে—প্রেম নাই, শুষ্ক হৃদিতল।

এ যদি হইত শুধু সুখ, ইত্যাদি। এই দুইটি স্তবকে কবি পুনরায় 'নেতি'-মুখে প্রেমের স্বরূপ বুঝাইতেছেন। এই বুঝাইবার আগ্রহই প্রেমের লিরিক কবিতার পক্ষে মারাত্মক; আসলে উহা হৃদয়ের নয়—মনেরই ব্যাপার। ইহা সুখও নয়, দুঃখও নয়; মনের অসীমায় উহা একটি অপূর্ব্ব চিত্ত-চমৎকারের মত—নব নব আকুতি ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল করে; সেই ব্যাকুলতা বড় মধুর। আমাদের বৈষ্ণব-কবি প্রেমকে 'বিষামৃত' নামে অভিহিত করিয়াছেন; সেই দুঃখ বা আর্ত্তি সুখেব চেয়ে মধুর। প্রেমকে সুখ-দুঃখের অতীত একটা কিছু বলিলে—বিশেষ করিয়া উহার দুঃখকে ভাবের গভীরে তলাইয়া দিলে, প্রেম আর প্রেমই থাকে না—তাহা একটা 'রস' বা নিছক মানস-বিলাসে পরিণত হয়; বরং 'All other pleasures are not worth half its pains'—ইহাই আরও যথার্থ, ইহাই প্রেমের

স্বরূপ-বর্ণনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতাগুলি সেই প্রেমের কবিতা নয়; তাহাতে কোন passion বা প্রবল-গভীর হৃদয়াবেগ নাই—মনকেই নানাভঙ্গিতে (attitude) স্থাপন করিয়া তাহার মাধুরী-সম্ভোগ আছে।

প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে…প্রকাশ হ'ত কথা। কিন্তু সত্যকার প্রেম ঐরূপ নীরবেই হৃদয়ের বার্ত্তা-বিনিময় করে; তার কারণ, উহা বাক্যের বিষয় নয়—অনুভবের বস্তু; যেখানে তাহা হয় না, সেখানে প্রেমই জন্মে নাই। পূর্ব্বের একটি উদ্ধৃত কবিতা দ্রষ্টব্য।

[মানসী—'গুপ্তপ্রেম', কবিতা-পাঠ

এ যে সখা, হৃদয়ের প্রেম, ইত্যাদি। সেইজন্য উহা মন দিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় না; জমা-খরচের হিসাব, আদি-অন্তের ভাবনা—কিছুই করিতে হয় না; প্রাণই প্রাণে বুঝিতে পারে, কোন সংশয় বা জিজ্ঞাসা থাকে না।

বুঝা যায় আধ প্রেম, ইত্যাদি। খুব সত্য কথা, প্রেম যেমন 'আধখানা' হইতে পারে না—সত্যকার প্রেম 'সমস্তই' হইয়া থাকে, তেমনই তাহা বুঝিবার নয়—প্রাণে পাইবার।

ঝুলন

কবিতা-প্রসঙ্গ

ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে একটি উৎকৃষ্ট রবীন্দ্রীয় লিরিক, ভাবও যেমন অখণ্ড (single), তেমনই প্রথম হইতেই আবেগের অধীরতা সুরু হইয়াছে, এবং পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া তাহা একটি চরম উন্মাদনায় নিঃশেষ হইয়াছে। কবিতার ভাব-বস্তু খুব নূতন নয় বটে, কিন্তু ঐ রূপকের ছলে, আলস-বিলাসের একটি অতিনিবিড় রসাবেশ ভাষায় উচ্ছল হইয়া ভাবকে লিরিক-মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত করিয়াছে। ভাবার্থ:—অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসনে মানুষের প্রাণ অবশ অসাড় হইয়া যায়, আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞান লোপ পায়। তেমন অবস্থায় বাহির হইতে একটা বড় ধাক্কা না আসিলে, সেই মাদক-ধূমে আচ্ছন্ন প্রাণ জাগে না; তখন চৈতন্য হয়, সেই কালরাত্রির ঝড়ঝঞ্ঝার একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে; শক্তির চেতনায় প্রাণ এমন উল্লসিত হয় যে, বিপদই একটা মহোৎসব হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য, এখানে ঐ 'বধূ' ও 'প্রিয়া' কোন পৃথক ব্যক্তি নয়—মানুষেরই অন্তরতর সত্তা—সেই আত্মা, যাহার মত প্রিয় আর কিছু নাই। এই কবিতাটির সহিত আর দুইটি কবিতা পঠনীয়—'কড়ি ও কোমলে'র 'শ্রান্তি', এবং এই কাব্যের 'দেউল' কবিতাটি।

কবিতা-পাঠ

প্রথম স্তবক। মরণখেলা নিশীথবেলা—'নিশীথ বেলা' অর্থে 'অতি দুর্য্যোগের দিন'; 'মরণ খেলা'—যেমন 'আগুন খেলা', যাহা 'অতি-ভয়ঙ্কর', অথচ তাহাতেই মহা আনন্দে, পরম নির্ভয়ে, ঝাঁপাইয়া পড়া। 'স্বপ্নশয়ন'—বাস্তব জগৎ ও তাহার নানা দায়িত্ব অগ্রাহ্য করিয়া

কল্পনা-জগতে বাস। সেই জগতে সুখের শয়ন রচনা করায় কোন বাধা নাই; প্রাণকে ক্রমাগত মাধুরী মদিরা পান করাইয়া স্বপ্নরসাবেশে বিভোর করিয়া রাখা যায়।

তৃতীয় স্তবক। আজি জাগিয়া উঠিয়া, ইত্যাদি—বর্ণনাটি বড় চমৎকার। সুখের অচেতন অবস্থায় বধূ বরকে চিনিতই না, তাহাকে কখনও সজ্ঞানে আলিঙ্গন করে নাই; কিন্তু এখন এই বিপদ কালে সেই বধূ 'ত্রাসে-উল্লাসে বুকের কাছে ব্যাকুলিয়াছে', এবং তাহাকেই একমাত্র বন্ধু-জ্ঞানে, অতি কঠিন বাহুবন্ধনে বাঁধিয়াছে। ভাবার্থ:—সুখের বিলাস-ব্যসনে ডুবিয়া থাকিলে মানুষ কখনো আত্ম-সাক্ষাৎকার করিতে পারে না; দুঃখের দুরন্ত তরঙ্গ-দোলায় যে দোল খাইয়াছে, সেই জানে, মানুষের প্রাণ—তাহার নিজের প্রাণ—কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহার শক্তিই বা কি?

চতুর্থ স্তবক। হায়, এতকাল·· তারে, ইত্যাদি—তুলনীয়—

> সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
> আপনারে তারা ভুলাবে,···
> সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
> ঘুমের দোলায় দুলাবে।

['ভৈরবী গান'—মানসী

'কত প্রিয়নাম মৃদু মধুভাষে' ইত্যাদি—তুলনীয়—

"Called him soft names in many a mused rhyme"

[*Keats*

পঞ্চম স্তবক। গুঞ্জরতান করিয়াছি গান—এইরূপ মধ্য মিলের দ্বারা ছন্দ সঙ্গীত কেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ স্তবক। শ্রান্ত পরাণ—'পরাণ শ্রান্ত হয়' বাক্যটি এইরূপ, সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

অষ্টম স্তবক। এখানে 'ঝুলন-খেলা' অর্থে, অতিশয় বিপদসঙ্কুল দুঃসাহসিক অভিযান—ভীষণ ঝড়ের দোলায় দুলিতে থাকা, 'ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্টহাসিয়া মারিবে ঠেলা'। 'মরণ-দোলায় ধরি রসিগাছি' ইত্যাদি। তুলনীয়—

> চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
> হেরিব না দিক্,
> গনিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
> উদ্দাম পথিক।
> মুহূর্তে করিব পান: মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
> উপকণ্ঠ ভরি—
> খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
> উৎসর্জন করি।

['বর্ষশেষ'—কল্পনা

নবম ও দশম স্তবক। এই শেষ দুইটি স্তবকে, ভাবের মত, ছন্দও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে; পংক্তি সজ্জায় ও মিল-বিন্যাসে পূর্ব্বের নিয়ম আর নাই, এ যেন একরূপ 'Onomatopoeia'—সমগ্র পংক্তি পর্ব্বের ছন্দধ্বনিই ভাব-অর্থের দ্যোতনা করিতেছে।

স্বপ্ন টুটিয়া...দুটো পাগোল—রূপকের সঙ্গতি রক্ষার জন্য 'দুটো'ই বটে, নহিলে আসলে একটাই। যাহারা স্বপ্নশয়ন ত্যাগ করিয়া এমন বিপদকে স্বেচ্ছায় বরণ করে তাহারা পাগল নয় তো কি? অথবা, ঐরূপ সুখ-জীবনের প্রতিক্রিয়াও তেমনই উগ্র হইয়া থাকে। 'পাগোল'—এই বানান এখানে মিলের জন্য ঐরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা হইবার কারণ নাই; উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান সর্ব্বত্র করিতে হইলে, বাংলা শব্দের অধিকাংশই ঐরূপ করিতে হয়; 'পাগোলে'র দৃষ্টান্তে, 'ছাগল' ও 'আগল'—'ছাগোল' এবং 'আগোল' হইবে। রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই 'পাগোল' লিখিয়াছেন—কবির খেয়াল!*

সমুদ্রের প্রতি

কবিতা-প্রসঙ্গ

(একটি ভাবনামূলক (Reflective) কবিতা—খাঁটি Subjective বা আত্মভাবমূলক। এই কবিতায় সমুদ্রের যে মূর্ত্তি কবি ধ্যান করিয়াছেন, তাহা কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব, অর্থাৎ, সমুদ্র দেখিয়া ঐরূপ ভাব সাধারণ মানুষের চিত্তে যেমন উদয় হয় না, তেমনই, আর কোন কবিও সমুদ্রকে ঐ চক্ষে দেখেন নাই। মনে হয়, সমুদ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি তাঁহার একটি মনোগত ভাবকে কাব্যকল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছেন; আমরা ইহাতে সমুদ্রকে না দেখিয়া, কবির সেই মৌলিক ভাব-দৃষ্টি অনুসরণ করি।

ইতিপূর্ব্বে ('মানসী'তে) 'অহল্যা' কবিতাটির প্রথমার্দ্ধে যেমন একটি অর্দ্ধ-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুভাবনা ছিল, এখানেও তেমনই কবি একটি বৈজ্ঞানিক (Geographical) তত্ত্বকে তাঁহার কল্পনার মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আত্মভাবাকুল কল্পনা সেই বিজ্ঞানের তথ্যগুলাকে অনুসরণ করে নাই—সমুদ্রকে মহাজননী, স্নেহময়ী প্রকৃতির প্রতীকরূপে বন্দনা করিয়া কবি আপন কবি-হৃদয়ের পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছেন। এইরূপ স্বাধীন কল্পনার অধিকার কবিমাত্রেরই আছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহাতে ঐরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নজির যোগ করেন বলিয়াই সেই কল্পনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। কবিতাটি সেই কারণেও যেমন, তেমনই শেষের পর্ব্বটিতে যে ধরণের ভাবনা আছে তাহাতে, কল্পনার নিজস্ব গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এতবড় একটা বিরাট দৃশ্যের সম্মুখে কবি সকল ভাবনা ভুলিয়া তাহার বিরাটত্বে নিজেও ডুবিয়া যাইতে পারেন নাই, ঐ আত্মভাবের অতিরিক্ত সজ্ঞানতা এবং নিজ মানসের একটি বিশেষ প্রবণতা বা পক্ষপাত (সব কিছুকেই সুন্দর ও মধুর দেখিবার) তাঁহাকে সমুদ্রের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপনেও যেমন, তেমনই তাহার সহিত ঐরূপ স্বগত-আলাপ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে—সমুদ্রের সেই Sublime বা বিরাট-গম্ভীর রূপ দেখিয়া 'বিস্ময়াবিষ্ট হৃষ্টরোমা' না হইয়া কবি তাহাতে মাতৃস্নেহের মাধুর্য্য মিশাইয়া একটা অদ্ভুত রস বা রসাভাস সৃষ্টি করিয়াছেন।)

---

* 'সঞ্চয়িতা'র পুরাতন সংস্করণ অনুসারে 'পাগোল' বানান এইরূপ হইয়াছে। প্রকাশক।

কবিতা-পাঠ

কবিতাটি ১৮ অক্ষরের দীর্ঘ পয়ারছন্দে রচিত—এই ছন্দ ভাব-গাম্ভীর্য্যের উপযোগী। যতদূর মনে হয়, ঐ ছন্দ কবি রঙ্গলালই তাঁহার 'পদ্মিনী'-কাব্যে সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন; তথাপি রবীন্দ্রনাথই তাঁহার কবিতায় এ ছন্দের সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। রঙ্গলালের ছন্দ এইরূপ—

> দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বাব।
> বসিয়া ঘেরিল তারে তারাকারে এগাবো কুমার ॥

হে আদিজননী সিন্ধু। বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রমাণেই কবি সমুদ্রকে ঐ সম্বোধন করিয়াছেন। তথ্যটা মোটামুটি এই যে, স্থল-সৃষ্টিব পূর্ব্বে জল সৃষ্টি হইয়াছিল, অর্থাৎ আগে সমুদ্র, তার পর তাহা হইতে পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে। আসলে কিন্তু, পৃথিবীর ঐ পৃথুলতা বা গাঢ়-স্থূল রূপ আগে, পরে তাহার উপরে ঐ জলের আবরণ পড়িয়াছিল; এবং তারও পরে সেই আবরণ ভেদ করিয়া—নিম্নের সেই ভূ-গোলকের গর্ভ হইতে আগ্নেয় উদ্‌গিরণের ফলে—স্থলভাগ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া, খাঁটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে—

"The Earth is the child and the Moon is the grand-child of the Sun."

অতএব, কবি-কল্পনা এইরূপ আধা-বৈজ্ঞানিক তথ্য হইতে মুক্ত হইলেই ভাল হয়, নতুবা সমুদ্রকে আজিকার এই বৈজ্ঞানিক অতি-বিদ্যার যুগে, 'আদি জননী' বলিয়া সম্বোধন করিলে কবিকল্পনারও মর্য্যাদাহানি হইবে।

মহেন্দ্রমন্দির-পানে......অনন্ত প্রার্থনা। এ কল্পনা যতই সুন্দর হউক, তথাপি ইহা অপেক্ষা নিম্নোদ্ধৃত চিন্তাটিই যথার্থ, এবং অধিকতর ভাবৈশ্বর্য্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইবে—

"The sea drowns out humanity and time; it has no sympathy with either, for it belongs to eternity, and of that it sings its monotonous song for ever and ever."
[*The Autocrat of the Breakfast Table*

—ইহার তুলনায় আমাদের কবির ঐ ভাবটি নিতান্তই সেন্টিমেণ্টাল বলিয়া মনে হয়। সমুদ্র 'পুরুষ' না হইয়া—'নারী' হইয়াছে—ইহাও লক্ষণীয়।

ধীরে ধীরে পা টিপিয়া, ইত্যাদি। সমুদ্রতরঙ্গের ঐ নিয়ত গমনাগমনকে কবি তাঁহার কল্পনার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন; ইহাকে একটি সুন্দর conceit বা উৎপ্রেক্ষা বলা যাইতে পারে।

আদি অন্ত তাহার কোথা রে, ইত্যাদি। ঐ বিরাট-বিপুলকে একজন ইংরেজ-কবি যে-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জগৎ-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে; তার কারণ, উহা সর্ব্বকালের, সর্ব্বমানব-মানসের অনুভূতি, যথা—

> Thou glorious mirror where the Almighty's form
> Glasses itself in tempests, in a times—
> Calm.or convulsed; in breeze, or gale, or storm;

Icing the pole, or in torrid clime
Dark-heaving—boundless, endless, sublime ;
The image of Eternity, the throne
Of the Invisible ! Even from out thy slime
The monsters of the deep are made ; each zone
Obeys thee ; thou goest forth, dread, fathomless—alone

[Lord Byron—*Childe Harold*

আমাদের কবি কালিদাসও, ইংরেজ কবির ঐ ভাবটিকে—ভিন্ন ভাষায়, প্রায় হুবহু ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমি পৃথিবীর শিশু, ইত্যাদি। এইখান হইতে কবির নিজ ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের এই ভাব-বীজ তাঁহার কাব্যে নানা সময়ে নানা আকারে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়াছে। পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক, এবং সেই সম্পর্ক-সূত্রে সমগ্র বিশ্বভুবন বা জড়-প্রকৃতির সহিত নিজ-সত্তার ঐ যে একটি গূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য যোগ—এইরূপ অনুভূতিই তাঁহার কবিচিত্তে একরূপ বিশ্বাত্মীয়তার আশ্বাস জাগায়; বিশ্বমানবের সহিত আত্মীয়তা-বোধের মূলেও আছে এইরূপ পারমার্থিক প্রকৃতিবাদ ও পার্থিবতা-প্রীতি। এ সম্বন্ধে প্রথম পর্ব্বে রবীন্দ্র-কবিধর্ম্মের আলোচনা পুনরায় দ্রষ্টব্য। 'মানসী'র 'অনন্ত-প্রেম' কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই রবীন্দ্রীয় ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা আছে।

সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ, ইত্যাদি। তুলনীয়—

এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কতযুগ মোরা জেগেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে মোরা কেঁপেছি।...
লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথিনী কি মোরা জীবনে ?
সে প্রভাতে কোন্ খানে
জেগেছিনু কেবা জানে।
কী মূরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে।

[উৎসর্গ—১৩

এই কবিতাটি বহু পরে রচিত। ইহাকে একরূপ ভাবাতিশয্য মনে হইলেও, কবি রবীন্দ্রের উহা একটা আত্মগত প্রত্যয়। এইরূপ জন্মান্তরবাদ যদি এতই মূল্যবান হয়, তবে বিজ্ঞানের উৎক্রান্তিবাদ (Theory of Evolution) অনুসারে, মানবের আত্মাও, তাহার

দেহ ও মনের মত একটা 'by-product of matter' বা জড় হইতে উৎপন্ন পদার্থবিশেষ মাত্র, অর্থাৎ, 'আত্মা' বলিয়া কোন পৃথক সত্তা নাই বলিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে জীবের আশী লক্ষ যোনীতে ভ্রমণের কথা আছে, কিন্তু তাহা জড়-প্রকৃতির সহিত ঐরূপ আত্মীয়তা বা প্রেম-সম্পর্কের কারণ নহে। তন্ত্রশাস্ত্রের কুণ্ডলিনী-তত্ত্বে আধুনিক উৎক্রান্তিবাদের সমর্থন আছে বটে, কিন্তু তাহাও ঊর্দ্ধমুখী—সাধনার দ্বারা সেই উৎক্রান্তির অবস্থা পার হইয়া যাওয়াই জীবমাত্রের নিঃশ্রেয়স। আমি পূর্ব্বে রবীন্দ্র-কাব্যে যে জগৎব্রহ্মবাদের কথা বলিয়াছি তাহার সমর্থন এইরূপ কবি-কল্পনায় রহিয়াছে।

সেই নিত্য জীবনস্পন্দন তব মাতৃহৃদয়ের। তুলনীয়—

> জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
> মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত,
> অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
> সুপ্ত আত্মা মাঝে ?
>
> ['অহল্যার প্রতি'—মানসী

গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ—আসন্নপ্রতীক্ষাপূর্ণ, এবং **অজানা বেদনা অনাগত মহাভবিষ্যৎ লাগি**—তুলনীয়।

> I dimly see
> My far off doubtful purpose, as a mother
> Conjectures of the features of her child
> Ere it is born.
>
> [Tennyson : *Œnone*

প্রতি প্রাতে উষা এসে, ইত্যাদি। এইখানে কবির কল্পনা বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সরাসরি উড়াইয়া দিয়াছে—কবি আপন কল্পনায় বিভোর হইয়া একটা হাস্যকর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ, পৃথিবীর জন্ম যখনো হয় নাই—কবির মতে, যখন সে ঐ সমুদ্র জননীর গর্ভে বাস করিতেছিল, তখন উষাও দর্শন দেয় নাই, পৃথিবীর জন্ম বা ঐ স্থলভাগ-উদ্ভবের পূর্ব্বে—

"The air was black, night was eternal, illumined only by lightning and volcanoes; the earth was unconscious of the sun's existence, its heat was derived from the fire within, and was uniform from pole to pole."

ইহার অনেক পরে—

"The atmosphere brightened a little, and the sun's rays penetrated to the earth."

[*Martyrdom of Man*

মানবহৃদয়-সিন্ধুতলে, ইত্যাদি। অতঃপর, কবির চিত্ত, সেই আদি-জননীর গর্ভ-ধারণ, গর্ভের সেই অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, কবি মানুষের অবস্থিতি, এবং মাতৃহৃদয়ের সেই

'অবিশ্রাম কলতান'-শ্রবণ, প্রভৃতি হইতে আরেক ভাবনায় ব্যাপৃত হইয়াছে,—'মানব-হৃদয় সিন্ধুতলে' অনুরূপ এক মহাদেশ-সৃজনের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; অর্থাৎ, ক্রমবিকাশবাদ অনুসারে, অতঃপর স্থূল দেহ-জগৎ হইতে সূক্ষ্ম মানস-জগতের উৎক্রমণ - সৃষ্টির সেই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ভাবনা করিতেছে; কবিকল্পনা একটি বিশেষ চিন্তাধারায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মানব-ইতিহাস ও মানব-সমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবির এইরূপ দায়িত্ব—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ভিক্টোরীয় যুগে, কবি টেনিসন কর্ত্তৃক সগৌরবে স্বীকৃত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিজীবনেব এইকালে (পরবর্ত্তীকালে আরও সংস্কারমুক্তভাবে) সেইরূপ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়; নব্য বিজ্ঞানবিদ্যা ও মানব-প্রগতি এবং সকল জাগতিক ঘটনাব একটা মঙ্গলময় পরিণামে বিশ্বাস—তাঁহার কবিধর্ম্মেব অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

এক মহা আশা ·····চেয়ে আছি তোমা-পানে। মানব-সংসারের পক্ষ হইতে কবিকে এই আশা পোষণ করিতেই হইবে। উপরে দেখ।

জান কি তোমার ধরাভূমি, ইত্যাদি। সমুদ্রের সহিত কবির এইরূপ অন্তরঙ্গ আলাপ, মানবজাতির হইয়া জননীর নিকটে এই কাতর নিবেদন—সমস্ত কবিতাটিকে অতিশয় লঘু করিয়া তুলিয়াছে। সেই মহাজননীকে কবি যে দুশ্চিন্তা জানাইতেছেন তিনি তাহা না জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত আছেন, এবং জানিলে, তাঁহার কন্যা পৃথিবীর ঐ সন্তানগুলিকে, অর্থাৎ পৌত্রগণকে 'সহস্র স্নেহময় চুমা' দিয়া এবং 'শান্তি শান্তি' বলিয়া তাহাদের সর্ব্বজ্বর জুড়াইয়া দিবেন। ইংরেজীতে ইহাকেই 'bathos' বলে—অর্থাৎ, অতি-উচ্চ কল্পনা হইতে সহসা অতি নিম্নে পতন। মানবসংসারের ঐ সমস্যা যদি বা উচ্চ ও গুরুতর হয়, তথাপি সান্ত্বনার ঐ পদ্ধতিটা শিশুমনেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

ফিরিতেছে এপাশ-ওপাশ। বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; ভাষাও কোথায় নামিয়াছে!

আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো। অতিশয় মামুলী উপমা—সমুদ্রকল্লোলের সহিত ঐ জলদমন্দ্র সমধ্বনিও নয়। তা' ছাড়া, সান্ত্বনার ঐরূপ আওয়াজ প্রাণকে শান্ত না করিয়া ভয়-কম্পিত করিবে। ধবার "ভালে তালে তালে মাতৃপাণি হানিবাব"—কথাটাও সেই-সেইরূপ।

এ কবিতা সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে ইহাই বক্তব্য যে, এই জাতীয় ভাবনামূলক কবিতায় আমরা রবীন্দ্র-কবিশক্তির পূর্ণ পরিচয় পাইব না; ঐ ধরণের কবিতায় রসসৃষ্টির প্রেরণা অপেক্ষা—আমি সেই যে কবির একটা পৃথক মানস-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, যাহা তাঁহার কাব্য-প্রেরণা হইতে কখনো বেশি দূরে অবস্থান করে নাই,—তাহারই প্রভাবে নানা ভাবনা-চিন্তার কবিত্বময় প্রকাশ দেখিতে পাইব। এমন কবিতা উৎকৃষ্ট কাব্য-সৃষ্টির সেই সুডৌল, অনবদ্য রসরূপ ধারণ করিতে পারে না।

হৃদয়যমুনা

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটি শুধুই রূপকের আকারে নয়—ভাব-অর্থের নিখুঁত-যোজনায়, উপমার প্রয়োগ-চাতুর্য্যে, এবং অপূর্ব্ব ছন্দোমাধুর্য্যে—রবীন্দ্রীয় কাব্যকলা তথা লিরিক রসসৃষ্টির একটি অনবদ্য নিদর্শন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খণ্ড-কবিতা রবীন্দ্র-কাব্যেও খুব বেশি নাই; কবির শেষ বয়সের উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাগুলিতেও একালের ঐ রসাবেশ—ঐ তরলোচ্ছল আবেগ-গভীরতা নাই। এ কবিতাটি এমন সুন্দর রসরূপ ধারণ করিয়াছে, তার কারণ বোধ হয় যে, প্রেম সম্বন্ধে কবির যে একটি বিশেষ মনোভাবের কথা বলিয়াছি, সেই মনোভাবের রস-প্রেরণা এখানে আরেক ভঙ্গিতে পূর্ণ-তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে, 'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতা দুইটির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণীয়।

প্রেমকে একটা প্রবল-গভীর হৃদয়ানুভূতি-রূপে (passion) অপরোক্ষ করিতে না পারিলেও, কল্পনায় তাহার লীলা-মাধুরী পরোক্ষ করার যে রস-দৃষ্টি, কবি এই কবিতাটিতে তাহা লাভ করিয়াছেন। হোক তাহা মানস-বিলাস—তথাপি, প্রেমের সেই অতল-অকূল সাগর-গভীরতা ও জীবন-মৃত্যুর তরঙ্গসঙ্কুলতার উপরে, এখানে কেমন একটি স্নিগ্ধ-সুন্দর তরলা-বেশের সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে! প্রেমাভিনয়েব সেই মানস-লীলা যত প্রকার হইতে পারে, তাহারই কয়েকটি এ কবিতায় একটি ক্রম-গভীর পর্য্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সেই গভীরতাও মনেরই এক-একটি attitude বা ভঙ্গিমা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে নাই; ভঙ্গিমার ঐ সৌন্দর্য্যই প্রেমকে জীবনেব অনলাবেগ হইতে মুক্ত করিয়া নিছক রসাস্বাদনের বস্তু করিয়াছে; সেই রস-সৃষ্টিতেই এ কবিতা সার্থক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য—

"He handles life from a distance, at two removes, and all the emotions awakened by the poems are emotions felt in the presence of art, not suggested by life"

—*Walter Raleigh*

কবিতা-পাঠ

কবিতার নাম—'হৃদয়-যমুনা', অর্থাৎ 'প্রেম-যমুনা'; 'যমুনা', 'কালিন্দী' প্রভৃতি নাম রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া আছে; তুলনীয়—

ওই যমুনা প্রেমে শুচি, প্রেমেরি ধাবা—
বাজার মেয়ে রাখাল-ছেলের মিলন-পিয়ারা,
দেয় সে বুকে পরের ছেলে—
উজান বহে অবহেলে!
করতে শেখায় পরকে আপন—আপনা-হাবা,
ঐ যমুনা সব-ভুলানো প্রেমেরি ধাবা।

['যমুনা জল'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম স্তবক। স্তবকগুলির গঠন-রীতি ও ছন্দের কারিগরী লক্ষণীয়। ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'Stanzaic music'—স্তবকগুলিতে সেইরূপ একটি সুসম্পূর্ণ সুর-সুষমা আছে। পংক্তি-পর্য্যায়ে, মিল-বিন্যাসে, এবং প্রতি স্তবকের শেষে প্রথম পংক্তির পুনরাবর্ত্তনে—প্রত্যেক স্তবক অস্থায়ী-অন্তরাযুক্ত একটি সম্পূর্ণ গানের মত হইয়াছে। ছন্দের ঝঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছে একটিমাত্র কৌশলে,—মাঝের ত্রিপদীগুলিতে তিন-মিল ও একটি পাঁচ-মাত্রার পর্ব্ব যোগ করায়, ঐ পাঁচ-মাত্রার পর্ব্বটিই ছন্দে একটি দোলা দিয়াছে। মূল ছন্দ—পুরাতন পয়ারের অক্ষরবৃত্ত; সেই ত্রিপদীকে ঐ পর্ব্বগুলি যেন 'পুষ্পিতাগ্রা' করিয়াছে। পর্ব্বগুলি যে পাঁচ 'অক্ষরে'র নয়—পাঁচ-মাত্রার, তার প্রমাণ, মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য উহাদের কোনটিতে যুক্তাক্ষর নাই। মোটের উপর, এই কবিতায় যে একটি অপূর্ব্ব গীতিসুর আছে—তাহা ঐরূপ স্তবক নির্ম্মাণ ও ছন্দো-বৈচিত্র্যের জন্যই ঘটিয়াছে।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> "আর তো যাবনা সই, যমুনার কালো জলে।
> ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে।"
>
> —কালী মির্জ্জা

এখানে 'কুম্ভ ভরিয়া লওয়া'র অর্থ—প্রেমকে ঘর-করণার কাজে প্রয়োজনের বস্তু করা; ইহা সর্ব্ব-নিম্নস্তরের প্রেম। তবু ঐ কুম্ভ ভরিয়া লইতে আসা—সুন্দরীর গাগরী-ভরণ বা 'জলকে-আসা'র সৌন্দর্য্যও কম নয়। নদীর দুই তীরে 'নিবিড় কুন্তলসম' বর্ষার ঘন মেঘ, এবং তাহারই ছায়ান্ধকারে ঐ যে নারী একাকিনী কলসী-কক্ষে জল ভরিতে আসিতেছে—তাহার পায়ের নূপুরধ্বনি প্রেম-তরঙ্গিনীর কুলুকুলু-ধ্বনি অপেক্ষাও মধুর। প্রেম যেমনই হোক, ঐ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনীই তাহাকে মনোরম করে।

দ্বিতীয় স্তবক। যদি কলস ভাসায়ে জলে, ইত্যাদি। এই স্তবকটিতে প্রেমের আরেকটি বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। জলে নামিবার ইচ্ছাও নাই, তীরে বসিয়া ভাবিতে ভাল লাগে, অর্থাৎ বাস্তব-জীবনের সহিত সম্পর্ক নাই, কেবল একটি ভাব-বিভোরতা আছে। এখানেও সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মনোহর পরিবেশ, শ্যামল কূলে কুঞ্জতৃণাসনে বসিয়া, উপরের আকাশ ও নিম্নের বিকশিত বনস্থলের পানে চাহিয়া মন উদাস হইয়া যাইবে; প্রাণে যে মধুর-উৎকণ্ঠা জাগিবে, সে হয়তো প্রেমেরই অস্পষ্ট আকুলতা; বিরহ-মিলনের কোন সুখ-দুঃখ তাহাতে নাই, কোন স্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা নাই—একরূপ রস-সম্ভোগ আছে।

দুটি কালো আঁখি দিয়া, ইত্যাদি। বর্ণনার ভাষা লক্ষণীয়, উৎকৃষ্ট লিরিকের ভাষা। দুই কালো চক্ষু স্বপ্নাতুর, তাহাতে যেন কটাক্ষ নাই—এমনই ভাব-স্তিমিত! 'বঞ্জুল-বনে'—'বঞ্জুল' অর্থে, বেতস, বেত। নদীতীরে এমন বেতবন প্রায়ই দেখা যায়।

তৃতীয় স্তবক। যদি গাহন করিতে চাও, ইত্যাদি। এই স্তবকে প্রেমের আরেক লীলা বর্ণিত হইয়াছে—প্রেমের জলকেলি; এ প্রেম যুবতী-যৌবনেরই উচ্ছল রসোল্লাস, উহাতে প্রেমের যে আত্মসমর্পণ আছে, তাহাতে ঐ যৌবনের পিপাসাই প্রবল। লাজ-বসন ত্যাগ

করিয়া, নদীর গহনে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকার অর্থ—বাসনা-বিবশ হওয়া; সোহাগ রাশির মত সেই প্রেমের তরঙ্গভঙ্গ; কুলুকুলু কলভাষে কখনো কাঁদা, কখনো হাসা; মান-অভিমান ও কতরকমের ছলাকলা – প্রেমের এই এক রূপ। এ প্রেমে পিপাসা-তৃপ্তির মধুর-উন্মাদনা আছে—কোন গভীর আর্ত্তি বা কাতরতা নাই; মনের সহিত দেহও আছে, কিন্তু তাহাতেও সম্ভোগের সৌন্দর্য্য-রসই আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

চতুর্থ স্তবক। যদি মরণ লভিতে চাও, ইত্যাদি। এই শেষ স্তবকটিতে প্রেমের একটি চূড়ান্ত দশা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে 'মরণ' বলিতে সম্পূর্ণ 'আত্ম-বিলোপ' বুঝিতে হইবে। সে একেবারে সমাধি-অবস্থা—'নাহি রাত্রিদিনমান', 'সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে'; অর্থাৎ, সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি কোন দ্বন্দ্ব আর থাকিবে না; তাহা স্নিগ্ধশান্ত সুগম্ভীর—মর্ত্ত্য জীবনের কোন স্পন্দন, দেহ-মনের কোন আকুতি বা উৎকণ্ঠা তাহাতে নাই।

এই যে 'মরণ'কে লাভ করা—বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে প্রেমের 'যুগল' বা 'দুই' নাই; বরং তেমন প্রেমেব উচ্ছেদ আছে। হঠাৎ মনে হইতে পারে, ইহা সেই 'grand passion' বা সর্ব্বনাশী প্রেম, যাহাতে জীবন-মৃত্যু এক হইয়া যায়, মৃত্যুও মনোহর হইয়া উঠে—"I have immortal longings in me!" অথবা—

> "Fate is the name of her and his name is death."
>
> [*Swinburne*

এ যেমন একক-আত্মার প্রেম-সাধনা—এবং তাহাতে শেষে 'নিখিল বন্ধন খুলে' একটা অসীমায় বিলীন হইয়া যাওয়া, 'একক প্রেম অর্থে'—আত্মভাবগত প্রেম, আপনাকেই আপনি ভালবাসা। এ কবিতায় কবির প্রেম-কল্পনা একটি সৌন্দর্য্য-রসাবেশ সৃষ্টি করিয়াছে—সকল স্তবকেই সেই এক লিরিক-মাধুর্য্য অব্যাহত আছে, এ প্রেম সর্ব্বস্তরেই সুন্দর।

মৃত্যুসম নীল নীর। কবি-ভাষার এই রীতি ইংরেজী, তুলনীয়—

> 'নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হযে উঠে'
>
> ['সিন্ধুতরঙ্গ'—মানসী

স্নিগ্ধ, শান্ত সুগম্ভীর ..... কিছু না বাজে। ভাষা ও ছন্দে ভাবের অনুরূপ গাম্ভীর্য্য লক্ষণীয়। এই কয় পংক্তিতে কবি-হৃদয়ের নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। -তাই এই কয় পংক্তি এমন ভাবোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে, এই শেষ স্তবকটিতে কবিচিত্তের যে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই এ কবিতার মূল প্রেরণা—অপরগুলিতে কবি-চিত্তের রস-বিলাস আছে।

ব্যর্থ যৌবন

কবিতা-প্রসঙ্গ

একটি গান। আমরা দেখিয়াছি, 'কড়ি ও কোমল' হইতেই কবিতার আকারে এইরূপ গান-রচনা আরম্ভ হইয়াছে—এক হিসাবে এইগুলিই বিশুদ্ধ লিরিক কবিতা। কারণ, ইহার ছন্দে যেমন স্পষ্ট গানের সুর আছে, তেমনই, ইহাতে একটি অবিমিশ্র ভাবকে সরল অথচ গভীর করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। যৌবনে ভালবাসা না পাইলে নারী-হৃদয়ে যে বেদনার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক—কবি এই কবিতায় তাহাই কল্পনা করিয়াছেন। অপর প্রেম-কবিতাগুলিতে যেমন নারী ও পুরুষ— দুই পক্ষ আছে,—এখানে তাহা নাই, কারণ, ঐ নারী কাহারও ভালবাসা পায় নাই—হৃদয় উন্মুখ, কিন্তু কেহই তাহা দিল না; তাই ভাবটি এমন সরল, তাহাতে কোন বিচার-বিশ্লেষণ নাই।

কবিতা-পাঠ

এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো, ইত্যাদি। বাংলা প্রেম-কবিতায় সেই প্রাচীন বৃন্দাবনী রীতি এখানে কেমন ভাবোদ্দীপক হইয়াছে! ইহাকেও একরূপ কাব্যালঙ্কার বলা যাইতে পারে। সমস্ত কবিতাটি সেই রঙে রঞ্জিত।

যে রজনী যায়, ইত্যাদি। 'রজনী' অর্থে—বৈষ্ণব-কবিতার সেই 'বাসর-শয্যা' বা প্রিয়-সম্মিলনের প্রতীক্ষা-রজনী; এখানে—'যৌবন-কাল', যে-কালে প্রেমের আবির্ভাবে জীবন ধন্য হয়, যৌবন ফুরাইলে যাহার আশা আর থাকে না।

আমি বৃথা অভিসারে, ইত্যাদি। জীবন যেন প্রেমের পথে একটি অভিসার-যাত্রা। যৌবন সেই পথের যমুনা-তীর, সেই অভিসার ব্যর্থ হইয়াছে, কেহ দেখা দিল না।

বহি বৃথা মনোআশা, ইত্যাদি। 'এত ভালবাসা বেসেছি'— কোন ব্যক্তিকে নয়, মনে-মনে বাসিয়াছে—কোন একজনকে ভালবাসিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। পরের পংক্তিগুলিতে অনুকূল লগ্নের ('কত উঠেছিল চাঁদ') কথা আছে।

মনে লেগেছিল হেন, ইত্যাদি। অবিবাহিতা তরুণীরা নিশ্চয় ঐরূপ স্বপ্ন দেখে; সেইরূপ প্রতীক্ষিত—'বর'কে ইংরেজীতে 'Prince charming' বলে।

যৌবননদী করিবে সন্তাপ—প্রেমহীন যৌবন যেন তরঙ্গহীন বা স্রোতোহীন নদী।

ওগো, ভোলা ভালো তবে, ইত্যাদি। জীবন ও যৌবনকে সার্থক করিবার আশা ত্যাগ করাই ভালো, চির-উপবাসের বৈরাগ্য-সাধনাই অতঃপর একমাত্র উপায়। হয়তো বা, ঐ ব্যর্থ-যৌবনের দুঃখকেই বক্ষে লালন করিয়া, উহারই গান গাহিয়া প্রাণ একটু তৃপ্তি পাইবে। ইহাও খাঁটি কাব্যরস—একটি সুন্দর সেন্টিমেণ্ট।

কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো, ইত্যাদি। আরেক প্রকার ভ্রষ্ট লগ্নে নারীর অবস্থা প্রায় একরূপ—

রয়েছি বিজন রাজপথ-পানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

['ভ্রষ্টলগ্ন'—কল্পনা

এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে। এই পংক্তিটি সমগ্র কবিতার মর্ম্মার্থ বহন করিতেছে, এবং একটি নিত্য-ব্যবহারযোগ্য কবি-বচন হইয়া উঠিয়াছে।

গানভঙ্গ

কবিতা-প্রসঙ্গ

ইহা রূপক নহে—বাস্তব কাহিনীর মূলে একটি বৃহত্তর ভাবসত্যের ইঙ্গিত আছে। কবি নাকি ঐরূপ একটি ঘটনা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এখানে কল্পনা রূপ হইতে ভাবে নয়—ভাব হইতেই রূপে পৌঁছিয়াছে। নিদ্রাবস্থার অবচেতন মনে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে বাস্তব-চিত্র-রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বপ্নাবস্থার সম্বন্ধে এক কবি-দার্শনিক যাহা লিখিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উদ্ধৃত করিবার যোগ্য, যথা—

The truth is that images and thoughts possess a power in and of themselves, independent of that act of judgment by which we affirm or deny the existence of a reality correspondent to them. Such is the ordinary state of the mind in dreams... The forms and thoughts act merely by their own inherent power, and the strong feelings at times apparently connected with them are in point of fact, bodily sensations, which are the causes or occasions of the images; not, as when we are awake, the effects of them.

[Coleridge

—ইহা বৈজ্ঞানিকের কথা নয়—কবির সাক্ষ্য; ঐ কবিও তাঁহার একটি বিখ্যাত কবিতাকে (Kubla khan) স্বপ্নে লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্ন সকলেই দেখে, কেবল কবির কল্পনাশক্তির গুণে স্বপ্নও এমন বাস্তবরূপ ধারণ করে; কখনো কখনো স্বপ্নও জাগরণে বাস্তব হইয়া উঠে; সেখানে কবিশক্তি নয়—অন্তশ্চৈতন্যের একটি রহস্যময় ক্রিয়ার ফলে ঐরূপ ঘটে। এ কবিতায় ঐ স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাটির প্রেরণা কবির সজ্ঞান মনেরই একটি ভাব, পরে তাহা স্বপ্নে রূপময় হইয়াছিল। সেই ভাবটি এই—

"যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে।"

কবিতা-পাঠ

ছন্দটি মিশ্র বা অসম পর্ব্বের ছন্দ, পর্ব্বভাগ এইরূপ—

কণ্ঠে খেলিতেছে। সাতটি সুর। সাতটি যেন। পোষাপাখী

৭ ৫ ৫ ৪

—অর্থাৎ, ৭+৫+৫+৪; শেষেরটি চার মাত্রার একটি খণ্ডপর্ব্ব।

গাহিছে কাশীনাথ, ইত্যাদি। ওস্তাদী গানের সূক্ষ্ম-জটিল, দুরূহ যতকিছু কসরতে দক্ষ একজন গায়ক গান গাহিতেছে। তাহাতে প্রাণ অপেক্ষা কালোয়াতের কারিগরিই অধিক—সভা তাহাতেই মুগ্ধ হইতেছে। এতদিন এমন ওস্তাদীর গৌরব ছিল না, ইদানীং হইয়াছে; আধুনিক গানে—সেই পূর্ব্বকালের মত—কেবল প্রাণের দরদ থাকিলেই চলিবে না।

বরজলাল ছাড়া কাহারো গান, ইত্যাদি। কারণ, তাহার গানে সেই প্রাণের দরদ ছিল বেশি—পরের পংক্তিগুলিতে তাহার উল্লেখ আছে।

এ যেন পাখি লয়ে····· শিকারি বিড়ালের খেলা। ঐ একটি উপমায় প্রাচীন গীত-রসিকের মনোভাব কেমন ফুটিয়াছে! কবির নিজেরও মনোভাব—বিচার যেমনই হোক—রুচি ও রস-পিপাসা ঐরূপ ছিল। যখন যে প্রসঙ্গেই হোক—কাব্যরস, হাস্য ও বিদ্রূপ, নীতিকথা ও বিচার-বিতর্ক—সর্ব্বত্র রবীন্দ্রনাথের ঐ উপমার মত অস্ত্র আর নাই।

বরজলাল বুড়া, শুক্লকেশ, ইত্যাদি। এইখান হইতে যে চিত্র ও চরিত্র, ভাবের পরিবেশ (atmosphere) এবং বর্ণনার সূক্ষ্ম রেখাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে—পদ্যচ্ছন্দে তেমন কাহিনী-রস রবীন্দ্র-কাব্যে অল্পই আছে। কাব্যচ্ছন্দে রচিত বলিয়া একটা বড় সুবিধা হইয়াছে, উপমার পর উপমা যোজনা করিতে কিছুমাত্র বাধে নাই, যথা—'সাতটি যেন পোষা পাখি'; 'শাণিত তরবারি গানটি যেন'; 'পাখি লয়ে শিকারি বিড়ালের খেলা'; 'ক্ষুদ্র পাখী যেন ঝড়ের মাঝে'; 'তুফানমাঝে ক্ষীণ তরী'; 'হেলায় কলরব শিলার মত', 'বাতাসে দীপ নেবে নেবে'।

গানের সুতা ছিঁড়ি, ইত্যাদি। এই শেষ উপমাটিতে কবির সহানুভূতি ও ভাবদৃষ্টির অব্যর্থতা এবং উপমা-আহরণে যাদুশক্তির পরিচয় আছে। বৃদ্ধ গায়কের সেই 'spirit willing', কিন্তু 'flesh is weak'-এর কি মর্ম্মভেদী অবস্থা ঐ উপমার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে! প্রভু ও বন্ধুর প্রতি তাহার সেই প্রেম, সেই সমপ্রাণতার গভীর আবেগও ব্যর্থ হইয়াছে—দুর্ব্বল দেহ ও ক্ষীণ কণ্ঠের উপরে তাহা জয়ী হইতে পারিল না। গানের সভায় প্রাণের এই যে পরাজয়, কবি তাহা কি গভীর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন!

জগতে আমাদের বিজন সভা, ইত্যাদি। ইহাই বার্দ্ধক্যের একটা বড় ট্র্যাজেডি; নূতনের সহিত পুরাতনের এই বিরোধ যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই, এক যুগের মানুষ আরেক যুগ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে বড় একা বোধ করে—সংসারে সে নির্ব্বাসিতের মত বাস করে।

এইজন্যই বোধ হয়, আমদের শাস্ত্রে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—বিধি আছে। ঐ অবস্থার কথা দুইটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতায় আছে—প্রসঙ্গ যেমনই হোক—ভাব একই—

.... I feel like one
Who treads alone
Some banquet hall deserted
Whose lights are fled
Whose garlands dead
And all but he departed !

[*Thomas Moore*

টেনিসনের কবিতায় Sir Bedivere বলিতেছে—

Ah ! my Lord Arthur, whither shall go ?...
For now I see the true old times are dead···
And the days darken around me, and the years,
Among new men, strange faces, other mind

[*Morte D' Arthur*

—এখানেও সেই 'Strange faces, other minds'—

এখন আসিয়াছে নূতন লোক
ধরায় নব নব বঙ্গ।

একাকী গায়কের নহে তো গান, ইত্যাদি। মানুষে মানুষে যেখানেই সত্যকার অন্তরঙ্গতা ঘটে, যেখানেই কোন সত্যকে প্রাণ হইতে প্রাণে সঞ্চারিত করিতে হয়, সেইখানেই ঐ প্রেম বা শ্রদ্ধা দুইপক্ষের মধ্যে সেতুর কাজ করে, কারণ—

যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, ইত্যাদি। শুধু গান নয়—গানের রস অর্থে, পরমের অনুভূতিও বটে, সেই অনুভূতির অংশীদার হইবার, বা করিবার জন্য যেখানে একের সহিত অপরের মিলন ঘটে, সেখানে তাহার সবচেয়ে বড় উপায় বা উপকরণ—প্রেম, অর্থাৎ দুই-পক্ষেরই পরস্পর-উন্মুখ হৃদয় বা একপ্রাণতা। 'বোবার সভা'—অর্থাৎ, যেখানে হৃদয় অসাড়, রস-পিপাসাহীন, প্রেম-বিমুখ।

জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি, ইত্যাদি। ইহার আগে দুইটি উপমার দৃষ্টান্ত আছে। এখানে 'ধ্বনি' অর্থে 'সুর'—যাহা জড়ের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহাতে যেন প্রাণসঞ্চার করে। 'যুগল মিলিয়াছে'—বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'এক হাতে তালি বাজে না'—সে অন্য অর্থে, এখানে ভাব ঠিক উল্টা বটে, কিন্তু তত্ত্ব একই। অর্থাৎ, 'দুই' না হইলে কোনরকম সাড়াই জাগে না—প্রেমেরই হোক, আর অপ্রেমেরই হোক।

—

প্রত্যাখ্যান

কবিতা-প্রসঙ্গ

নারী তাহাব প্রেমিকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতেছে—কাবণ, সে তেমন প্রেমের মর্য্যাদা বক্ষা করিতে পাবিবে না—সে বড দুর্ব্বল, ঐ প্রেম তাহা অপেক্ষা অনেক বড। তাহাকে গ্রহণ কবিলে নিজেব ধর্ম্মও হারাইতে হয়—সত্যনিষ্ঠা থাকে না, তাই সে সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান কবিয়া আজীবন হতাশাব দুঃখ ভোগ করিবে, তবু তাহাকে গ্রহণ করিয়া প্রেমেব ও ধর্ম্মেব মর্য্যাদা হানি করিবে না।

কবিতা-পাঠ

মনের কথা রেখেছি মনে যতনে। কারণ—

লুকানো প্রাণেব প্রেম পবিত্র সে কত
আঁধাব হৃদযতলে মানিকের মতো জ্বলে
আলোতে দেখায কালো কলঙ্কের মতো।

['ব্যক্ত প্রেম'—মানসী

শোণিতরাঙা বেদনা। এ ভাষা ইংবেজী, তুলনীয়—

Sudden a thonght came ..
And in his pained heart made purple riot

[*Keats : The Eve of St. Agnes*

পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা। তোমাব প্রেম বাজাব মত, আমাব প্রেম জীর্ণ বসনপরা ভিখাবিণী, কাবণ, তাহা বাসনামাত্র—দীন-দুর্ব্বলেব বাসনা। এ যেন সেই 'দুর্ব্বোধ' কবিতাটিতে প্রণয়ীর প্রেমেব পবিচয় পাইয়া নায়িকা বলিতেছে।

কী ধন তুমি এনেছ ভরি দু হাতে। সংক্ষেপে নায়িকার বক্তব্য এই যে, 'তোমাব অত বড প্রেম আমি বহন করিতে পারিব না—ঐ প্রেমের প্রতিদানে আমাকে সর্ব্ব সমর্পণ কবিতে হইবে, ততখানি সামর্থ্য আমার নাই, অতএব তোমার ঐ প্রেম আমার মত অপাত্রে দান কবিও না'। এইরূপ 'প্রত্যাখ্যানে', নায়িকাব প্রেম যেমনই হোক—তাহার ঐ ধর্ম্মবোধ বা নৈতিক ধর্ম্মনিষ্ঠাই গৌববান্বিত হইয়াছে।

রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা। ইহা প্রেমের কথা নয়। প্রেম একটা সাধ মাত্র নয়, যদি কোন সাধনাও তাহাব থাকে, তবে তাহা প্রেমের আগে নয়—পরে। ভালবাসিবার জন্য কোন সাধনা কবিতে হয় না—তাহা হৃদয়ের মহাজাগরণ—একটা পবম প্রাপ্তি। ভালবাসা অবশে হৃদয়কে অধিকাব করে, পবে সেই প্রেমে সাধনাব অন্ত থাকে না।

যে সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে, ইত্যাদি।—পুরুষেব অতি উচ্চ ভাবপ্রধান (Idealistic) যে-প্রেম—নারী হৃদয়ে তাহা ভয় ও ভক্তি উদ্রেক করে। তেমন প্রেমের নাগাল

না পাইয়া ঐ নারী লজ্জা ও বেদনা বোধ করিতেছে। তেমন পুরুষকে সে পূজা করিতে পারে, কিন্তু ভালবাসিতে পারে না; ভালবাসার কোন ব্যবধান থাকে না—এমন কি তাহাতে পূজাও প্রেম হইয়া উঠে, অর্থাৎ দুই এক হইয়া যায়—

"The spirit of the worm beneath the sod
In love and worship blends itself with God."

[পূর্ব্বে দেখ

আমাদের বৈষ্ণব-সাধনা এই প্রেমতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এসেছ তুমি গলায় মালা ধরিয়া, ইত্যাদি। কথাগুলিতে নারী তাহার দৈন্য ও দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতেছে; কবিতা-প্রসঙ্গ দেখ।

অন্ধকারে মালাবদল কে করে। 'হৃদয় যখন প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয় নাই, যখন আপন মনের 'জীর্ণচীর বাসনা' ত্যাগ করিতে পারি নাই, তখন তোমার ঐ প্রেমের মাল্য আমার কণ্ঠে ধারণ করিব কেমন করিয়া—'বদলে' পরাইবার মালাও যে আমার নাই!'

রবীন্দ্রনাথের এই সকল প্রেম-কবিতায়, সর্ব্বত্র আত্মদানে নানা বিঘ্ন ঘটে--অথবা, বিঘ্ন একই, প্রেমিক-প্রেমিকার তীক্ষ্ণ আত্ম-চেতনা। তাই মিলন অপেক্ষা বিরহ, গ্রহণ অপেক্ষা ত্যাগই শ্রেয় হইয়া উঠে। এইজন্য কোনটাই সত্যকার প্রেম-কবিতা হইতে পারে নাই; এ বিষয়ে আমি প্রথম হইতে সবিস্তারে আলোচনা করিতেছি, কারণ, রবীন্দ্র-কাব্যের বিচারে এই প্রশ্নটি যেমন গুরুতর, তেমনই সর্ব্বত্র উঁকি দিবে।

লজ্জা

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটি 'মানসী'র 'ব্যক্ত প্রেম' কবিতার সহিত পাঠ কবিবার যোগ্য। সেখানে 'কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ?'—ইহাই ছিল প্রেমিকার অভিযোগ, এখানে তাহার সকরুণ অনুনয়—"সকলই তোমার হবে, কেবলই সরমখানি রেখেছি।" এ প্রেম—'প্রথম প্রণয়ভীতা' প্রেম—যখন কুমারী-হৃদয়ের অবলজ্জা ঘোচে নাই,—অর্থাৎ, গোপিনীর 'বস্ত্রহরণ'-রূপ পরীক্ষার সে আদৌ উপযুক্ত নয়। কিন্তু সদ্য-পরিণীতার পক্ষে ঐরূপ লজ্জা (modesty) যদি বা যথার্থ ও স্বাভাবিক হয়—এখানে উহার ঐরূপ বচনবিন্যাস প্রগল্‌ভা নায়িকার মত। নায়িকার ঐ কথাগুলিতেও প্রেমের পরিবর্ত্তে, সৌন্দর্য্যের হিল্লোল আছে—দেহের লাবণ্যের সহিত মানস-ভঙ্গিমা মিলিয়া বেশ একটু গীতাভিনয়ের মত হইয়াছে; এ যেন প্রেমের একটি আর্ট—ঐ ছলটুকুই মধুর। কবি সেই স্বভাব-সরলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই; মনে হয়, ঐ 'সরমখানি' তেমন কোন নবোদ্ভিন্নযৌবনা বালাবধূর সরম নয়—উহা কোন এক সুরসিকা বিলাসিনী ভামিনীর প্রণয়-লীলা।

কবিতা-পাঠ

চাহিয়া নিজের পানে···সযতনে আপনারে ঢেকেছি। কারণ, এ প্রেম অতিশয় আত্ম-সচেতন। উহা নবোঢ়ার ব্রীড়া নয়,—পাছে প্রণয়ীর চক্ষে নিজের হীনতা প্রকাশ পায়, সেই বিষয়ে সতর্কতা।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস, ইত্যাদি। ইহাকেই 'হাব-ভাব' প্রদর্শন বলে।

আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া, ইত্যাদি। স্বগত-উক্তি হিসাবে খুবই সুন্দর; অথবা পত্রেও এমন আত্ম-কথা প্রকাশ করা শোভন ও স্বাভাবিক হইতে পারে; নতুবা বঁধুকে এমন কথা সাক্ষাতে বলিলে, তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

পূর্ণচন্দ্রকররাশি মূর্চ্ছাতুর পড়ে আসি, ইত্যাদি। নিজের রূপ-যৌবন সম্বন্ধে নায়িকা পূর্ণ-সচেতন; এমন কি, সেই রূপের মোহে নিজেই মুগ্ধ। এ যেন বঁধুকেও ব্যাকুল করিবার অতি-সূক্ষ্ম কৌশল।

হেন কালে তুমি এলে, ইত্যাদি। তখনো আপন রূপ-যৌবনের রসালসে থাকি, তাই বেশবাস গুছাইয়া লইতে বিলম্ব হয়, তুমিও আমাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া ফেলিলে লজ্জায় মরিয়া যাই। ইহাকেই বলে নারীর ছলা-কলা; কারণ, যতই লজ্জা হোক, ঐভাবে নিজ রূপলাবণ্য দেখাইতে পারাও কম সুখকর নয়।

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে, ইত্যাদি। আগের পংক্তিগুলিতে রূপ-যৌবনের ঐ মাদকতা-সঞ্চারের পর এইরূপ অনুনয়-অভিনয়ের নায়িকা-বৃত্তি (flirtation) বলিয়াই মনে হয়।

ছলছল দু'নয়ান, ইত্যাদি এই স্তবকটিতে যাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে ভাষার দিক দিয়া তাহা যতই শুচি ও সুকুমার হোক, অর্থের দিক দিয়া সুরুচি-সঙ্গত হয় নাই। নায়কের অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছে। ঠিক এমন অবস্থা, অর্থাৎ প্রথম 'প্রণয়ভীতা'র ঐ অবস্থা—ভারত-চন্দ্রের কাব্যে আরও খোলাখুলি বর্ণিত হইয়াছে; এখানে ঐরূপ ভাষার আবরণে, সেই রস আরও সূক্ষ্ম ও suggestive হওয়ায় আধুনিক রুচিসঙ্গত হইয়াছে—রস আরও ঘনীভূত হইয়াছে।

বসন্তনিশীথে বঁধু, লহো গন্ধ, লহো মধু। ইহাও প্রায় সেই এক কথা—

> লও তার মধুর সৌরভ
> দেখো তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
> মধু তার করো তুমি পান
> ভালবাসো, প্রেমে হও বলী
> চেয়ো না তাহারে!
>
> ['নিষ্ফল কামনা'—মানসী

এমন মোহনভঙ্গে··লাবণ্য যায় লুটিয়া। ইহাই রবীন্দ্রীয় প্রেম কবিতার মূল কথা; ঐ লাবণ্য, ঐ সৌন্দর্য্যই সব—উহা প্রেমেরও উপরে।

সকলি তোমার হবে, ইত্যাদি। ভাবটি খুবই সুন্দর বটে; রস হিসাবে বড়ই উপভোগ্য। তথাপি ইহা প্রেমের কবিতা নয়—প্রেম-রসের কবিতা; অর্থাৎ উহা মানস-

উপভোগের বস্তু। ছবিকে যেমন কেহ চুম্বন আলিঙ্গন করে না, তেমনই সুন্দরী নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইলে—দেহ-সম্পর্ক না করিয়া, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য পানে প্রেমের ঐ রস-সম্ভোগ করাই যাইবে। নায়িকা যে সরমখানি রাখিবার জন্য বলিয়াছে, তাহাতে ঐ প্রেম-রস-সম্ভোগে কোন বাধা নাই।

পুরস্কার

কবিতা-প্রসঙ্গ

(এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। একটি পুরাতন রূপকথার আদলটি মাত্র রাখিয়া কবি একদিকে যেমন রীতিমত একটি কাহিনী রচনা করিয়াছেন—সমাজ-সংসারের বাস্তব চিত্র ও চরিত্র তাহাতে আছে, তেমনই, সেই রূপকথার সুযোগে কাব্য ও কবিজীবনের একটি অত্যুচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, এজন্য ইহা একাধারে একটি গল্প এবং কবি-গাথা হইয়াছে। তথাপি, কবি গাথা হিসাবেই এ কবিতা সার্থক হইয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, কবি তাঁহার নিজেরই কাব্য-মন্ত্র—অন্ততঃ তাঁহার সেই কালের কবি-মানসের আকুতি এবং কবিধর্ম্ম ও কবিকর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধ্যান-ধারণা এই কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু শুধুই ভাব বা ভাবনা নয়—সেই ভাবকে বাহিরের বাস্তব উপাদানের সাহায্যে এমন মূর্ত্তিমান করিয়া তোলাই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি-শক্তির পরিচায়ক। একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট humour বা সংসার-রস-রসিকতা, অপরদিকে, তেমনই ভাবের লিরিক-আবেগ ও গভীর ভাবুকতা একটি মূল প্রেরণার অন্তর্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টি-শক্তির এমন অবলীলা, এবং—ভাব ও রূপ, আদর্শ ও বাস্তব, তথ্য ও তত্ত্বের এমন মিলন—রবীন্দ্র-কাব্যে সর্ব্বত্র সুলভ নয়। ইহাতে ভাব ও চিত্র, বর্ণনা ও রসাবেশ—অপরূপ ভাষায়, সঙ্গীতের স্বরগ্রামের মত অবলীলায় উঠা-নামা করিতেছে,—"কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি"। নভেলের গদ্যভাষাও যেমন ছন্দোবদ্ধ হইয়া একটি নূতন রসের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের দুই বিপরীত প্রান্তে ভাষার কি চকিত গতি! পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ কবিতায় ঐ কাহিনী-রসও গৌণ, কবির মুখ্য অভিপ্রায় কবিজীবন ও কবি-ধর্ম্মের আদর্শকে একটি কাহিনীর সাহায্যে সাকার করিয়া তোলা। এ কাহিনীর ঐ যে কবি-চরিত্র, উহা অবাস্তব বলিয়া মনে হয় না আরও এই কারণে যে, উহাই আমাদের দেশে সকল সাত্ত্বিক জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি-দম্পতীর ঐ চিত্রও—প্রেমের ঐ স্নেহ ও শুশ্রূষা, গৃহলক্ষ্মীরূপা নারীর সরলতা ও হৃদয়-মাধুর্য্য—ঐ সকলই আমাদের সংসারে অতি-পরিচিত বলিলেও হয়।) এ দিক দিয়াও কবি এ কবিতায় জাতীয়-সংস্কৃতির একটি সুন্দর আলেখ্য রচনা করিয়াছেন।

কবিতা-পাঠ

কবিতার ঐ আরম্ভটি—উহার ঐ বাস্তব ভঙ্গিটি পাঠক-চিত্তকে যেন সবলে আকর্ষণ করে। কবি-জায়ার অবস্থা সত্যই সহানুভূতির যোগ্য, এমন ভাবে-ভোলা, সংসার-বুদ্ধিহীন মানুষকে লইয়া নারী-গৃহিণীর সংসার করা কষ্টকর নয়তো কি?

ভয় নাহি করি, ইত্যাদি। 'মুখনাড়া'—অতিশয় ঘরোয়া বুলি, অর্থ—অপ্রিয় ভাষণ, নিন্দাবাক্য। কবি ভাবে-ভোলা হইলেও অতিশয় রসিক-ব্যক্তি—ইংরেজীতে যাহাকে 'gallant' বলে, সেইরূপ নারী-তোষণপটুও বটে। কথাগুলিতে নিজ পত্নীর বিষয়ে গর্ব্বোৎফুল্লতাও আছে। কবি বলিতেছেন, 'চঞ্চলা লক্ষ্মী আমার ঘরে অচঞ্চলা হইয়া বিরাজ করিতেছেন (স্মরণীয় —'এক ভাৰ্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া'), কাজেই সেদিক দিয়া কোন চিন্তার কারণ নাই—ঘরে যখন রহিয়াছেন তখন ভাণ্ডারে থাকিবেন না কেন, অর্থাৎ, অন্নবস্ত্রের অভাব হইবে কেন?' তুলনীয়—

সদানন্দময়ী আনন্দরূপিনী,
স্বরগের জ্যোতি মুরতিমতী,
মানস সরস বিকচ নলিনী
আলয় কমলা করুণাবতী।

—বিহারীলাল

[পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, রবীন্দ্রনাথ ঐ কবি-চরিত্রটি কবি বিহারীলালকেই আদর্শ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।]

ভারতী না থাকে থির এক পল, ইত্যাদি। ইহাই কবির কৈফিয়ৎ, লক্ষ্মীর সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত, কিন্তু সরস্বতী বড়ই ছলনাময়ী, কখন যে তাঁহার কৃপা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, তাই সর্ব্বদাই আরাধনায় রত থাকিতে হয়।

পারিনেকো আর। স্নেহমিশ্রিত অনুযোগ কথার ঐ ভঙ্গিটি অতিশয় বাস্তব, মেয়েদের মুখে ঠিক ঐ বাক্যটিই শুনিতে পাওয়া যায়।

এতেক বলিয়া ইত্যাদি। ভাষার ঝঙ্কার ও ররিত্ব দুই-ই লক্ষণীয়। কবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পাগল পুরুষকে নারী এমনই করিয়া সংসারে টানিয়া বাঁধিয়া রাখে, আদর্শের সহিত বাস্তবের রফা হয়।—

"তুমি হেসে বসে' বামে সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর
তোমারি প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস গেহ,
পাগলে করিলে গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।"

—অক্ষয়কুমার বড়াল।

হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়, ইত্যাদি। এ কবিতার ঐ মিলগুলিও রস-সৃষ্টির অমূল্য সহায় হইয়াছে। দীর্ঘ কবিতার এই যে নিখুঁত ও ঘনঘন মিলের অনর্গল প্রবাহ—শুধু আশ্চর্য্যজনক নয়, উহা ঐ কবিতার স্টাইলও বটে। কবির প্রতি কবি-পত্নীর ঐ অভিভাবকের মত ব্যবহারই—ঐ সদুপদেশ-দান—অতিমধুর দাম্পত্য-সূচক হইয়াছে।

মুখে হেসে বলে, ইত্যাদি। কবির ঐরূপ ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। যাহারা বিষয়ী লোক, সংসারে যাহারা সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা কামনা করে—তাহারাই বড়দের আরাধনা ও আনুগত্য করিয়া থাকে—রাজা-রাজড়ার দরবারে ও বড়লোকের বৈঠকখানায় নিত্য গতায়াত

করে। কিন্তু যাহারা সত্য ও সুন্দরের সাধক, তাহারা অন্তরে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিতে চায় বলিয়া, ঐরূপ প্রতিষ্ঠা-লাভ তাহাদের কাম্য নয়; কবিতার শেষের দিকে কবির মুখেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'বিধবা হইবে পাছে'—রসিকতা একটু স্থূল হইলেও চরিত্রের পক্ষে খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐরূপ 'পুরাকালীন' ভার্য্যার সহিত।

নিয়ে এসো সাজ, ইত্যাদি। কবি একবার শেষ চেষ্টা করিলেন—যাহাতে যাইতে না হয়। ভাবটা এই যে, রাজসভায় যাওয়া তো সহজ নয়, উপযুক্ত পোষাক চাই, নহিলে দ্বারিগণ প্রবেশ করিতেই দিবে না।

আনে বেশবাস নানান-ধরন, ইত্যাদি। মনে রাখিতে হইবে—গল্পটি মূলে একটি রূপকথা; তাই সবই সম্ভব।

আ মরি, সেজেছ কিবা! কবিটি অতিশয় সুপুরুষ—চেহারাটিও কবিজনোচিত। দম্পতীটি যে নিঃসন্তান, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

কিছু না মানিব, ইত্যাদি। কবিরও ভাবোদ্রেক হইয়াছে; ঐরূপ সাজসজ্জা এবং গৃহিণীর মুখে নিজ গৌরবগান-শ্রবণে কবির সাহস হইয়াছে—আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়াছে।

রাজভাণ্ডার · ও রাঙা চরণতলে। সহসা ধন-রত্নের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে—শুধুই গৃহিণীকে তুষ্ট করিবার জন্য নয়—গৃহিণীর সেই চরণতল এমনই মহার্ঘ-সুন্দর যে, সমস্ত রাজভাণ্ডারের রত্নরাশি ভিন্ন তাহার উপযুক্ত অর্ঘ্য আর কি হইতে পারে? কবি সেই Knight-Errant-দের মতই একটা দুঃসাধ্য সাধনে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে, ইত্যাদি। এ যেন কলিকাতার মত একটি সহরের রাজপথ, ঐরূপ বাতায়নও একটি সুদৃশ্য হর্ম্ম্য মনে করাইয়া দেয়। কবি-রমণীর আচরণ, এবং বিশেষ করিয়া ঐ উক্তি 'এমনটি আর পড়িল না চোখে'—ইহাও এ কবিতার একটি স্বতন্ত্র রস।

মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি, ইত্যাদি। ঐ একটি কথায় কবি-চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে; এই অনুভূতিই কবিচিত্তের নির্ম্মলতা, এবং কবিদৃষ্টির স্বচ্ছতার পরিচায়ক।

বসি মহারাজ মহেন্দ্ররায় ইত্যাদি। রূপকথার অবকাশে সেকালের রাজসভার একটি ঐতিহাসিক চিত্র। 'জ্ঞানী ও গুণীর পালক'—এমন ক্ষুদ্র রাজা বা জমিদার সেদিন পর্য্যন্ত এদেশে বিরল ছিল না, কবির নিজের কালেও ইহা একেবারে কিম্বদন্তী হইয়া উঠে নাই; তিনি কেবল চিত্রটি আরও সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সভায় একে একে যাহাদের আবির্ভাব হইতেছে, তাহাদের বৃত্তি ও চরিত্র যেমন কালোপযোগী, তেমনই তাহাদের প্রতি ঐ ব্যবহার সেকালের রাজবিধিসঙ্গত। এখন আমরা রাজাকে রাজার রূপেই দেখিতেছি, পরে তাঁহার ব্যক্তি হৃদয়টিরও পরিচয় পাইব।

কৃপানির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া, ইত্যাদি। শুধুই শাসন বা প্রভুত্ব গৌরব নয়, ঐরূপ বদান্যতাও সেই প্রভুত্বের একটি ভূষণ, উহাও একটা বড় 'রাজগৌরব'।

দেশের প্রধান চর। রাজা ও রাজ্যের একটি প্রধান সেবক বটে। কিন্তু কবি যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বকালের ধূর্ত্ত ও বিচক্ষণ মানুষের চরিত্র, 'প্রধান চর' হইবার উপযুক্ত যে গুণগুলি উহার আছে—সেই অভিনয়-পটুতা সকলরকম প্রতারণা-কার্য্যে আবশ্যক; সে পটুতা এমনই যে, সংসারে সমাজে সকলকে ঠকাইয়া উহারা শুধুই শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হয় না—আপামর-সাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধারও অধিকারী হয়; উহাও একটা প্রতিভা বর্ত্তমান সমাজের এমন কত মানুষকে আমরা দেখিতেছি!

অমনি আদেশ হইল রাজার, ইত্যাদি। এ পুরস্কার সাধুতার জন্য নয়, ইহা রাজারও একটা দান-কর্ম্ম নহে; মন্ত্রীর গোপন-সুপারিশে উহা রাজকর্ম্ম-ঘটিত একটা পুরস্কার। সভাসদ্‌গণ তাহা জানিল না, রাজার সজ্জন-প্রীতির প্রশংসা করিল।

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ, ইত্যাদি। কবি 'বৈয়াকরণ' অর্থাৎ সংস্কৃত-পণ্ডিতদের এই যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সেকালের সামাজিকবর্গ সমর্থন করিত না—একালেও ঐ বিদ্যার পণ্ডিতগণ রুষ্ট হইবেন। ইহাতে আধুনিক কবি-সাহিত্যিক ও কাব্যরসিকের মনোভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। কবির 'জয়-পরাজয়' নামক ছোটগল্পে ঐরূপ পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা আরও গভীর-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতগণের এখনও একমাত্র কাজ—পুঁথির অক্ষরগুলাকে চর্ব্বণ করা; এবং যে-কোন বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ বা উত্তরপক্ষ হইয়া তর্কে জয়লাভ করা। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের স্রষ্টা যাহারা, তাঁহারা সকলেই ঐরূপ পাণ্ডিত্যকে ঘৃণা করিয়াছেন। এখানে কবি সেই পণ্ডিতের নীরস-কঠোর 'পণ্ডিত'-রূপটিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু। যত না বুঝে ততই শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। 'হিং টিং ছট' দ্রষ্টব্য।

আমি শুধু এক কবি। 'বিপন্ন মুখছবি'র পর এইরূপ আত্মপরিচয় দান খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু অর্থপূর্ণও বটে। উহাতে বিনয় থাকিলেও, ঐ বাক্যের দ্বারা কবি ইহাও জানাইলেন যে, এই ধন-মান, শক্তি ও প্রতিপত্তি-লাভের সংসারে তাঁহার কোন স্থান বা মর্য্যাদা নাই।

রাজা কহে, ইত্যাদি। সেকালে রাজা ও জমিদারগণের অনেকেই কবি ও কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। কাব্য-গীত-নৃত্যকলা প্রভৃতির প্রতি তাহাদের সেই অনুরাগ সমাজের উচ্চ হইতে নিম্নস্তরে একটি সমান সহৃদয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল,—রাজাদের ঐ কাব্য-প্রীতি রাজ-চরিত্র হইতে মানুষটাকে পৃথক করিয়া রাখিত।

মন্ত্রী ভাবিল, ইত্যাদি। মন্ত্রীও যদি রাজার মত কাব্যামোদী হয়, তবে রাজ্যচালনা অসম্ভব।

চলি গেল যবে সভ্যসুজন, ইত্যাদি। এইখান হইতে কবিতা আরম্ভ হইল—গল্পের পরে গান সুরু হইল।

বাণীবন্দনা করে নতমুখে। এই বাণী-বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ ঐ একবার তাঁহার

কাব্যমন্ত্র ও কবিমন্ত্রের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ব্যক্তিগত হইলেও, নিখিল কবি-কর্ম্ম ও কবি-জীবনের কয়েকটি তত্ত্ব উহাতে আছে, অর্থাৎ ইহাতে কবি নিজের 'জীবন-দেবতা'কে নয়—নিখিল কাব্য-দেবতা বা 'সরস্বতী'কেই আবাহন ও বন্দনা করিতেছেন। আরও একটি কথা এই যে, ঐ 'বাণী-বন্দনা' যাহার—সেই কবিকে তিনি কল্পনা করেন নাই-চোখে দেখিয়াছিলেন, ঐ জীবন এবং ঐ চরিত্র বিহারীলালের। পূর্ব্বে 'ছবি ও গানে'র একটি কবিতায় তিনি যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, এখানে তাহাই আরও সুস্পষ্ট রেখায় ও উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ('প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য)। এই কবিকে তিনি যেমন একদা 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় প্রণাম করিয়াছিলেন, তেমনই পুনরায় এখানে, এবং 'চিত্রা'র নাম-কবিতাটিতে তাঁহাকেই স্মরণ করিয়াছেন।

খ্যাপার মতন পেয়েছি স্মরগসুধা। তুলনীয়—

> তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী,
> আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
> হোক গে এ বসুমতী যার খুসী তার।

এবং—

> যাও লক্ষ্মী অলকায়
> যাও লক্ষ্মী অমরায়,
> এসো না এ যোগি জন তপোবনে আর।
>
> [সারদামঙ্গল

তবু মাঝে মাঝে কেঁদে উঠে প্রাণ। কারণ, দেহটা রক্ত-মাংসের, ঐটুকু দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিতে হইবে।

মা গো, একবার ঝংকারো বীণা ইত্যাদি। তুলনীয়, বিহারীলাল—

> অয়ি সরস্বতী দেবী! ছেড়ো না থেকে
> তব অনুরত ভক্ত আমি চিরকাল
> ভুলিব না কমলার কামরূপ দেখে,
> ভুগিতে প্রস্তুত আছি, যেমন কপাল।
> বাজাও তোমার সেই বিমোহিনী বীণা।
> শুনিয়ে জুড়াক মোর তাপিত হৃদয়
> জুড়াতে কে আমার আছে তোমা বিনা,
> তোমা বিনা ত্রিভুবন মরু মনে হয়।
>
> ['নিসর্গ-সন্দর্শন'—প্রথম সর্গ

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ বীণাপানির বীণাঝঙ্কার সৃষ্টির রূপ-রস অতিক্রম করিয়া, আরও ঊর্দ্ধে অসীমের অন্তঃপুরে একটি অদ্বৈত রাগিণীতে সমাহিত হইতে চায়—রূপ হইতে রসে, ভাব হইতে সুরে প্রয়াণ করে। জগৎ ও জীবনের সকল ভাঙা-গড়াকে সেই রাগিণীই মনোহর করিয়া তুলিতেছে, তাহাই অনিত্যের অন্তরালে নিত্যের আশ্বাস। ঐ রাগিণী যাহার প্রাণ-বর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সে জগৎ ভুলিয়াছে,—জন্ম ও মৃত্যুর সকল বিড়ম্বনা হইতে মুক্তিলাভ

করিয়া একটি অপূর্ব্ব ভাব-সমাধির অমৃত-আস্বাদন করে। এই বাণী-বন্দনায় রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল-মন্ত্র স্বীকৃত হইয়াছে—আমি যে বলিয়াছি সঙ্গীতই এই কাব্যের আদি প্রেরণা কবি এখানে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'মানস-সুন্দরী'তে কবি যে বলিয়াছেন—

"শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,"

—তাহা মিথ্যা নহে।

যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান, ইত্যাদি। এ এক অভিনব সৃষ্টিতত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনে 'বাক'ই ব্রহ্মের প্রথম দ্রব-রূপ, তাহার হ্লাদিনী-শক্তির আদি আবির্ভাব ঐ বাক্-রূপে, তাহাই সৃষ্টির আদি-প্রকৃতি, সেই 'বাক' রূপময়। কবির সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে সেই রূপও স্থূল, তাহাতে মর্ত্ত্যের মলিনতা আছে; তাই তাহাকেও বাদ দিয়া আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে সেখানে আছে ঐ সঙ্গীত—দ্রবীভূত ব্রহ্মের আনন্দ ধারা, তাহাই সত্য ও শাশ্বত। সেই সঙ্গীত যে শুনিয়াছে, সে "জানে না আপনা জানে না ধরণী—সংসার-কোলাহল"। বিহারীলাল এতটা ভাবতান্ত্রিক (Idealist) নহেন, তিনি ঐ রূপগুলাকে—বিশ্বের দৃশ্যগুলাকে—সকল ভাবের, তথা সৃষ্টি-সত্যের আধার বলিয়া জানেন, তাহাদের সৌন্দর্য্যই প্রেমের রসাবেশে তাঁহার প্রাণে সঙ্গীত-সুধা সিঞ্চন করে, মর্ত্ত্যেই অমৃত-বান্তি ধারণ করে—

উদার—উদার দৃশ্য
এই যে বিচিত্র বিশ্ব,
পরিপূর্ণ প্রেম-স্নেহ
কাহার বিনোদ গেহ।
কাহার করুণা রসে আর্দ্র দিন যামিনী,
কিনি এর অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ রূপিনী।

['সাধের আসন'—প্রথম সর্গ

একজনের কাব্য প্রেরণা—সৌন্দর্য্য ও প্রেম, আরেক জনের—সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত।

বালুকার 'পরে কালের বেলায়, ইত্যাদি। ঐ রূপগুলা সবই অনিত্য; তুলনীয়—

"যমুনার ঢেউ সন্ধ্যাবন্দীন
মেঘখানি ভালবাসে,
এও চলে যায়, সেও চ'লে যায়,
অদৃষ্ট বসে' হাসে।"

['মায়া'—মানসী

শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর, ইত্যাদি। এ যেন কবিতার কথাগুলিকে বাদ দিয়া শুধু তাহার ছন্দটিকে কানে ধরিয়া রাখা। জগতের সকলই নিমেষে ফুটিয়া নিমেষে ঝরিয়া যাইতেছে, সেই ফোটা-ঝরার বস্তুগুলাকেই বড় করিয়া দেখিলে মনের ভ্রান্তি ও প্রাণের অশান্তি ঘুচিবে না কারণ তাহারা কালস্রোতে বুদ্বুদ মাত্র। কিন্তু ঐ ফোটা-ঝরার মূলে যে একটি ছন্দ

আছে তাহার সঙ্গীত অনাদি ও অনন্ত, তাহাই নিত্য ও সত্য—তাহা 'বৃহৎ বিপুল ও গভীর'। সেই সঙ্গীতকে হৃদয়ে ধারণ করিলে 'ভবকূল হ'তে ছিঁড়িয়া শিকল' অনন্ত-অসীমের কূলে পৌঁছিতে পারা যায়—সকল দুঃখের, সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

ভাসিয়া চলিবে রবি শশী তারা····সংগীতস্রোতে। তুলনীয়—

জগতের মহা বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল-উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি ল'য়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে······
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
শূন্যে শূন্যে বিস্তারিল পাশ॥

[প্রভাত সঙ্গীত

এই ভাব-বীজ রবীন্দ্র-কবিমানসে পূর্ব্বাপর সমান জাগরূক আছে। সমস্ত বিশ্বচরাচর এক মহাসঙ্গীতে ভাসমান—সেই সঙ্গীতই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। সেই মহাসঙ্গীতের ঐকতানে সকল বিশেষ নির্ব্বিশেষ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও পৃথক সত্তা বা মূল্য নাই।

এইখানে রবীন্দ্র-কাব্যমন্ত্রটিকে আরেকবার উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবার অবকাশ মিলিয়াছে; এই কাব্যমন্ত্রটির সহিত অপর দুই-একজন কবির কাব্যমন্ত্র তুলনা করিলে, তত্ত্বের দিকটা আরও সুগোচর হইতে পারে, এজন্য আমি এই প্রসঙ্গে একটু বিশেষ বিচারণা করিব।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও ঐরূপ একটা 'এক'-এর আশ্বাস পাইয়াছিলেন—সেটা ধ্যান বা জ্ঞানলব্ধ। তিনি জগতের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে 'workings of one mind' দর্শন করিয়া এই বিশ্ব প্রকৃতিকে চৈতন্যময—অতএব, 'সৎ' বা 'সত্য' বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যথা—

Tumult and peace, the darkness and the light—
Were all like workings of one mind, the features
Of the same face, blossoms upon one tree,
Characters of the great Apocalypse,
The types and symbols of Eternity

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের মত, ওয়ার্ডসওয়ার্থেরও ঐ দিব্য-দর্শন হইয়াছিল এক পরমক্ষণে, সে যেন সহসা এক অপূর্ব্ব আলোকে সৃষ্টির সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়াছিল! রবীন্দ্রনাথেরও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। ['প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য]। তিনি লিখিয়াছেন—

"দেখিলাম, এক অপরূপ মহিমায় বিশ্ব-সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত।··· সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎ ভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্য্য নৃত্যের আভাস পাইতাম।"—["জীবন স্মৃতি," পৃঃ ১৪৭-৪৮]
—বেশ বুঝিতে পারা যায়, ঐ সৌন্দর্য্য-নৃত্যই এখানে সেই 'রাগিণী'—

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হতে।

অনিত্য বস্তুসকলের অন্তস্তলে ঐ অদৃশ্য ও নিত্য-উৎসারিত সৌন্দর্য্য-নৃত্যের সঙ্গীতই কবি-রবীন্দ্রের কাব্যসাধনার ইষ্টমন্ত্র; পরবর্ত্তী কবি-জীবনে এই মন্ত্র তাঁহার কয়েকখানি নাটকে আরও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে, 'রক্ত-করবী'তে খনির খোদাইকরদের মধ্যে 'বঞ্জন' আসিয়া—

"তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, আজ আমাদের খোদাই নৃত্য হবে। .....তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল, সোনার পিণ্ড নিয়ে কি লোফালুফি .... বঞ্জন বললে, কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।"

ইহাকে আর্ট, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-তন্ত্রের সাধন-মন্ত্র বলা যাইতে পারে। তাহাতে বস্তুগুলার কোন পৃথক বাস্তবতাই নাই, তাহারা সেই সৌন্দর্য্য-সঙ্গীতের বাঁশীতে অসংখ্য রন্ধ্রের মত। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিন্তু সেই বাস্তবের সকল রূপকেই—

Characters of the great Apocalypse,
The types and symbols of Eternity—

বলিয়াছেন, অর্থাৎ উহারাও সত্য, কারণ, উহারা অনন্তের রূপাত্মক পরিচয়—তাহারই অক্ষর-মালা। ইংরেজ কবির ঐ উপলব্ধি হইয়াছিল একরূপ উদ্দীপ্ত চৈতন্যের অবস্থায়, তিনি সৌন্দর্য্য-নৃত্য বা বিশ্ব-সঙ্গীতের ঐকতানে জগতের রূপগুলাকে মিলাইয়া যাইতে দেখেন নাই—জড় ও চিৎ এর মধ্যে একটি অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের বিহারীলালও আরেক মন্ত্রে ঐ দুইয়ের সমন্বয়-সাধন করিয়াছিলেন—তাহা চৈতন্যের উদ্দীপ্তি নয়, প্রেমের মিষ্টিক উপলব্ধি। ঐ 'বিশ্বপ্রকাশিনী' 'বিশ্বরূপিণী' 'কান্তি' এবং প্রাণের প্রেম—এই দুইয়ের অন্যোন্যসাপেক্ষতা বা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া, তিনি এই জগৎ ও তাহার রূপরাশিকে নিত্য ও শাশ্বত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন—Real ও Ideal-এ কোন পার্থক্য মানিতেন না। 'বিশ্ব' হইতে 'কান্তি'কে পৃথক্ করা যায় না, সেই 'কান্তি' ও 'বিশ্ব' এক,—সর্ব্বভূতে সেই 'কান্তি'র অধিষ্ঠান, অতএব সকলই সৎ-বস্তু। অতএব, ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঐ 'types and symbols of Eternity' বিহারীলালের চক্ষে 'types and symbols'ও নয়, কারণ, তাঁহার সেই 'কান্তি' "প্রত্যক্ষে বিরাজমান —তাহা আর কোথাও একটা আদি ও পৃথকরূপে বিদ্যমান নাই। সেই তত্ত্বকে জ্ঞানে নয়—প্রেমে অপরোক্ষ করিতে হয়। জর্ম্মান মহাকবি গ্যেটেও (Goethe) এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটা সর্ব্বময় একই সত্তার অধিষ্ঠান, তাঁহার Faust-কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন, সে দৃষ্টি অতিমাত্রায় দার্শনিক, তাহাতে একরূপ জ্ঞান যোগের ভাবুকতা কবি-কল্পনাকে অতিক্রম করিয়াছে।

কাব্যসাধনায় জগৎ-সত্যের এই ত্রিবিধ উপলব্ধি বা কবিগণের ঐ ত্রিবিধ অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচয় আমরা পাইয়াছি, কিন্তু, এ বিষয়ে আর দুইজন কবির সাক্ষ্য কিছু স্বতন্ত্র—শেলী ও রবীন্দ্রনাথ। এই দুই কবিই অত্যুচ্চ ভাববাদের (Idealism) ঋষি, অতএব এই দুই-এর কাব্যমন্ত্র তুলনা করিলে উভয়ের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইবে, তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্ম আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। শেলী শেষ পর্য্যন্ত-বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, পাশ্চাত্য কবি-ঋষি-সমাজে এমন খাঁটি বৈদান্তিক আর নাই। শেলী যে কবি না হইয়া ঋষি হন নাই, তার কারণ, তিনি এই মর্ত্ত্য-জীবনেই সেই বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—'to

raise the whole world to the level of the Vedanta'—অধীর হইয়াছিলেন ইহাই ছিল তাঁহার কবি-মানসের দিব্যোন্মাদ, অথচ এমন বাণীও তাঁহার কণ্ঠে নিঃসৃত হইয়াছে—

"The One remains, the many change and pass,
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly,
Life like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of Eternity"

[*Adonais*

—অর্থাৎ, সেই একই সত্য, বহুই মিথ্যা। ["ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"] এই জগৎ একটা বহুবর্ণের কাচ-আবরণ মাত্র; সেই কাচের বর্ণগুলা ব্রহ্মের শুভ্রজ্যোতিকে আবিল করিয়াছে, ঐ আবরণটাই অবিদ্যা। ইহার পর, রবীন্দ্রনাথের জগৎ-দর্শন। তিনিও জগতের ঐ বস্তু-রূপ-গুলাকে স্বীকার করেন না, কিন্তু দেশ-কালকে স্বীকার করেন। অর্থাৎ ঐ বস্তুর দৃশ্যমান রূপগুলা ক্ষণ-বুদ্বুদ বটে, কিন্তু কালের প্রবাহে ও দেশের বিস্তারে একটা শাশ্বত সত্তার লীলা আছে, এবং ঐ ক্ষণভঙ্গুরতারই একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে, সেই সৌন্দর্য্যের আবেদন সঙ্গীতের মত—একটি রাগিণীরূপেই তাহাকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়, ভাব ও রূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সীমা ও অসীমা, জন্ম ও মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোধান—সকলই সেই বিশ্বরাগিণীর ছন্দে, একটা rythm বা তানলয়যুক্ত আবর্ত্তনে—নির্দ্বন্দ্ব ও মনোহর হইয়া উঠে। সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত-সুষমাই—সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা, তাহাই ব্রহ্মাস্বাদ, উহাতে, যাহা কিছু ক্ষণিক, খণ্ড ও পৃথক, তাহা এক মহাসৌন্দর্য্য নৃত্যে লয় হইয়া যায়, সেই সঙ্গীত-রসেই—

বিপুল হর্ষে রব ভগবান
মলিন মর্ত্ত্যমাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা।

—এই বহমান সঙ্গীতই সৃষ্টিধারা, তাহারই ছন্দে—

সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর,
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর
মগন গগনতল।

ইহার অনেক পরে, কবি আরেক কবিতায় ঐ কাব্যমন্ত্রটিকেই ঋষি-মন্ত্রের মত যেন দর্শন করিয়াছেন—তাহাতে কবির দৃষ্টি যেমন স্বচ্ছ, তেমনই নিশ্চিন্ত, যথা—

চিরকাল একি লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল!

দুলিছ গো, দোলা দিতেছ
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।

*　　*　　*　　*　　*

কোথা বসে' আছ একেলা
সব রবিশশী কুড়াযে লইযা
তালে তালে কর খেলা।...
দেওয়া-নেওযা তব সকলি সমান
সে কথাটি কেবা জানে।
ডান হাত হ'তে বাম হাতে লও
বাম হাত হ'তে ডানে।

[উৎসর্গ—৪১

—ইহাই 'লীলা'; এই লীলা কবি যে-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সে-দৃষ্টিতে এই রূপ-জগৎ মিথ্যা-মায়া হইয়াও এক অপরূপ রসের আধার। ঐ দৃষ্টিকোণ এক ভাবতীয় ভাব-সাধনার অনুরূপ হইলেও, এমন কি প্রায় তাহাই বলিয়া মনে হইলেও—উহাতে সেই রবীন্দ্রীয় 'জগৎ-ব্রহ্মবাদেব'ই একটা নূতনতর ব্যাখ্যা আছে। ইহা জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়, আবার, স্বীকার কবাও নয়—কেবল শূন্যকে বাদ দিয়া একটি সূক্ষ্ম-রূপে তাহার ধ্যান করা। জগৎই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জে নয়—জীবনেব স্থূল বাস্তবতায় নয়—তাহা দেশ-কালের অনাদ্যন্ত ধাবায় সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের পরমানন্দরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ রসদৃষ্টি বা আর্ট-তন্ত্রই বলা সঙ্গত। এই কারণে রবীন্দ্র-কাব্যে আমরা যত রূপসৃষ্টি দেখিতে পাই—জীবন ও জগতেব যতকিছু বস্তু, দৃশ্য, ঘটনা ও নরনারী-চরিত্রের উপরে যে আলোকপাত হইতে দেখি, তাহাতে সর্ব্বত্র, বাস্তবকে গলাইয়া, অথবা তাহার অন্তরে একটি ভাবরূপ আবিষ্কার করিয়া, ঐ সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের অতিসূক্ষ্ম রস-সৃষ্টি হইয়াছে। এইবার পাশ্চাত্য কবিগণেব সহিত তুলনা কবিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে, ববীন্দ্রনাথের ঐ জগৎ-ব্রহ্মবাদে—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবাদই কিরূপ রসবাদ বা আর্টবাদে পরিণত হইয়াছে; আবার, ভারতীয় ব্রহ্মবাদই গেটে ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে কিরূপ 'প্রকৃতিবাদে' এবং শেলীতে কিরূপ অদ্বৈত-বাদের অস্ফুট অথচ তীব্র চেতনার উদ্বোধক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঐ মন্ত্র আর সকল হইতে স্বতন্ত্র, শেলীর প্রভাব তাঁহার কবি-জীবনের প্রথমভাগে অল্প-বিস্তর পড়িয়াছিল; কল্পনা শেলীর অনুযায়ী হইয়াও শেষে শেলীর সেই রূপ-বিরাগী ভাব-সর্ব্বস্ব প্রেম-ব্রহ্মেব ঘোলাটে অদ্বৈতবাদ তাঁহার রসপিপাসু কবিচিত্তকে বিমুখ করিয়াছিল। প্রেম নয়—সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদের জন্যই রূপকে তাঁহার চাই, তাহা মৃত্যুময়, মায়াময়, ক্ষণভঙ্গুর হোক, তবু তাহার একটি সঙ্গীত আছে, সে সঙ্গীত বড করুণ বলিয়াই মধুর; তাহাই শাশ্বত; দেশে ও কালে যে-সৃষ্টিধারা নিরবচ্ছিন্ন তাহাই ঐ উদয় বিলয়, ভাঙা-গড়া, জীবন-মৃত্যুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে একটি মহা-সঙ্গীতের ঐকতান রক্ষা করিতেছে। 'পুরস্কার' কবিতাটিতে এই কাব্যমন্ত্রই একটি পূর্ণ বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি, ইত্যাদি। এইখান হইতে কবি তাঁহার সেই কাব্যমন্ত্রের প্রমাণ বা সাক্ষ্যস্বরূপ ভারতের দুই মহাকাব্যের কাহিনী নূতন মর্ম্মে ও নূতন সুরে গান করিয়াছেন; তিনি যে তাহাদের কবি-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও একদিকে যেমন সর্ব্বকীর্ত্তি, সর্ব্ব প্রয়াসের নশ্বরতা হাহাকারে করুণ হইয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে তেমনই, একটি অপূর্ব্ব গীতিরসের সান্ত্বনাও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের ঐরূপ ব্যাখ্যা মৌলিক কবিদৃষ্টির নিদর্শন বটে, কিন্তু তাহাতে কবির আত্ম-ভাবের আরোপ আছে; কারণ, ঐ দুই কাব্যের অভিপ্রায় যে অন্যরূপ, তাহা আমরা জানি। উহাতে মানব-জীবন ও মানব-চরিত্রের মহিমা-কীর্ত্তন আছে; এই জীবন যে একটা কত বড় কর্ম্মক্ষেত্র ও যজ্ঞশালা তাহাই উহাতে বর্ণিত হইয়াছে। একদিকে ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, এবং অপরদিকে মানবহৃদয়-সিন্ধুর তরঙ্গ-রাজি—এই দুইয়ের যে বিরোধ, তাহারই সমন্বয়-পন্থা, ঐ দুই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে; রাগ ও বৈরাগ্য, অর্থ ও পরমার্থ, ভোগ ও ত্যাগ—এক কথায়, নিত্য ও অনিত্যের সকল দ্বন্দ্ব নিরসন করিয়া—একটিতে রাম এবং অপরটিতে কৃষ্ণ—দুই নর-চরিত্রকে ভগবৎ-মহিমায় মহিমান্বিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একালের কবি ঐ দুই কাব্যের কাহিনীগত ঘটনা ও চরিত্রকে গৌণ করিয়া, সকল বীরত্ব বা মহত্ত্বকে ব্যর্থ বা নিরর্থক বলিয়া, সেই দুই কাহিনীর যে কাব্য-সঙ্গীত তাহাকেই বড করিয়া দেখিয়াছেন। সে সঙ্গীত তিনিই শুনিয়াছেন, ঐ মহাকাব্যও তাঁহাকে একটি লিরিক-গীতিসুরে আবিষ্ট করিয়াছে; যে কাব্য একটি মহাভারত গড়িয়া তুলিযাছে, তাহাও—

বালুকার পরে কালের বেলায
ছায়া-আলোকের খেলা।

কিন্তু তাহাতে এ কবিতার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয নাই, ইহার ঐ গীতি-রস স্বতন্ত্র, উহার আবেদন যেমন মৌলিক, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী; কবিতাটি রবীন্দ্র-গীতিকাব্যের একটি জয়স্তম্ভ বলিলেও হয়।

সে-সকল দিন সেও চলে যায়, ইত্যাদি। এক অর্থে খুবই সত্য; কিন্তু আরেক অর্থে, ঐ সকল দিন কখনো চলিয়া যায় না; মানব-সংসারে, মানুষের হৃদযে উহার নিত্য-আবর্ত্তন হইতেছে। এই জন্যই রামায়ণ-মহাভারতের মত কাব্য সর্ব্বকালের—সর্ব্বমানবের ইতিহাস; সে অর্থে ঐ অনিত্যও নিত্য। 'দ্বিধা ধরাভূমি' বার বার দ্বিধা হয়, এবং বার বার জোড়া লাগে; কুরুক্ষেত্রও বার বার ঘটে। অন্যত্র কবি ঐ 'যাওয়া'র কথাও স্বীকার করেন নাই, সকলই ঠিক তেমনই আছে; শুধুই তাহাদের গান নয়, সেই জীবন, সেই সুখ-দুঃখ কিছুই হারায় নাই, যথা—

আছে তো যেমন যা' ছিল
হারাযনি কিছু, ফুরায়নি কিছু,
যে মরিল যেবা বাঁচিল।
বহি সব সুখ-দুখ
এ ভুবন হাসি-মুখ,
তোমারি খেলায় আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।

আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালবাসা।
এই মত চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা॥

[উৎসর্গ—৯১

আজিও সে গীত····· বাজে মানবের কানে। তাহার কারণ, ঐ কাহিনীও তাহাদের জীবনে নিত্য-সত্য হইয়া আছে।

সমরবন্যা যবে অবসান, ইত্যাদি। এইখান হইতে 'শূন্য শ্মশানমাঝে' পর্য্যন্ত যে কয়টি স্তবক, তাহাতে মহাভারতের ট্রাজেডি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন করিয়া, পূর্ব্বে বা পরে, কোন ভারতীয় কবি বা ব্যাখ্যাকার নির্দেশ করেন নাই। তার কারণ, পাশ্চাত্য ট্রাজেডির রস এই কাব্য-রস হইতে স্বতন্ত্র; উহাতে শেষে একটা বৈরাগ্যের ছায়া আছে বটে, কিন্তু তাহার রস—শান্ত-রস; তাহা দ্বারা ঐ বীরকীর্ত্তি ও মনুষ্য-জীবনের নিষ্ফলতা সূচিত হয় না; কেবল ইহাই অনুভূত হয় যে, জীবনে সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম্মরূপে করিতে হইবে; "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" ভোগ ও ত্যাগ দুইকে সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে; জীবনের ভিতর দিয়াই জীবনের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। মহাভারতকার ইহাই পৃথকভাবে "গীতা"য় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তথাপি, সেই শান্তরসই মহাভারতের রস-পরিণাম হইলেও, উহার ঐ ট্রাজেডি-রসও একটা বড় রস; কবি রবীন্দ্র সেই পুরাতন রসকেই একটা নূতন রূপ দিয়াছেন।

যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি, ইত্যাদি। কথাগুলি ঐ রূপকথার কবি বলিতেছে না, আমাদের কবিই বলিতেছেন। ভাবটা এই যে, সেই ভারত আজ এমন একজাতি অধিকার করিয়াছে, যাহাদের অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করে নাই।

সফল আশার বিষাদ মহান্, ইত্যাদি। সেই জয়লাভই পরাজয় অপেক্ষা নিরানন্দকর হইল, সাধারণ মানবীয় অনুভূতিতে তাহাই হইবার কথা। কিন্তু মহাভারতকার নিশ্চয় ঐ ভাবটিকেই প্রধান করিতে চান নাই; কারণ, সেই 'গীতা'র মতে, প্রকৃত বীর বা কর্ম্মযোগীর পক্ষে জয়-পরাজয়ে কোন প্রভেদ নাই। [পূর্ব্বে দেখ।] "সফল আশার বিষাদ মহান"– এই বাক্যটি যেমন নূতন, তেমনই, মানব-হৃদয়-ঘটিত একটি সত্যকে ভাষায় ধরিয়া দিয়াছে—"What oft was thought but ne'er so well-expressed"। এইরূপ বাক্য-রচনাই কবিদের একটা বড় দান।

হায়, এ ধরায় কত অনন্ত, ইত্যাদি। এইখান হইতে গানের যে আরেক পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই এই কবিতার অন্তরতর সুর; এবং ইহাতেই রবীন্দ্র-কাব্যে যে মর্ত্ত্য-প্রেম ও মানবিকতার একটি নিগূঢ় প্রেরণা আছে, তাহা প্রাণপূর্ণ আবেগে উৎসারিত হইয়াছে— কবি-প্রাণের আন্তরিকতা ও কামনার ঐকান্তিকতা যেন অশ্রুময় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী বটে, তাহার সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার কোন বৃহৎ মূল্য নাই—তথাপি, তাহার

একটা সুব আছে ; সেই সুর যুগ হইতে যুগান্তরে প্রবাহিত হইয়া, এই 'শ্যামলা বিপুলা ধরণী কে একটি করুণ মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। সেই 'বহুমানবেব প্রেম' ও 'বহুদিবসের সুখ-দুঃখ' লক্ষযুগেব সঙ্গীতে এই ধবাতলকে, অর্থাৎ মর্ত্ত্যজীবনকে সুন্দর ও মধুর করিয়াছে। ঐ সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যই জীবনকে ও মানুষেব প্রেমকে বাস্তবেব নশ্বরতা ও মলিনতামুক্ত করিয়া কবিব চোখে মহার্ঘ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার পব, কবি কবি-ধর্ম্ম ও কবি-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা কাব্যকলা ও রসসৃষ্টিব দিক দিয়া শাস্ত্র বাক্যেব মত।

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ, ইত্যাদি। ঐরূপ কাব্যসাধনা আত্ম-সাধনাব মত। সকল কবিকেই সংসাব হইতে কতকটা দূবে থাকিতে হয়—বহির্জ্জীবনে না হোক—অন্তর্জ্জীবনে। কিন্তু এ কবি শুধুই কাব্য-বচয়িতা কবি নয়—সাধক-কবি। বিহাবীলালও গাহিয়াছিলেন—

তোমাবে হৃদযে বাখি,
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমবাবতী দুহ ভাল লাগে।
ভক্তিভাবে এক তানে
মজেছি তোমাব ধ্যানে,
কমলাব ধনমানে নহি অভিলাষী।
থাক হৃদে জেগে থাক
রূপে মন ভরে বাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর কোলাহলে।

[সারদামঙ্গল

অন্তর হতে আহরি বচন, ইত্যাদি। সমগ্র রবীন্দ্র কাব্য তাহাই। কবি-মাত্রেই সংসাব ধূলিজালে গীতবসধাবা সিঞ্চন কবিয়া থাকেন, ববীন্দ্র-কাব্যের সম্পর্কে ঐ 'ধূলিজাল' ও 'গীতরস' শব্দ দুটি আরও সার্থক হইয়াছে ; 'অন্তব হ'তে আহবি' বচন' ইহাও তেমনই সত্য।

অতিদুর্গম সৃষ্টিশিখরে, ইত্যাদি। এইখান হইতে, 'আবেকটু স্নেহ শিশুমুখ পবে' পর্য্যন্ত যে কবি-কর্ম্মের বর্ণনা আছে—লিবিক কাব্যের সেই গৌবব এমন ভাষায় আব কোন কবি আমাদের প্রাণ-মনেব গোচব কবিতে পাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে, ইত্যাদি। এই আট পংক্তিতে কবিদের সম্বন্ধে একটি বড সত্য কথা আছে। মানুষ এমন সকল হৃদয়াবেগ বা মানস-উৎকণ্ঠা অনুভব করে যাহা প্রকাশ কবিবাব ভাষা তাহাব নাই, এমন কি, নিজের কাছেও তাহা দুর্ব্বোধ্য, কবিরাই তাঁহাদেব বাণী-প্রতিভাব বলে সেই অনির্ব্বচনীয়কে বচনীয় কবেন; তাঁহাদেব বচিত গানে মানুষ আপন হৃদয়ের ভাষা খুঁজিয়া পায়, যাহাব অস্পষ্ট অনুভূতি আকুল কবিয়াছিল তাহাব পূর্ণ অভিব্যক্তি পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। সেই সব গানের ভাষা সাধাবণের ভাষাকে পুষ্ট কবে। এমনই করিয়া কবিগণ মানুষের হৃদয়ও যেমন আলোকিত করেন, তেমনই, তাহার কণ্ঠে বাণীব অভাব দূর করেন। বস্তুতঃ কবিগণের নিকটে মানুষের ইহাই সর্ব্বাধিক ঋণ।

থাকো হৃদাসনে, জননী ভারতী, ইত্যাদি। এই ধরণের উক্তি বিহারীলালের

কাব্যে বারবার শুনিতে পাওয়া যায়; রবীন্দ্রনাথ যে এ কবিতায় ঐ কবি-চরিত্র অঙ্কিত করিবার কালে বিশেষ করিয়া বিহারীলালকে স্মরণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলনীয়—

দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার,—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার।

[সারদামঙ্গল

তুচ্ছ করি স্বর্গসুখ,
উথলি উঠিছে বুক। . ...
চমকি চৌদিকে চাই,
তোমা বই কিছু নাই।......
কি পবিত্র, কি মহান, কি উদার রূপরাশি।
অহো। কি ত্রিতাপহারী জীবন জুড়ানো হাসি।

[সাধের আসন

কত সুখ ছিল · উন্মুখ ভালবাসা। পংক্তিগুলি প্রসিদ্ধ কবি-বচন হইবার যোগ্য। ইহা সকল আদর্শনিষ্ঠ স্বাধীনচেতা পুরুষের পক্ষে সত্য। তেমন মানুষ আত্মীয়-বন্ধুর প্রীতিভাজন হয় না, এজন্য যেখানে সুখের আশা করিত সেখানে দুঃখই পাইয়া থাকে। যাহারা কোনদিকে উচ্চতর কিছুর সাধনা করে তাহারা প্রায়ই জীবনে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করে।

ওই ফুলমালাখানি। কবির প্রাণ তখন এমনই ভরিয়া উঠিয়াছে যে, তিনি যেন আর এ জগতে নাই। আরও কারণ এই যে, ঐ মালা বাহিরেও রাজার প্রাণের সহিত কবির প্রাণের মিলনকে যেন বাস্তব করিয়া তুলিল। তখন দুইজনেই হইলেন সমানধর্ম্মা—রাজাও সেই-ক্ষণে লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে সরস্বতীর সেবাইৎ হইলেন। অতএব, কবি যে লক্ষ্মীর—অর্থাৎ ধনসম্পদের কথা ভুলিয়া যাইবেন, ইহাই স্বাভাবিক।

মালা বাঁধি কেশে, ইত্যাদি। এইখানে আবার গল্পের বাকি অংশ আরম্ভ হইয়াছে, আমরাও কাব্যলোক হইতে নামিয়া বাস্তব সংসারে প্রবেশ করিতেছি।

কবির রমণী · · দিতেছে চঞ্চুপুটে—কবি যতই দরিদ্র হউন, তাঁহার গৃহিণীটির নায়িকাসুলভ সাজসজ্জা ও বিলাস-উপকরণের অভাব নাই, রূপকথার সহিত সংস্কৃত কাব্য-নাটকের আবহাওয়া যুক্ত হইয়াছে। তুলনীয়—

কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বাহ'।

['সেকাল'—ক্ষণিকা

মিছে ছল করি মুখে করে রাগ, ইত্যাদি। দাম্পত্য-প্রণয়ের চিত্রহিসাবেও যেমন, তেমনই, এখানে ঐ নারী কবির 'সহধর্ম্মিণী'ও বটে। কবিপ্রিয়া যতই লক্ষ্মীর উপাসিকা হউন, ঐ মালাখানির মূল্য বুঝিবার মত বুদ্ধি এবং কবিহৃদয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার মত

সমপ্রাণতা দুই-ই তাঁহার আছে। তবু সংসার-ধর্ম্মের দিক দিয়া এমন মানুষকে একটু শাসন করাও যে আবশ্যক!

কবি ভাবে, ইত্যাদি। এই স্তবকগুলিতে, একদিকে পুরুষের ঐ বালকোচিত সারল্য ও অসহায় ভাব, এবং অপরদিকে, প্রণয়িনী-নারীর ঐ কপট গাম্ভীর্য্যে তাহা উপভোগ করা—দাম্পত্য-লীলার একটি অপূর্ব্ব চিত্র বটে। বাঙালী-কবি ভিন্ন আর কোন কবি এমন রসসৃষ্টি করিতে পারিতেন না, ইহাও নিশ্চিত।

বাঁধা প'ল এক মাল্যবাঁধনে, ইত্যাদি। লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর বিরোধ আর রহিল না। রাজকণ্ঠের সেই মালা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মীকে (রাজসম্পদকে) সরস্বতীর (কবিপ্রতিভার) বশীভূত করিয়াছিল। ঐ মালা তাহারই প্রতীক; কবির গৃহে যিনি আছেন, তিনিও 'সরস্বতী', নহিলে তিনি কবি-প্রিয়া হইতেন না; সেই সরস্বতীর মনে যেটুকু খেদ ছিল তাহা এইরূপে দূর হইল।

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে, ভাবের, ঘটনা ও বর্ণনার এবং অবস্থার এত বৈচিত্র্য আছে যে, উহার ঐ দৈর্ঘ্যও স্বল্পপ্রসার বলিয়া মনে হয়; আরও কারণ,—সমগ্র কবিতাটি একটি অখণ্ড ভাবপ্রেরণায় (Unity of Inspiration) সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—কবি-জীবন, কবি-চরিত্র, কাব্যমন্ত্র ও কাব্যকলা প্রভৃতি সকলই একই কল্পনার বশীভূত হইয়া একটি স্বতন্ত্র ও সুসম্পূর্ণ ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য এ কবিতাটিকে 'সোনার তরী'র মধ্যমণি বলা যাইতে পারে।

বসুন্ধরা

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটির সহিত পূর্ব্বের দুইটি কবিতা—'অহল্যার প্রতি' ও 'সমুদ্রের প্রতি'—একত্রে পঠনীয়। ইহাতেও কবিমানসের সেই এক ভাব-বীজ যেন আরও পূর্ণভাবে ও সবিস্তারে বিকশিত হইয়াছে। এখানেও কবি সৃষ্টির পার্থিবতাকেই—যাহাকে জড় প্রকৃতি বলা হয়, তাহাকেই—সর্ব্বজীবনেরও যেমন, তেমনই মানবীয় চৈতন্যেরও মূলাধার বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এইরূপ ভাবনার মূলে আধুনিক জড-বিজ্ঞানের প্ররোচনা নিশ্চয়ই আছে—ডারউইনের (Darwin) উৎক্রান্তিবাদ (Theory of Evolution) আছে। কিন্তু কবি যেন সাংখ্য-দর্শনের সেই প্রকৃতিতত্ত্ব—সেই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ প্রকৃতি হইতে পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না। যাহা কিছু মানুষের দেহঘটিত, যেমন—সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ সংস্কার, রাগদ্বেষ প্রভৃতি অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি, এবং তাহার সহিত মন যুক্ত হওয়ায় যে অহংবুদ্ধি ও নানাবিধ স্বভাব বা চরিত্রের বিকাশ হয়—সকলই সাক্ষাৎ প্রকৃতি-প্রসূত, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরই কথা; সাংখ্যদর্শন আরও সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। কবি সেই প্রকৃতির সাক্ষাৎ প্রতীক বা প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীকেই বারবার বরণ করিয়াছেন; তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমও এখানে ঐ জননীরূপিণী বসুন্ধরার স্নেহরস-পিপাসায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। ঐ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই যে তাঁহার কবিজীবনের আদি ধাত্রী, তাহা আমরা দেখিয়াছি; শুধু

তাহাই নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের সূক্ষ্মতম ভাব-কল্পনা ও ধ্যান-বসাবেশের ভাবয়িত্রী হইয়াছে—ঐ প্রকৃতি। ইহা জড়কে চিন্ময়রূপে দেখা নয়—চিৎকেই জড়ের রূপে দেখা; ঐ দুই-এর পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম বলিয়া সহজে ধরা পড়ে না; রবীন্দ্রনাথের 'ভূমা' যে উপনিষদের 'ভূমা' নয়—তাহা যে সাংখ্যের 'প্রকৃতি', ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয়। এই কবিতায় কবি পশু ও মানুষের জৈব-সংস্কার ও বিভিন্ন স্বভাবকে—এমন কি মানস-ধর্ম্মকেও—ভূগোল-বিজ্ঞানের নিয়মাধীনরূপে দেখিয়াছেন; ভূপৃষ্ঠের বিবিধ আকারগুলিতে (Physical features) মানব-মানসের ভাবরাজির—মানব-চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলীর—সাক্ষাৎ প্রাকৃতিক প্রতিরূপ দেখিয়াছেন; সে যেন সাংখ্যদর্শনের সেই 'প্রকৃতিজান গুণান্'—সর্ব্বত্র জড়ে-চৈতন্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। উহাই সর্ব্বপ্রকার মানবীয় সংস্কারেব হেতু—সকলই ঐ প্রকৃতিব ধর্ম্ম, পুরুষের আত্মা বলিয়া কোন পৃথক সত্তা নাই। এই বিশুদ্ধ জডবাদ বা প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব অদ্বৈতবাদ এই কবিতাগুলিতে উঁকি দিয়াছে। আমি বলিয়াছি উহাই কবি-রবীন্দ্রেব অতি-গভীব প্রকৃতি-প্রেম, তাঁহার কাব্যসৌন্দর্য্যের মূল-উৎস। এই প্রকৃতিকেই সম্বোধন করিয়া কবি পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

আধ-ঢাকা আধ-খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়,
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারিনে তব
কত ভাব নব নব
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ
পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে
নাহি দিস ধরা।
দেখা যায় মৃদুমধু কৌতুকের হাসি,
অরুণ-অধরা।
যদি চাই দূরে যেতে
কত ফাঁদ থাক পেতে,
কত ছল কত বল
চপলা মুখরা।

* * *

যত অন্ত নাহি পায় তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি,
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস্
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালবাসি।

['প্রকৃতির প্রতি'—মানসী

[ঐ কবিতাটি 'বসুন্ধরা'র প্রথম খসড়া বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি প্রেমহীনা, সেই প্রেমহীনাই প্রাণে যে প্রেমের মোহ জাগায়—কবি এখানে তাহার কথা বলিতেছেন। ঐ জড়ের রূপ আছে—প্রেম নাই; উহাকে ভালবাসা—খাঁটি সৌন্দর্য্যপিপাসাই বটে।]

কিন্তু ইহাতে রবীন্দ্রীয় জীবন-দর্শন বা জগৎ-দর্শনের সেই বিশিষ্ট মন্ত্রটিও উঁকি দিতেছে—যাহাকে আমি এক নূতন 'জগৎ-ব্রহ্মবাদ' নাম দিয়াছি।

বর্ত্তমান কবিতাটিতে কবির ঐ কবি-ধর্ম্মের তথা কবি-হৃদয়ের যে ভাব-গভীর, আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তি আছে, তেমনটি আর কোন কবিতায় নাই; পরে তাহা ভিন্নতর রস-রূপে এবং আত্মভাবের দৃঢ়তর সাধনায়, কতক পরিমাণে উহ্য হইয়াছে; কবি-জীবনের শেষভাগে, তাঁহার পরিণত মানসের আত্মসাক্ষাৎকার নানা ছন্দে ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কবি-প্রাণের এমন সরল অকপট আত্মপ্রকাশ নাই—অনুভূতির এমন আবেগ-গভীরতা নাই। যে-প্রেমে কবি ঐ প্রকৃতিরূপিণী বসুন্ধরার সহিত একাত্মতা কামনা করিতেছেন, তাহা মুখ্যতঃ মানব-প্রেম নয়—অন্ততঃ যে-অর্থে আমরা তাহা বুঝি; তার কারণ, কবি নিজেও একটা পৃথক ব্যক্তি-মানবের সত্তারূপে- প্রকৃতি হইতে পৃথক একটা 'পুরুষ'-রূপে অবস্থান করিতে চান না। প্রকৃতির ঐ রূপস্রোতের অন্ত নাই, তিনি তাহাতেই নিজ সত্তা মিলাইয়া সেই নিত্য ও শাশ্বত জীবনে জীবিত থাকিয়া অমরত্ব লাভ করিবেন; 'মানসী'তে "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে" এই যে কামনার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখিয়াছি, তাহাও ঐরূপ অমরতার কামনা। কবি 'মানস সুন্দরী'তে এই 'বসুন্ধরা'রই সর্ব্বব্যাপ্ত নিত্যজীবী সৌন্দর্য্যের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কবি-জীবনের প্রায় শেষ-পর্ব্বে, 'বলাকা'-কাব্যেও আরেকবার আরেক ভাষায়, যে ধর্ম্মমন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন, এই সকল কবিতায় তাহার স্পষ্ট পূর্ব্বাভাষ আছে।

এই কবিতার কবিত্বও—কি ভাষায়, কি চিত্ররচনায়, কি অনুভূতির গাঢ়তায়—রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় কবিশক্তির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। নিছক বর্ণনার দিক দিয়া কল্পনায় ভূপর্য্যটন এবং প্রাকৃতিক জীবন-পরিদর্শন অতুলনীয়। কেবল একটি যে দোষ তাঁহার সকল দীর্ঘ কবিতায় ঘটিয়া থাকে, এখানেও তাহা ঘটিয়াছে—ভাবের সঙ্গীতাবেগে এবং অনুভূতির অবশ আবেগে, ভাষার অতিবিস্তার হইয়াছে, ভাব-সংহতির পরিবর্ত্তে, পুনঃপুনঃ একই ভাবের নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে।

কবিতা-পাঠ

আমারে ফিরায়ে লহো,......বসন্তের আনন্দের মতো। পূর্ব্বের সেই 'অহল্যা' কবিতায় অহল্যার অবস্থা কবি ঠিক এমনই কল্পনা করিয়াছিলেন; অহল্যাও ধরিত্রীর 'কোলের সন্তান' হইয়া কোলের ভিতরে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিল; সেখানেও এক নিগূঢ় ও সর্ব্বতঃ-সঞ্চারী জীবন-ধারার উৎসে স্নান করিবার কথা আছে, যথা—

> মাতৃঅঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শসুখ—
> কিছু কি পেয়েছ তার আপনার মাঝে ?

এখানে কবি সেই জীবনের যতকিছু সৌন্দর্য্য, বা ইন্দ্রিয়সমুখ অমৃতরসের উৎসরূপিণী বসুন্ধরাকে

সম্বোধন করিতেছেন। যেহেতু সেই আনন্দ বহুবিচিত্র জীবনে সহস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে, এবং তাহা আস্বাদন করিতে হইলে এক দেহে এক জীবনে সম্ভব নয়, অতএব, সেই মূল আনন্দ-ধাতু যে মৃন্ময়ী ধরণী, তাহাতে নিজের পৃথক প্রাণী-জীবন মিলাইয়া দিয়া কবি একদিকে যেমন সর্ব্বানুভূতির এক অপূর্ব্ব চেতনা আস্বাদন করিবেন, অপর দিকে তেমনই, সেই এক আনন্দকে সর্ব্বরূপে সর্ব্বঘটে বিচিত্র রস-রূপে পান করিতে অধীর হইয়াছেন।

তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই। ঠিক এই অনুভূতির কথা কবি ইহার পরে আরেক কবিতায় লিখিয়াছেন, যথা—

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়......
......সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে,
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে।"

['প্রাণ'—নৈবেদ্য

অতএব দেখা যাইতেছে, ইহাও রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি স্থায়ী ভাব-বীজ, ইহার সহিত রবীন্দ্র-কাব্যমন্ত্রের সম্পর্ক কি, তাহা মনে রাখিলে, ঐ ভাববস্তুর প্রেরণা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাও সেই 'জগৎ-ব্রহ্মবাদে'র অন্তর্ভূত একটি বিশেষ কবি-ভাব।

প্রবাহিয়া চলে যাই ...প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে। তুলনীয়—

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।" ইত্যাদি

['নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম, তাহা সকল প্রেমের মূলে; ঐ সৌন্দর্য্য-প্রীতি ও তাহার গীতোল্লাস মুখ্যত মানবজীবন বা মানবসমাজ-ঘটিত নয়, উহা ঐ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরই অতিগভীর আকর্ষণ। তাহা নিছক সৌন্দর্য্য, প্রকৃতিই তাহার আধার বা আকর, এবং তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা—সঙ্গীত। ঐ প্রকৃতি যে প্রেমহীনা মোহিনী, তাহা কবি একস্থানে স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিঠুরা প্রকৃতি!
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান
কোথায় পিরীতি!

* * *

তবু তোরে ভালবাসি পারিনে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী!
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী!

['প্রকৃতির প্রতি'—মানসী

ঐ 'রাগিণী'র কথাও অতিশয় সত্য। নিজের কাব্য-প্রেরণা সম্বন্ধে এমন সত্য কথা কবি আর কোথাও বলেন নাই; পরে 'আত্মভাবে'র বহুবিধ সাধনার কথা আছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের এমন অকপট আত্মনিবেদন এইকালের কাব্যে যেমন আছে, তেমন আর কোথাও নাই। এখানে ঐ "হিল্লোলিয়া মর্ম্মরিয়া··শিহরিয়া সচকিয়া"র মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যানুভূতি কেমন স্পন্দিত হইতেছে।

শৈবালে শাদ্বলে তৃণে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে দেখ।

যে ইচ্ছা গোপনে মনে, ইত্যাদি। ইহাই এ কবিতার ভূমিকা। কবির কামনা—এই ভূমণ্ডলকে মনে মনে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যপিপাসা তৃপ্ত করিবেন—ভূপর্য্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তই তাঁহার কল্পনার সহায় হইবে।

সুদুর্গম দূরদেশ, ইত্যাদি। এইখান হইতে ভূগোল-বর্ণিত বিভিন্ন ভূভাগের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্ব্বে ভূপৃষ্ঠের যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা একাধারে বাস্তব ও কল্পনার এক অপূর্ব্ব সম্মিলন! প্রথমে মরুভূমির বর্ণনা; উহার প্রত্যেকটি বিশেষণ ও উপমা যেন সাক্ষাৎ অনুভূতিময়।

চারি দিকে শৈলমালা, ইত্যাদি। যেমন কাশ্মীরের হ্রদ, বা য়ুরোপের 'Alpine Lakes'।

খণ্ড মেঘগণ মাতৃস্তনপানরত, ইত্যাদি। তুলনীয়—

শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
নীলাম্বরে শুয়ে।

['যেতে নাহি দিব'

মিলটনের একটি মেঘ-চিত্র এইরূপ—

Mountains on whose barren breast
The labouring clouds do often rest

[*L' Allegro*

নিশ্চল নিষেধ····ধূর্জ্জটির তপোবনদ্বারে। স্মরণীয়—

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ।

[কুমারসম্ভব, তৃতীয় সর্গ

[তপোবন-দ্বারে নন্দী একটি হেম-বেত্রের উপরে বামপ্রকোষ্ঠ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান; সে তাহার দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি মুখে স্থাপন করিয়া ইঙ্গিতে সকলকে চপলতা করিতে নিষেধ করিতেছিল।]

মহামেরুদেশে……অনন্তকুমারীব্রত। 'কুমারীব্রত'—কারণ, বন্ধ্যা হইয়া আছে, কোন জীব-জন্তু সেখানে নাই। মরুভূমির সহিত তুলনায় উহার ঐ শুভ্রবসন পিপাসাহীন পবিত্রতার দ্যোতক। তুলনীয়—

কোথাও বা বসে আছ চির-একাকিনী
চির-মৌন-ব্রতা।
চারিদিকে সুকঠিন তৃণতরুহীন
মরু-নির্জ্জনতা।

['প্রকৃতির প্রতি'—মানসী

অথবা—

'যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির-কুমারী—
আলোক-পরশ
একটি রোমাঞ্চ-রেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ।

['প্রতীক্ষা'—সোনার তরী

শেষেরটিতে ঐ কুমারীব্রত আরও গম্ভীর ও রোমাঞ্চকর হইয়াছে।

শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো। মহামেরুদেশের এই বর্ণনা—ভাষায়, ভাবে ও অনুভূতি-কল্পনায় কবিশক্তির চূড়ান্ত হইয়াছে। এমন চিত্র রবীন্দ্র-কাব্যে অল্পই আছে—এ কল্পনা উৎকৃষ্ট মহাকাব্যের উপযোগী।

সমুদ্রের তটে………পর্ব্বতসংকটে একখানি গ্রাম। ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত বটে। উত্তর যুরোপের আটলান্টিক সাগর ও উপসাগরের তীরে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে South Sea দ্বীপপুঞ্জে এইরূপ গ্রাম, কাব্যে—বিশেষ কবিয়া উপন্যাসে—কবিদের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ইচ্ছা করে, আপনার করি, ইত্যাদি। এ কবিতার মূল ভাবাবেগ তাহাই। কবি একেবারে সেই সকল হইতে চান, জড়-প্রকৃতির সেই মাধুরী পান করিতে নয়—তাহার আধার হইতে চান, সেই সৌন্দর্য্যের কারণ ও কার্য্য দুই-ই হইতে চান। উহাই সেই চেতনা বা 'প্রাণ', যাহা সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের অন্তহীন ধারায় চিরপ্রবাহিত, সেই "ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত" ('প্রাণ'—কড়ি ও কোমল)।

কঠিন পাষাণক্রোড়ে, ইত্যাদি। এইখান হইতে ভূদৃশ্যের পর জীব-জগতের মানব ও পশু—সর্ব্ববিধ জীবনের—বিচিত্র রস-আস্বাদন বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশই মানবজাতির চরিত্র কেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়াছে ('কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ)। কত সংক্ষেপে, কেমন অব্যর্থ ও সার্থক বিশেষণের সাহায্যে, প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইয়াছে! কেবল ভারতীয় জাতির উল্লেখ নাই। কবি সেই সকল জাতির মধ্যেই এক-এক বার জন্ম লইয়া, একই মানবজাতির বিভিন্ন জীবন ও তাহার বিচিত্র রস আস্বাদন করিতে উৎসুক। এখানে ঐ যে নির্ব্বিশেষ 'মহা-মানবে'র পরিবর্ত্তে ("যে 'মানব' ব্যক্তিতে ও

অব্যক্তে") জাতিবিশেষের জীবন কবির রস-পিপাসা উদ্রেক করিয়াছে, তার কারণ, সৌন্দর্য্য-পিপাসা মাত্রেই বৈচিত্র্য-পিপাসা—সকল আর্টের উহাই মূল তত্ত্ব। আবার রবীন্দ্র-কাব্যে ঐ সৌন্দর্য্যের মূলে আছে সাঙ্গীতিক প্রেরণা, সে রস নির্ব্বিশেষের রস; তাই এ কাব্যে ঐ বিশেষের সহিত নির্ব্বিশেষের লুকাচুরী-খেলা প্রায় সর্ব্বত্রই আছে। এখানেও সেই কবি-মানস ঐ বসুধা-রূপিণী প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বরসের একটা মূল উৎস বা ঐক্যতত্ত্বের স্থাপনা করিয়া, পরে তাহার রূপ-বৈচিত্র্যের রসও আস্বাদন করিয়াছে।

মানুষ করিয়া তুলি, ইত্যাদি। কবি এখন কল্পনায় বসুন্ধরার সহিত এক হইয়া গিয়াছেন; সেই মাতৃক্রোড়ে প্রবেশ করিতে পারিলে সেখান হইতে সকল জাতির জীবনে যুক্ত হওয়া যায়।

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা। এই একটি কবিতায় কবি বিশুদ্ধ জীবনবাদের জয়গান করিয়াছেন; আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সর্ব্ববিধ সংস্কারমুক্ত হইয়া প্রাকৃতিক জীবন-ধর্ম্মকেই অন্তরে বরণ করিয়াছেন। ইহাও কবির একটা mood বা বিশেষ ভাবাবস্থা; অথবা কবি ঐরূপ কল্পনার আবেগে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। নহিলে, কবি-রবীন্দ্রের কাব্যমন্ত্র এইরূপ প্রকৃতিতান্ত্রিক হইলেও তাহাতে অতিসূক্ষ্ম মানসধর্ম্মনিষ্ঠা ও নৈতিক শুচিতাবোধ প্রবল, এমন দেহ-জীবনের রসোল্লাস কোথাও নাই। এই পংক্তিগুলির সহিত তুলনীয়—

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি
জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
ছুটেছে নিশিদিন.
ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!

[মানসী

পরিতাপ-জর্জ্জর-পরাণে......অতীতের পানে। তুলনীয়—

"We look before and after
And pine for what is not,
Our sincerest laughter
With some pain is fraught."

[P. B. Shelley

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর......প্রচ্ছন্ন-অনল বজ্রের মতন। তুলনীয়—

Tiger, Tiger burning bright
In the forests of the night!
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

[W. Blake

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, ইত্যাদি। আরম্ভের সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি !

তোমার মৃত্তিকাসনে, ইত্যাদি। ইহা শুধুই মর্ত্ত্যপ্রীতি নয়—খাঁটি 'মৃত্তিকা'-প্রীতি, 'কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় আছে—

"মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন হয়ে ছিনু ওই বিরাট জঠরে।"

'অহল্যার প্রতি' কবিতায় অহল্যা ঠিক তাহাই হইয়াছিল,—অহল্যার সেই সৌভাগ্য—তাহার সেই মৃত্তিকা-জীবন কবি কল্পনায় অনুভব করিয়াছেন।

আমার মাঝারে উঠিয়াছে তৃণ তব। তখন আমি তৃণ-তরু-পুষ্পরূপে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতাম। ইহা সৃষ্টির মধ্যে—প্রাকৃতিক সর্ব্ববস্তুর মধ্যে—সেই আত্মার বা ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ (Involution) নয়, যথা—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বা সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥

[গীতা, ১৫।১৩

—ইহা খাঁটি জড়বাদ, অর্থাৎ জড়ের বাহিরে বা ঊর্দ্ধে কিছু নাই—সকলই জড়ের অভিব্যক্তি। কবি-মানসে আরেকটি যে তত্ত্বের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়—'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,' তাহাও 'রূপে'র সেই জড়তত্ত্বকে মহিমান্বিত করা, অর্থাৎ, (যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তাহারও একপ্রকার স্থায়িত্ব-কল্পনা।) কাব্যে কবির কল্পনা যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে পারে, যে-কোন ভাবের রস-রূপ সৃষ্টিতেই কবিতার সার্থকতা। তথাপি শুধুই কবিতা-বিশেষে নয়, পূর্ব্বাপর বহুতর কবিতায়, এবং এইরূপ আত্মভাবমূলক (subjective) কল্পনায়,—কবির সমগ্র কবিসত্তায় যেন একটি গূঢ়তম উপলব্ধি এই সকল কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে, বর্ত্তমান কবিতায় কবির সেই আন্তরিকতাই এমন গাঢ় অনুভূতি সৃষ্টি করিয়াছে।

সর্ব্ব অঙ্গে ...অনুভব করি, ইত্যাদি। সেই মৃত্তিকা-জীবন এখনও কবির মগ্ন-চৈতন্যে স্মৃতিরূপে বিদ্যমান আছে, যেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও এই দেহ সেই সর্ব্বব্যাপী জীবনরসধারার—তরু-লতা-তৃণগুল্মরাজীর সেই নিগূঢ় পুলক—সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করে। ইহা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই প্রকৃতিবাদ নয়, সেখানে মানবাত্মা ও প্রকৃতি এই দুইয়ের দ্বৈত আছে—একই চিৎ ও তাহার আনন্দ জীবে ও জড়ে প্রবাহিত হইলেও, কবি সেই জড়ের সহিত নিজেকে অভিন্ন বা একাত্ম মনে করেন না, সেই যে বলিতেছেন—

"And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes...
The budding twigs spread out their fan
To catch the breezy air ;
And I must think, do all I can
That there was pleasure there."

অথবা—

"I have owed to them
In hours of weariness, sensations sweet
Felt in the blood, and felt along the heart"

—ইহা সেই দৃষ্টি নয়। কবি রবীন্দ্রের ঐ অনুভূতি স্বতন্ত্র, উহা soul বা অন্তশ্চৈতন্যের ক্রিয়া নহে, যেমন ওয়াডসওয়ার্থের, যথা—

'We are laid asleep
In body, and become a living soul,
While with an eye made quiet by the prayor
Of harmony and the deep power of joy
We see into the life of things'

[Abbey

—সেইরূপ সমাধি-অবস্থার অনুভূতি ইহা নয়। উহা একরূপ মানস-উপলব্ধি—অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি মাত্র। সেই অনুভবশীলতাই কবিকে সমগ্র জড়-প্রকৃতির সহিত এমন একাত্ম করিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবাদ একরূপ জড়তত্ত্বেরই অদ্বৈতবাদ, তাহাতেও ঐ একই আছে, দুই নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-পূজায় দ্বৈতবাদ আছে, জড়-সৃষ্টিতে একটা পৃথক মহাচৈতন্যের অনুপ্রবেশ আছে। বিহারীলালও ঐ 'কান্তি'-স্বরূপিণী প্রকৃতির অন্তরালে 'প্রেমে'র অধিষ্ঠান দেখাইয়াছেন, সেই 'প্রেম'ই মানবাত্মার সহিত প্রকৃতির যোগ-সেতু, তাহাই ঐ কান্তিকে হৃদয়গোচর করে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতি' যে সৌন্দর্য্যের আধার, তাহা ইন্দ্রিয় ও মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতি-সাপেক্ষ, সেই সৌন্দর্য্য-পিপাসাই তাহার প্রেম, তাহারই ভাব ও অভাব মনে মধুর উৎকণ্ঠা উদ্রেক করে। এই ভাবতন্ত্র বা কবিমানস ধর্ম্ম ক্রমে কিরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিব, সেই আত্ম-মানসের সহিত ঐ 'জগৎ-ব্রহ্মের' মিলন-লীলা, এবং তাহারই একটা অপূর্ব্ব আর্ট বা আনন্দবাদ শেষে 'জীবন'কেও যে সঙ্গীত-নৃত্যের রস-মুক্তি দান করিয়াছে—সর্ব্ববন্ধন, সর্ব্বদায়িত্ব, এমন কি, আত্মার আত্ম-শাসনও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে—রবীন্দ্র-কাব্যের সেই ক্রমবিকাশের স্তর এখন হইতেই লক্ষ্য করিতে হইবে।

সে বিচিত্র সে বৃহৎ খেলাঘর হ'তে… আনন্দখেলার, ইত্যাদি। এখানে ঐ 'খেলা' ও 'আনন্দ'—দুইটি শব্দই অর্থপূর্ণ, উপরের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী। কবির হৃদয় মানব-সংসারকে কখনই আপনার বাসস্থান করিতে পারে নাই, সর্ব্বদাই ঐ প্রকৃতি ঐ বিশ্ব বা ভূমাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছে।

আমারে ফিরায়ে লহো, ইত্যাদি। এই পুনঃপুনঃ একই প্রার্থনা—কাতরতা-ব্যঞ্জক হইলেও, বাহুল্যদোষ ঘটাইয়াছে।

নিখিলের সেই বিচিত্র আনন্দ, ইত্যাদি। এই পংক্তিগুলিই এ কবিতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মকথা।

আমার আনন্দ লয়ে, ইত্যাদি। এইখান হইতে যে কাব্য-কল্পনা সুরু হইয়াছে, তাহাতে একাধারে 'মানস-সুন্দরী' ও 'পুরস্কারে'র কবি-কাহিনী আরেক ভঙ্গিতে ধরা দিয়াছে, যথা—

মোর মুগ্ধ ভাবে আকাশধরণীতল…অন্তরে-অন্তরে-গাঁথা জীবনসমাজ।

তুলনীয়—

'হায় এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত,' ইত্যাদি।

['পুরস্কার'

এবং

নদীজলে মোর গান, উষালোকে মোর হাসি, ইত্যাদি। তুলনীয়—

সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল, উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা, পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছ'লে
ললিত যৌবনখানি।

['মানসসুন্দরী'

আজ শতবর্ষ পরে, ইত্যাদি। ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যমন্ত্রের সেই 'অমরতা'। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে, জীবন ও মৃত্যুর এই অভেদ-তত্ত্ব—সৃষ্টির আদ্যন্ত-ধারায় প্রাণের ঐ নিত্যলীলার আশ্বাস, কত ছন্দে, কত ভাবে ও ভঙ্গিতে গীত হইয়াছে! উহার মূলে আছে ঐ প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব জীবনবাদ। তুলনীয়—

আজি সব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান,
আজিকার কোন রক্তরাগ,
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে।

['চিত্রা'

ছেড়ে দিবে মোরে, ইত্যাদি। এই পংক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মর্ত্ত্যপ্রীতির স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া যাইবে। ধরিত্রীর ঐ রূপরস-পিপাসাই সেই মর্ত্ত্যপ্রীতি, তাহা মানব-প্রীতিই নয়; সেই প্রীতির আশ্রয়—"সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ"। ঐ 'জীবন'ই প্রকৃতির সেই প্রাণ স্রোত—যাহা "শতেক সহস্ররূপে শতলক্ষ সুরে গুঞ্জরিছে গান," যাহার নৃত্য অসংখ্য ভঙ্গিতে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে—"প্রবাহি যেতেছে চিত্ত, ভাবস্রোতে ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু"। ইহা সেই সুরেরই রূপ-প্রবাহ। কবি সেই রূপময় রাগিণীর পিপাসায় বসুন্ধরাকে ভালবাসেন, তাঁহার চক্ষে—

দাঁড়ায়ে রয়েছে তুমি শ্যাম-কল্পধেনু—অর্থাৎ, এই পৃথিবী সেই আনন্দ-সঙ্গীত-রসের প্রস্রবণ। এই প্রকৃতি-তান্ত্রিক আনন্দবাদকে বৈদিক ঋষিমন্ত্রে শোধন করিয়া লইলে মন আশ্বস্ত হয় বটে,—কবিও সেই সকল মন্ত্রের ঐরূপ প্রকৃতি-তান্ত্রিক ভাষ্যই করিয়াছেন, তাহাই

তাঁহার কবিধর্ম্মের—সেই দুর্দ্ধর্ষ Subjectivity-র পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ দুই আনন্দবাদ এক নহে, বরং বিপরীত বলিলেও হয়। একটিতে আছে খাঁটি আধ্যাত্মবাদ, অপরটিতে আছে খাঁটি প্রকৃতিবাদ। একটির আনন্দ 'আত্মন্' নামক 'ভূমার' সহিত মিস্টিক অভিন্নতা-বোধের আনন্দ, তাহাতে ঐ প্রকৃতির কোন পৃথক সত্তা নাই; উহার সব কিছু, অর্থাৎ 'ইমানি ভূতানি' সেই আনন্দময় আত্মার বিসৃষ্টি মাত্র; সেই আনন্দ আত্মারই সর্ব্বনিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা। অপরটিতে প্রকৃতিই সব, উহার বাহিরে বা উপরে কিছু নাই। সেই প্রকৃতি জীবন-ময়ী, জড় ও চেতন—সকলের মধ্যে সেই জীবন রূপে-রসে বিকীরিত, বিচ্ছুরিত হইতেছে। সেই রস আস্বাদন করিতেছে যে মন তাহা সেই 'আত্মা' নয়—ঐ প্রকৃতিরই একটা 'পরিণাম'—একটা সূক্ষ্ম আধিভৌতিক পদার্থ। সেই মন হইতেই একটা ব্যক্তি-চেতনা, বা অহংচেতনা জন্মে, তাহাই সজ্ঞানে সেই রূপ-রস আস্বাদন করে, এবং তাহাতেই ঐ প্রকৃতির সহিত গভীর আত্মীয়তা-বোধ জাগে। এখানে কবি আপন কবি-মানসে সেই-ঘনিষ্ঠতাই অতি নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেছেন, এবং ব্যক্তি-জীবনের গণ্ডি ভেদ করিয়া প্রকৃতির বিশ্বজীবনে সেই আধি-ভৌতিক ভূমানন্দ আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন। উহাও এক প্রকার মুক্তি; আধিভৌতিক রূপরস-সম্ভোগের সেই ব্যক্তি-চেতনাকে জড়-বিশ্বের সমষ্টি-চেতনায় মিলাইয়া অপরবিধ ভূমানন্দ-ভোগ। কবি যে পরে আরেকটি বিখ্যাত কবিতায় বলিয়াছেন—

> অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ—এই বসুধার
> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারম্বার
> তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
> নানাবর্ণগন্ধময়।

['মুক্তি'—নৈবেদ্য

—তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐ 'তুমি' সেই বিশ্বপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী মহাজীবন-দেবতা বা 'বিশ্বদেবতা'; এবং 'বারম্বার' অর্থে—সেই 'অমরতা', যাহা ঐ সৃষ্টির ধারায় নিয়ত যুক্ত হইয়া—অন্য কোন পন্থায় নয়—লাভ করা যায়। অতএব এই 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে, কবি-জীবনের এইখানে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিধর্ম্ম ও কাব্যমন্ত্রের একটি পরিস্ফুট প্রকাশ আছে; এজন্য কবিতা-হিসাবেও উহার রস উৎকৃষ্ট হইলেও, ইহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এ পর্য্যন্ত 'মানসলক্ষ্মী', 'সমুদ্রের প্রতি', 'পুরস্কার' প্রভৃতি কবিতায় যাহা 'আপন গন্ধে কস্তুরী মৃগসম' নানাদিকে বিচরণ করিতেছিল, তাহাই সহসা এই কবিতায় নিজস্ব বাণী-রূপ লাভ করিয়াছে।

তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূর দেশে।...
> নীরবে জ্বলিবে তব পথের দু'ধারে
> গ্রহ তারকার দীপ কাতারে কাতারে।
> তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে
> কোথা হ'তে কোথা গেছ না রহিবে মনে।

['যাত্রী'—চৈতালি

এই আকাঙ্ক্ষাই পরে বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, যথা—

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্ব পথে বন্ধন-বিহীন।

['বলাকা'

[পূর্ব্বে বলিয়াছি রবীন্দ্র-কাব্যে কতকগুলি একই ভাব-বীজ আছে, তাহাই কালে কালে নবনবরূপে বিকশিত হইয়াছে। একেবই বহুরূপ-রচনা—উৎকৃষ্ট আর্টের লক্ষণ; ভাব যেমনই হোক—পুবাতন হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ঐ নব নব রূপের যোজনাই মুগ্ধ করে।]

নিরুদ্দেশ যাত্রা

কবিতা-প্রসঙ্গ

'সোনার তরীর' শেষ কবিতা। ইহাতে কবি তাঁহার 'মানসসুন্দরী'কে আরেক রূপে দেখিতেছেন—এ কবিতাও একটা রূপক। প্রথম কবিতার একস্থানে আছে—

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশদিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে।
এব কোন কূল আছে ?

—ইত্যাদি।

এ কবিতায় আকুলতর জিজ্ঞাসা আছে। কবির কবি-জীবনের প্রভাতকালে ঐ 'বিদেশিনী' তাঁহাকে ডাকিয়াছিল, সেই আহ্বানে তিনি সঙ্গীত-কল্লোলিত সৌন্দর্য্য-পাথারে কোন্ দূর কল্প-লোকের উদ্দেশে, তাহারই তরণীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু যতই সেই বারিরাশি অতিক্রম করিতেছেন ততই গন্তব্যেব ঠিকানা হারাইয়া যাইতেছে—

বেলা বহে যায় পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চ'লে যায়,
পশ্চিমে হের নামিছে তপন অস্তাচলে।

দেহে-মনে যতই অবসাদ ও ক্লান্তি নামিতেছে ততই সেই বিদেশিনীর ভাবভঙ্গি আরও রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। প্রথম কবিতার সেই 'সোনার তরী' এখানে আরেক অর্থ বহন করিতেছে, এ তরী কল্পনার তরী এবং তাহাতে কবি নিজেই ভাসিয়া চলিয়াছেন; তথাপি তাহার সহিত একটা ভাব সাদৃশ্য আছে। সেখানে কাব্য শেষ হইয়াছে, কবি বিশ্রাম চান, এখানে কাব্য শেষ

হয় নাই, বরং অসীম সৌন্দর্য্যসাগর পার হইবার দুশ্চিন্তা আছে—আশা ও আশঙ্কা দুইই আছে। অতএব, এই কবিতায় কবির যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, প্রথম কবিতাটিতেও তাহারই একটা ভিন্নতর রূপ আছে, অর্থাৎ সেই কবিতাও কবির ভাবজীবনের একটি ভাবনা-কামনার রূপক—তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এ কবিতার ঐ রূপকটির মূলে দুইটি তত্ত্ব আছে; এক—কবি-মানসের সেই ভাবগ্রন্থি আরও দৃঢ় হইয়াছে, তিনি বিশ্বাস করেন—কোন এক অন্তর্যামী-শক্তি তাঁহার কবি-জীবনের নিয়ন্ত্রী; পূর্ব্ব কবিতার সেই কর্ণধারই এখানে আরও সুস্পষ্টভাবে কবির 'জীবন-দেবতা'র রূপ ধারণ করিয়াছে; ইহাকেই পরবর্ত্তী কাব্যে ('চিত্রা') তিনি ঐ নামে অভিহিত করিয়াছেন। দুই—ঐক্ষণে কবির কবি-জীবনে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে; যে সৌন্দর্য্য-জগৎ তাঁহার মানসে উত্তরোত্তর উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহা এমনই অসীম যে ভয় হয়, তাহা পার হইয়া শেষ তীর্থে পৌঁছানো অসম্ভব। কবি আশা করিয়াছিলেন, ঐ সৌন্দর্য্য-সাধনায় হৃদয়ের সকল উৎকণ্ঠা দূর হইবে, উহাতেই একটি পরমা নির্বৃতি লাভ হইবে, যথা—

"এ বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে, আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

['মানসসুন্দরী'

কিন্তু এখন বোধ হইতেছে এ পথের শেষ নাই,—শেষ হইবার পূর্ব্বেই শক্তি নির্ব্বাপিত হইবে, জীবনের দীবালোক দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই আকুল হইয়া সেই মোহিনী বহিত্র-বাহিনীকে তাঁহার ঐ আশঙ্কা নিবারণ করিতে বলিতেছেন, সে কেবল এক রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিতেছে। এ হাসির অর্থ—অন্ধকার নামিলেও কোন ভয় নাই; এখনও কত প্রভাত আছে। হোক না ঐ সৌন্দর্য্যসাগর অসীম অকূল—উহার ঐ অসীম বক্ষেই সৌন্দর্য্যের আলোক নানা বর্ণে বিলসিত হইবে। কবি হয়তো তাহা বুঝিতেছেন—ঐ হাসিতে সেই আশা জাগিতেছে, তবু নিঃসংশয় হইতে পারিতেছেন না।

কবিতা-পাঠ

সোনার তরী—এখানে সেই প্রথম কবিতার অর্থে নয়; 'কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ।

বিদেশিনী—তুলনীয়—

তুমি এই পৃথিবীব
প্রতিবেশিনীর মেয়ে

['মানসসুন্দরী'

এবং

তোমারে চিনি গো চিনি
ওগো বিদেশিনী

[রবীন্দ্র-সঙ্গীত

সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা। অস্ত-গগনের কিনারে শেষ সূর্য্যালোক—অগ্নিবর্ণের রশ্মিচ্ছটা। তুলনীয়—

অতি ধীরে মৃদু হেসে, সিঁদুর সীমন্তদেশে
দিবা সে যেমন ক'রে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়,
পশ্চিমের জ্বলন্ত শিখায়।

['সন্ধ্যা সঙ্গীত'

মেঘচুম্বিত অস্তগিরি। 'অস্তগিরি'—একটা পৌরাণিক কল্পনা, অতএব কবি-কল্পনার 'আলয়' হইবার উপযুক্ত।

সংশয়ময় ঘননীল নীর। ভাষা ও উপমার রীতি ইংরেজী। ইংরেজীতে ইহাকে 'Pathetic fallacy' বলে, কবির নিজ মানসের সংশয় সমুদ্রকেও সংশয়নীল করিয়াছে।

কী লাগি তোমার বিলাস হেম। 'বিলাস' অর্থে—'কৌতুক-রস', 'লাস্যলীলা'।

যখন প্রথম ডেকেছিলে, ইত্যাদি। 'নবীন প্রাতে' অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের সেই নব জাগরণ কালে। 'পশ্চিম পানে অসীম সাগর'—এমন অর্থ করা যাইতে পারে যে, য়ুরোপীয় কবিদের (পাশ্চত্য জগতের) কাব্যই তখনকার বাঙালী কবিগণকে এক নূতন কল্পনা জগতের রূপ-রসে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। 'নবীন জীবন' অর্থেও তাহাই। অথবা, কাব্য জগতের এক নূতন দিক, মহাকাব্য নয়—গলিত স্বর্ণের ন্যায় তরঙ্গোচ্ছল লিরিক কবিতার ভাব-সাগর, সন্ধ্যার পূরবী রাগিণীর সুরে কবিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহারই চঞ্চল আলো পশ্চিম সাগরের জলে (সেই পাশ্চাত্য গীতিকাব্য) কাঁপিতেছিল, তাহা যেমন নিমেষ-মধুর, তেমনই স্বপ্নময়। রূপকের এমন অর্থও করা যায়, কিন্তু এখানে কবির কবি-প্রাণের একটি ভাবাবস্থাই (mood) চিত্রিত হইয়াছে, প্রথম কবিতায় ('সোনার তরী') রূপকটিও ঠিক এমনই একটি চিত্র-রচনা, তাহাতেও অর্থ অপেক্ষা ভাবের ব্যঞ্জনাই মুখ্য। এখানেও সেই এক অবস্থা, তফাৎ এই যে—সেই নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার সঙ্কেত আছে, তাই কাব্যসুন্দরীর হাসি এমন রহস্যময়।

আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি, ইত্যাদি। তুলনীয়—

এসো সুপ্তি, এসো শান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি, শোয়াও যতনে
মরণ সুগন্ধি শুভ্র বিস্মৃত শয়নে।

['মানসসুন্দরী'

—এ যেন কীটসের (Keats) সেই—

Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain

[*Ode to Nightingale*

শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ, ইত্যাদি। জানি সেই অন্ধকারেও তুমি সঙ্গে থাকিবে—আমার এই কাব্য-তরণীর কর্ণধাররূপে। তোমার নীরব হাসি তখন আর দেখিতে পাইব না বটে, কিন্তু তোমার দেহ-সৌরভ, উড়ন্ত কেশরাশির স্পর্শ ও জলকলগান আমাকে আরও অধীর করিয়া তুলিবে—তোমাকে আরও নিকটে পাইবার ও দেখিবার বাসনা বাড়িবে। ইহাই যেন সেই সুন্দরীর অভিপ্রায়—এমনই করিয়া তিনি কবিকে সৌন্দর্য্যের রহস্যলোকে—আরও গভীরে পৌছাইয়া দিবেন; ঐ 'নীরব হাসি'তে যেন তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

'সোনার তরী'-পাঠান্তে

'সোনার তরী'-পাঠের ভূমিকায়, এবং কবিতাপাঠকালে আমি এই কাব্যের রূপ ও রস—ইহার সর্ব্ববিধ ভাববস্তু এবং প্রধান প্রেরণার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। তথাপি পাঠশেষে কাব্যখানিকে আরেকবার সমগ্রভাবে পরিদর্শন করা আবশ্যক। প্রথমে ইহার প্রধান লক্ষণগুলি আরেকবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

'মানসী'র পরে এই কাব্যে কবিশক্তির সমধিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় কি না? ছন্দে ও ভাষায়, অর্থাৎ কবিতার গঠনে ও ভাবের প্রকাশ-ভঙ্গিতে কাব্যগুণের যে উৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা কাব্যকলার নয়—ভাবনা-কল্পনার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি, তাহার কারণ, অর্থাৎ পূর্ব্বের সেই ভাষা ও সেই ছন্দই অধিকতর উজ্জ্বল ও লীলায়িত হইয়াছে। এমন কথা বলা যাইবে না যে, 'মানসী'র কয়েকটি কবিতায় আমরা ভাষা ও ছন্দের যে যাদুশক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা 'সোনার তরী' হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট।

সেই ভাব ও কল্পনার দিক দিয়া দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, এই কাব্যে কবির রস-প্রেরণা আরও স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত; প্রাণের আনন্দই অধিক; কবি যেন এক্ষণে ভাব-কল্পনার অবারিত উৎসারে বিবশ-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন; নিজেই দুইটি কবিতায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। একটিতে (প্রথম কবিতা) নিজ কবিশক্তির পরিপূর্ণতা, এমন কি, কাব্য-সাধনার সমাপ্তি আশঙ্কা করিয়াছেন; অপরটিতে ('নিরুদ্দেশ যাত্রা'), তিনি যে কাব্য-প্রবাহে ভাসিয়াছেন, তাহার অসীমতা ও অনির্ব্বচনীয়তা তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। সেই রসাবেশ যে কেমন তাহা 'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতায় পূর্ণ-প্রকটিত হইয়াছে। অতএব, ইহাই সত্য যে, কাব্যকলার দিক দিয়া 'মানসী'তে আমরা কবিশক্তির যে পূর্ণ-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এ কাব্যে সেই শক্তির সহায়তায় কবি আপন প্রাণ-মনের—ভাব ও কল্পনার—উচ্চতর ও গভীরতর প্রদেশে সচ্ছন্দ-বিচরণ করিয়াছেন; এক কথায় তাঁহার কাব্য-প্রেরণা বা কবি-প্রাণের নিবিড়-গভীর আকুতি এই কাব্যে একটি অপূর্ব্ব রসোল্লাসে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। 'মানসী'তে আমরা কবির স্ব প্রকৃতির—অর্থাৎ মনঃপ্রধান কল্পনা ও ভাবুকতার সহিত আর্টের মিলন দেখিয়াছি, তাহাতেই ভাষা ও ছন্দের আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ কাব্যে

ভাবের আবেগ ও রসমূর্চ্ছনা সেই আর্টকেও অতিক্রম করিয়াছে। ঐ আত্মহারা রসাবেশই প্রমাণ করিতেছে যে, এই কাব্যেই কবি নিজ কবি-হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়া তাহারই আনন্দে গীতিরস-বিহ্বল হইয়াছেন; এমনটি পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। অলস ভাবুকতার স্বপ্ন, অর্থাৎ মনের নানা লূতাতন্তু এতদিন যেন তাঁহাকে পূর্ণ-প্রাণের পানীয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল; 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র কালে তাঁহার চিত্তের যে জাগরণ হইয়াছিল, পরে তাহা মনেরই দীপ্তি বা প্রখরতা বৃদ্ধি করিয়াছিল, এমন রস-চৈতন্যের জাগরণ ঘটে নাই। ঐ জাগরণের উল্লাসই 'সোনার তরী'র, একটি কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে ('ঝুলন')। 'মানসসুন্দরী', 'পুরস্কার' ও 'বসুন্ধরা'—এই তিনটি বড কবিতায়—কোথাও নিছক রসাবেশ, কোথাও ধ্যানের আনন্দ, কোথাও বিশ্বায়ত সৌন্দর্য্যের রস-পিপাসায় কবি নিজের সেই কবি-প্রাণের পুলক নিবেদন করিয়াছেন। অতএব, এই 'সোনার তরী'তেই সর্ব্বপ্রথম কবি ও কাব্য এক হইয়া গিয়াছে; কেবল ভাবের উদ্দীপনাই নয়—রসের উৎসবও আছে—উহাই রবীন্দ্র-কাব্যের কবিশক্তির পূর্ণ প্রস্ফুরণ-কাল।

এ কাব্যের আরেক লক্ষণ—ঐ রূপকগুলির অন্তর্নিহিত কবি-দৃষ্টি ও তাহার রচনা-ভঙ্গি; কারণ, 'সোনার তরী'র অধিকাংশ কবিতাই রূপক। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বভাষে কিছু বলিয়াছি। ঐ রূপকগুলি কাব্যকলার দিক দিয়া একটি উৎকৃষ্ট ভঙ্গি হইলেও, ঐরূপ কল্পনা—রবীন্দ্র-কবিমানসেরই একটি প্রকৃতিগত লক্ষণ। ভাব-চিন্তার যে Universalism, অর্থাৎ বিশেষকে নির্ব্বিশেষের Symbol বা সাঙ্কেতিক বিগ্রহরূপে দেখিবার যে একটি মানস-ধর্ম্ম আমরা কবির প্রথম বয়সে একরূপে দেখিয়াছি—সেই concrete-এর পরিবর্ত্তে abstract-এর প্রতি পক্ষপাত এবং যে মানস-ধর্ম্ম তাঁহার শেষ বয়সের রূপক-নাট্যগুলিতে এমন দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাই এই কাব্যের ঐ রূপক-কবিতাগুলিতে এমন সার্থক রূপসৃষ্টি করিয়াছে, সেই মনঃপ্রধান ভাবাকুলতা খাঁটি কবিকল্পনায় যুক্ত হইয়াছে। এখানে ভাবকে রূপের বাঁধনে বাঁধিবার, বা রূপকে ভাবের অসীমতায় বিস্তার করার শক্তিই কাব্যকলায় সার্থক হইয়াছে।

ঐ রূপকগুলিতে আমরা সাধারণভাবে যে একটি তত্ত্বের আভাস পাই, তাহা এই যে, কবির মনোজগৎ এবং এই বহির্জ্জগতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, একটার সহিত আরেকটা যেন কোন এক নিগূঢ় সূত্রে সম-রূপ হইয়া আছে। এ বিষয়ে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই উক্তি স্মরণীয়—

> "How exquisitely the individual mind
> ....to the external world
> Is fitted......and how exquisitely too
> The external world is fitted to the mind!"

—সকল উৎকৃষ্ট রূপক এই তত্ত্বই প্রমাণ করে। কবিদের উপমা-আহরণে আমরা যেমন বুঝিতে পারি যে, বহির্জ্জগতের বস্তুসকলের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা সাদৃশ্যের সম্পর্ক আছে, তেমনই ঐ রূপকগুলিতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কবির মনোজগতের সহিত বহির্জ্জগতের একটা সাদৃশ্য পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে। বস্তুতঃ সকল উৎকৃষ্ট কাব্যই জগৎ ও জীবনকে একটি ভাবময়

রূপকের আকারে তথা রসরূপে প্রতিভাসিত করে। আবার রূপকের সেই রূপগুলা—ভাবের সেই বিগ্রহগুলাও কিরূপ জীবন্ত ও বাস্তব—'পরশ-পাথরে'র মত উৎকৃষ্ট রূপক-কবিতা তাহাই প্রমাণ করে। এইরূপ Symbolism বা ভাবের বিগ্রহ-রচনা রবীন্দ্র-কাব্যে নানা ভঙ্গিতে প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, এবং যেখানে ভাব ও রূপের সারূপ্য যত সুসম্পূর্ণ হইয়াছে, সেইখানেই রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্ট রস তত উজ্জ্বল হইয়াছে, নতুবা তাহা নিতান্ত মনঃপ্রধান অথবা নিছক আর্ট বা বাক্-অর্থের কৌশলময় কারুকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।

'সোনার তরী'র কাব্যরস ও তাহাতে কবিশক্তির বিকাশ-লক্ষণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। ইহার পর, এই কাব্যে রবীন্দ্রের কবিধর্ম্ম কিরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও দেখিয়া লইতে হইবে। কবিতা পাঠ-কালে, প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে আমি সে আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহা একরূপ পুনরুক্তির মত হইবে; তথাপি সেই সব কথা পুনরায় পৃথকভাবে পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন আছে, কারণ, তাহার উপরেই সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের বিচার ও তাহার শেষ-মূল্য-নির্দ্ধারণ নির্ভর করিবে। কবি-রবীন্দ্রের কাব্য শেষ পর্য্যন্ত একটি অভিনব আর্টপন্থায় নিঃশেষ হইলেও, ঐ কাব্যমন্ত্রই ভাবসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক দান।

'সোনার তরী'তে যে কাব্যরস আছে তাহা যে কবির সেই কাব্যমন্ত্রেরই গূঢ়তর প্রেরণায় এমন উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই—'বসুন্ধরা' কবিতাটিই তাহার প্রমাণ। সেই কাব্যমন্ত্রকে আমি 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতেই সন্ধান করিয়াছি; 'সোনার তরী'তে তাহা যেমন করিয়া কবির রস-চেতনায় যুক্ত হইয়াছে—প্রাণ, মন ও দেহ যেন একসঙ্গে সেই মন্ত্র যপ করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তেমনটি আর কোথাও হয় নাই; 'সোনার তরী'র ঐ কাব্যসৌন্দর্য্যও সেই কারণেই। এই তত্ত্ববাদকে আদৌ প্রকৃতি-তন্ত্র বলাই সঙ্গত; আধুনিক কবিমাত্রেই যে অর্থে প্রকৃতিবাদী, কবি-রবীন্দ্র তাহা তো বটেনই, অধিকন্তু তাঁহার সেই প্রকৃতি-প্রেম মুখ্যভাবে একটা গভীরতর প্রত্যয় বা তত্ত্বোপলব্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই প্রকৃতি বা জড় সৃষ্টিতে কবি প্রথমতঃ একটা প্রাণের লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই প্রাণ আকাশে ও মাটিতে, রঙে রূপে ও জীবন-রসে বিচ্ছুরিত হইতেছে। সেই প্রাণ বাহিরে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরাজীতে, অন্তরে তেমনই সঙ্গীত-রূপে প্রকাশমান। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের মূলে আছে সেই এক সঙ্গীতের নৃত্যচ্ছন্দ, তাহাই জীবনকে সকল বন্ধন-মুক্তির আনন্দ-উৎসবে নিরন্তর আহ্বান করিতেছে। শেষ জীবনে কবি এই আনন্দ-নৃত্যকেই একমাত্র সত্য বলিয়া, শুধু কাব্যে নয়—সমাজে সংসারে, জীবনের সর্ব্ব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে পালনীয় করিতে চাহিয়াছিলেন, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক, কোন শাসন, কোন শাস্ত্রবিধি, বা অধিকার-বাদ মানিবার প্রয়োজন তাহাতে নাই—ঐ প্রাকৃতিক প্রাণ-লীলাই সর্ব্ব-ধর্ম্মের আদর্শ হইয়াছিল। প্রকৃতি বা জড়সৃষ্টিকেই কবি সেই সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের—সেই নিত্যপ্রবাহী প্রাণধারার আদি, মধ্য ও অন্ত-রূপে দেখিয়াছেন; উহার বাহিরে বা উপরে অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব তিনি তাঁহার সেই স্বকীয় আন্তর উপলব্ধিতে দর্শন করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু জড়সৃষ্টির সেই রূপ ও সেই রস তাঁহার সমগ্র কবিসত্তাকে কেমন উদ্বুদ্ধ ও চরিতার্থ করে—'সোনার তরী'র বড় কবিতাগুলিতে, এবং বিশেষ করিয়া ঐ 'বসুন্ধরা'

কবিতাটিতে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'সোনার তরী'র আরেকটি কবিতায় কবি এই কথাই বলিয়াছেন—

মানবাত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখপানে
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলা মাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

['আত্মসমর্পণ'

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়, কবি যেমন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের (Cosmogony) অনুধ্যানে বিভোর হইয়াছেন—জল হইতে স্থল বা মৃত্তিকা, এবং মৃত্তিকা হইতে জীবসৃষ্টির ক্রমবিকাশ স্মরণ করিয়া মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইয়াছেন, তেমনই, 'বসুন্ধরা' কবিতায়—জড় হইতেই চেতনার উদ্ভব হইয়াছে, এবং মৃত্তিকাই সর্ব্বজীবন-বীজের আধার—এই বিশ্বাসের আনন্দে কবি আত্মহারা হইয়াছেন। ' 'মানসসুন্দরী'তে তিনি সেই প্রকৃতির অন্তরবাসিনী সৌন্দর্য্যরূপিণীকে সঙ্গীতের ডোরে বাঁধিয়া কবি-হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করিয়াছেন ; সেখানেও সেই রূপক-কল্পনার অন্তরালে যে রূপরস-পিপাসা আছে তাহা ঐ প্রকৃতি-প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ তাহাও সেই জড়-সৃষ্টিগত রূপরসের আকর্ষণ। তাহা একান্তই 'মানসী' বা Intellectual এই অর্থে যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিই প্রধান , অর্থাৎ, তাহা অতিসূক্ষ্ম মানস-পিপাসা—তাহাই আর্টের রস-পিপাসা, aesthetic বা রূপতান্ত্রিক sensuousness। 'পুরস্কার'-কবিতায় কবি সেই একই তত্ত্বকে মানব-ইতিহাস বা মানব-জীবন-কাব্যের সঙ্গীতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; সমগ্র সৃষ্টি সেই এক মহাসঙ্গীতের রূপ-প্রবাহ , মানুষের জীবন, রাজা ও রাজ্যের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, হাসি-কান্না, স্নেহ-প্রেমের যতকিছু কাতরতা—সকলই সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গীতরাগে মনোহর হইয়া উঠে, সেই মনোহারিত্বই সত্য,—তাহা অনিত্য হইয়াই ঐ সৃষ্টিধারার নিত্যত্ব ঘোষণা করে। এই কবিতায়, কবি, তাঁহার সেই কবি-মানসের ধর্ম্মমন্ত্রই নয়—সমগ্র কাব্য-সাধনার মূলে যে আর্টপন্থা রহিয়াছে, তাহারও একটি সুস্পষ্ট নীতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জগৎকেও যেমন, তেমনই মানব-সংসারকেও তিনি কোন মন্ত্রে সেই এক আর্টের অধীন করিয়া লইয়াছেন। ঐ আর্টের মূলমন্ত্র সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য মনীষী যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিবার যোগ্য, যথা,—The secret of artistic creation and of the effectiveness of art is to be found in the return to that level of experience at which it is *man* who lives, and not the *individual*, and at which the weal or woe of the *single human* being does not count, but only *human existence*.

[Dr. Jung

—কবি রবীন্দ্রনাথেরও ঐ 'বিশ্বজীবন' ও 'বিশ্বমানব'-প্রীতির কারণ একই।

'সোনার তরী'র ঐ তিনটি কবিতায় যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম ও কাব্যমন্ত্রের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে, তেমনই, অপর কবিতাগুলিতে কবি-মানসের নৈমিত্তিক ভাব-কল্পনার রসাবেগ

আছে; সেখানে কবি এক-একটি mood বা সাময়িক ভাবাবস্থার রস আস্বাদন করিয়াছেন; এইরূপ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিধর্ম্ম নয়—কবি-প্রাণের আকুতিকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। পরে দেখা যাইবে, শুধুই এইরূপ mood নয়—আর্টিষ্টসুলভ বৈচিত্র্য-পিপাসায় তিনি সর্ব্ববিধ ভাব ও ভাবনাকে ভাষায় ও ছন্দে একটি অনবদ্য আর্ট-রূপ দান করিয়াছেন—নিজস্ব ধর্ম্মমন্ত্র যেমনই হোক। তাহাতে এমন মনে হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভায় একাধারে সর্ব্বভাব, সর্ব্বচিন্তা ও সর্ব্বতত্ত্বের সমান স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এমন সর্ব্বতোমুখিতা সত্যই বিস্ময়কর —সে যেন এক কবি-ব্রহ্মের অন্তহীন বিভূতি। কিন্তু সেও আর্টের ব্রহ্ম, মূলে কোন 'এক'-এর বন্ধন নাই বলিয়াই কবি এমন বহুর পরিচর্য্যা করিতে পারিয়াছেন, সেই 'বহু'র রস-বৈচিত্র্য কবির একমাত্র সাধন হইয়াছে। এ কথা কবি নিজেই পরে একটি কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

"অর্থ কিছু নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র-করা বিচিত্রের নর্ম্ম বাঁশিখানি
যাত্রাপথে।
আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস—
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।... .
নিখিলের অনুভূতি
সঙ্গীত সাধনামাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের বাণী-বৈচিত্র্যের নিগূঢ় রহস্য, কবি যে মুখ্যতঃ একজন আর্টিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে ঐ mood বা সাময়িক ভাবাবস্থার একটি উৎকৃষ্ট কবিতা—'যেতে নাহি দিবে।' এই কবিতায় কবির অন্তর একটি সহজ কবি-ভাবে অভিভূত হইয়াছে—মনুষ্য-জীবনের নশ্বরতা এবং তজ্জনিত মানবহৃদয়ের অতি গভীর বেদনা—স্নেহ-প্রেমের সেই নিষ্ফলতা স্মরণ করিয়া, সেই বিশ্বরাগিনীতে একটি করুণ-বিষাদের সুর মাখাইয়া দিয়াছে। 'পুরস্কার'-কবিতায় এই নশ্বরতার বেদনাময় সান্ত্বনা আছে, এখানে সেই বেদনার কোন সান্ত্বনা নাই—ঐ বিষাদই মধুর হইয়া আছে, তাহাই 'রস' হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ কাব্যে 'রস'ই যদি "সকলপ্রয়োজন মৌলীভূত" হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ সেই রসেরই এক অভিনব কবি-শিল্পী, তাঁহার কবি-প্রতিভা ভারতীয় প্রতিভাই বটে। ইহার পর 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কবি মানব-জীবন ও মানব সংসারের সকল দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-নির্য্যাতন হইতে মুক্তিলাভের জন্য এক 'বিশ্বপ্রিয়া নিরুপমা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা'র শরণাপন্ন হইয়াছেন।

'সোনার তরী'তে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান ও নিত্যবর্ত্তমান লক্ষণের প্রথম বিকাশও লক্ষ্য করি,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অবশ রসাবেশ। রবীন্দ্র-কাব্যমন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রীতির কারণ ও স্বরূপ দুইই সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি বটে, তথাপি সেই সৌন্দর্য্য-প্রীতি যে মুখ্যতঃ ঐ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রসাবেশ, ইহাও বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ যদি কোন প্রেম এই কবির আধ্যাত্ম-সাধনারও সহায় হইয়া

থাকে, তবে তাহা ঐ প্রকৃতি-প্রেম; মনে হয়, রবীন্দ্র-কবিধর্ম্মের মূলমন্ত্র যেমন সেই প্রকৃতিবাদ, তেমনই রবীন্দ্র-ব্যক্তিধর্ম্মের সাধন-মন্ত্রও—ঐ প্রকৃতি প্রেম। সে প্রেম যে কেমন সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য তাহার সাক্ষ্য দিবে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে—তাহার যতকিছু রূপময় ও ভাবময় প্রকাশকে—এমন দৃষ্টিতে আর কেহ দেখে নাই; তাহা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দৃষ্টিও যেমন নয় তেমনই আর কোন কবির দৃষ্টি নয়; সে দৃষ্টিতে প্রকৃতিই সুন্দরী পরমেশ্বরী—সুখদা ও বরদা। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-কবিমানসের যে তত্ত্বদৃষ্টির কথা বলিয়াছি—সেই প্রকৃতিবাদ আগে, না এই প্রকৃতি-প্রেম আগে,—বলা কঠিন; দুই-ই একের দুই দিক; ঐ তত্ত্ব যেমন মনোগত, এই প্রেমও তেমনই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীব্র ও গভীরতর পিপাসা। সে যে কেমন প্রেম, তাহা 'বসুন্ধরা' কবিতার এই পংক্তিগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে—

ইচ্ছা করে, আপনারে করি
যেখানে যা-কিছু আছে, নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে ক'রে যাই দান
পিপাসার জল,······
আমার আনন্দ লয়ে
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার—
প্রভাত-আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার
নবীন কিরণকম্প ?······
নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোন মুগ্ধ কান
নদীকূল হ'তে। উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোন মর্ত্তবাসী
নিদ্রা হ'তে উঠি।

—এমন কামনা আর কোন কবি কোন কালে কোন দেশে করিয়াছে? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি (প্রথম পর্ব্ব দ্রষ্টব্য)—রবীন্দ্র-কাব্যে যে মানবজীবন ও মানবসংসারের কাহিনী আছে, তাহা এই প্রকৃতি প্রেমের জবানীতেই; এমন কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের যতকিছু রূপ-রসসৃষ্টি—কবির নিজের ও যতকিছু ধ্যান ও আত্মগত ভাবনা-সাধনা, সকলই এই প্রেমেরই বিচিত্র বিকাশ।

ইহার পর, এই 'সোনার তরী'র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐ আর্ট-চর্য্যার একটি লক্ষণ এখন হইতেই লক্ষ্য করিতে হইবে। রবীন্দ্র-কাব্যের ঐ আর্ট একরূপ aestheticism হইলেও, তাহা সেই 'art for art's sake' নহে; অর্থাৎ, তাঁহাতে বিশুদ্ধ আর্ট-চর্য্যার মানস মুক্তি নাই। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রেম-সম্পর্কেও যেমন, তেমনই রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য্য-প্রেমেও একটা অতি-সচেতন 'আমি' আছে। আমরা দেখিয়াছি, 'আমি'র এই স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁহার প্রেম-কবিতাগুলিতেও হৃদয়াবেগ দমন করিয়াছে—হৃদয় অপেক্ষা মনের তীক্ষ্ণ অনুভূতিই তাহাতে অধিক। তাহাতে মিলনের আত্ম-নির্ব্বাণ-সুখ নাই—বিরহের

আত্মভাবাতুরতা কবিকে সমধিক রসাবিষ্ট করে। সকল রসসম্ভোগে সজ্ঞান ভোক্তারূপে কবির সেই স্বতন্ত্র 'অহং'কেও চাই। এই আত্ম-চেতনাই সংস্কার ও প্রকৃতিভেদে morality বা নীতিধর্মের বশীভূত হয়; রবীন্দ্র-কাব্যের অত্যুচ্চ ভাববাদও (Idealism) ঐ নীতিধর্মেরই কবিপ্রবৃত্তি; সেই নীতি-নিষ্ঠা রবীন্দ্র-কাব্যের আর্টকে নিরতিশয় শুচি ও সংযত করিয়াছে। আরও একটা বন্ধন তাহাতে আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের ঐ সৌন্দর্য্য-পূজার মূলে একটা তত্ত্ববাদ আছে—তাহাও ঐ 'আমি'টার প্রয়োজনে। সৌন্দর্য্যেই সৌন্দর্য্যের শেষ হইলে চলিবে না, তাহাতে সেই 'আমি' যে আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে! ঐ রস-সম্ভোগেরও স্থায়ীত্ব চাই, তাই সৃষ্টিতেও একটা অনাদ্যন্ত জীবনধারার ধ্যান করিতে হইবে—ঐ অহংও সেই জড়-সৃষ্টির অঙ্গীভূত—তাহারই অংশরূপে অমর; ঐ 'অহং'—ঐ ব্যক্তি-চেতনা জড-বিশ্বেরই একটা বিশেষ অভিব্যক্তি; তাহা যে কোন্ অর্থে কিরূপ অমর—পরবর্ত্তী কালের কবিতায় তাহারও স্পষ্ট আভাস আছে। অতএব রবীন্দ্র-কাব্যেব ঐ আর্ট মুখ্যতঃ রস-সাধনা হইলেও তাহা খাঁটি aestheticism নয়—সেই সর্ব্বসংস্কারমুক্তির ব্রহ্মাস্বাদ নয়, তাহাতে ঐ সজ্ঞান অহং যেমন, তেমনই সৃষ্টির নিত্যসত্তার ঐ আশ্বাস আছে। একদিকে ঐরূপ আর্ট-চর্য্যা এবং অপরদিকে সেই অহং-সংস্কারের প্রবল নীতি-জ্ঞান এই দুইয়ের বিরোধ রবীন্দ্র-কাব্যে সর্ব্বত্র লক্ষণীয়, তাহার ফলে ঐ কাব্য উত্তরোত্তর আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে, আর্টও শেষে রসসৃষ্টির পবিবর্ত্তে অতি-জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির বিলাসলীলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

'সোনার তরী'তে আমবা ঐ রস-সম্ভোগের আর্ট, অর্থাৎ প্রকৃতি-তান্ত্রিক কবি-মানসের রসোল্লাস দেখিয়াছি। এখানে সেই অহং চেতনাই বহির্মুখী, তাহাতে কবির আত্মা-মানসের সহিত পরিচয়ের যে আনন্দ আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া; অতঃপর 'চিত্রা'য় আমরা কবিকে আরও আত্মদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইতে দেখিব; সেই Ego বা অহংকেই 'জীবন-দেবতা' নামক এক বৃহত্তর 'অহং'-এর সহিত লীলাবিলাস কবিতে দেখিব; কিন্তু তাহাতেও ঐ কবিশক্তির সকল লক্ষণ অব্যাহত আছে, তার কারণ, ইহাই রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্নকাল।

বিদায়-অভিশাপ

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটিকে একটি পৃথক কাব্য বলা যাইতে পারে না, অন্য কবিতার সহিত আকারে-প্রকারে পার্থক্য থাকিলেও ইহা একটি খণ্ড-কবিতাই বটে, অতএব রচনাকালের দিক দিয়া ইহাকে 'সোনার তরী'র অনুবৃত্তি-রূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

কবিতাটির ঐ গঠন বা রচনা-রীতি (form) সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্যণীয়। মধুসূদনেব 'বীরাঙ্গনা'-কাব্যে, যেমন পাশ্চাত্য কবির অনুকরণে একটি নূতন রচনা-রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—তাহার নাম 'পত্র-কাব্য'; এই কবিতাটিও তেমনই, ইংরাজ-কবি W. C. Landor-এর 'Imaginary Conversations' নামক কবিতার অনুকরণে রচিত, বাংলায় উহার নাম দেওয়া যাইতে পারে

—'কথোপকথন-কাব্য'। পরে 'কাহিনী' নামক কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই রীতির উন্নতি-সাধন করিয়াছেন, সেখানে ইহার নাটকীয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; এখানে গীতিকাব্যের লক্ষণই অধিক।

কবিতাটির অভিপ্রায় (argument) বা মূল প্রেরণা খুবই স্পষ্ট। কবি ইহাতে একটি দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান পুরুষের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—নারীর প্রেম যাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে না, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা যে জয় করিতে পারে; উচ্চতর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জ্জন করার গৌরব অর্জ্জন করিতে চায়। কবিতাটিতে সেইরূপ একটি চরিত্রের অন্তর উদ্ঘাটিত হইয়াছে; অপর দিকে একটি প্রেমার্থিনী নারীর চরিত্রও চিত্রিত হইয়াছে; একদিকে নারী-হৃদয়ের উন্মুখ কামনা, অপরদিকে আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ ঐ পুরুষের প্রেম বিমুখতা– এই দুইয়ের সংঘর্ষই এই গীতি-রসপ্রধান কবিতাটিতে একটি নাটকীয় লক্ষণ যুক্ত করিয়াছে—উহার ঐ কথোপকথন ভঙ্গিতে।

কবিতাটিতে ঐ 'কচ'-এর চরিত্র—মানবজীবন-কাব্যের উপযুক্ত বটে, উহাতে একটা বাস্তব জীবন-সত্যের আদর্শই কবি-অনুসরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারে পুরুষের জীবনে এমন সমস্যা-সঙ্কট ঘটিয়া থাকে- মহাকাব্য ও নাটকে তাহাই কীর্ত্তিত হয়। অতএব, কবিতাটির বিষয়-গৌরব অল্প নহে। কিন্তু এই কবিতাটিতেও, এই নাটকীয় কল্পনার অন্তরালে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রেম-সম্পর্কিত মনোভাব ও কঠিন আত্মনিষ্ঠার সংস্কার উঁকি দিতেছে—কবি-প্রকৃতির সেই পক্ষপাত রহিয়াছে। হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম-পিপাসাকে হেয় মনে করিয়া তাহার উপরে আত্মিক শুচিতা বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র মর্য্যাদাকে জয়ী করিবার সেই নীতি এখানেও মহিমান্বিত হইয়াছে। ঐ আত্মধর্ম্ম-নিষ্ঠার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য কবি দেবযানীর চরিত্রে প্রেমের একটা দুর্ব্বল ও লোলুপ-মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন—মহাভারতের কাহিনীটিও সে পক্ষে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। কচ যে দেবযানীর অভিশাপে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাকে এমন ক্ষমা করিয়া গেল, তাহার অর্থ সে নিজের সেই সুদৃঢ় আত্মমর্য্যাদাকে ঐরূপ আক্ষেপ-বিক্ষেপের অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে পারে—ভালবাসে নাই বলিয়াই তাহার কোন জ্বালাও নাই।

ঐরূপ moral বা নৈতিক শুচিতা ও সংযমের আদর্শকে মহিমান্বিত করার যে কবি-প্রেরণা, সে বিষয়ে—ইংরেজ কবি টেনিসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা সাধর্ম্ম্য আছে; তাঁহারও 'Love and Duty'-শীর্ষক কবিতায়, এবং 'Idylls of the King'—নামক কাব্যে যে Mid-Victorian moralityর জয়গান আছে, তাহাতেও—

> "Where these (Love and Duty) clash
> Love even at its best must give way."

[A. C. Bradley

—এখানেও তাহাই হইয়াছে। টেনিসনের প্রভাব তাঁহার কাব্যের এইকালের ভাবধারায় অনেক প্রকারে পড়িয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক কবিতার প্রসঙ্গে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। 'সোনার তরী'র 'দেউল' কবিতাটিও স্পষ্টই টেনিসনের 'Palace of Art' কবিতার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু শুধুই এইরূপ কাব্য-বিষয়ে নয়—মূল কবি-ধর্ম্মেও রবীন্দ্রনাথের সহিত টেনিসনের একটা বিষয়ে সাধর্ম্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

মহাভারতের কচ-চরিত্র ও সেই কাহিনীর সহিত এ কবিতার তুলনা অনাবশ্যক ও অমুচিত। মোটামুটি ঘটনাটা তাই বটে, কিন্তু কবি ঐ চরিত্র-কল্পনায় নিজের স্বাধীন রুচি ও রস-প্রেরণার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই। মহাভারতের কচ এমন Chivalry বা নারী-সম্পর্কে সৌজন্য ও সহৃদয়তার অধিকারী নহে, তাহার হৃদয় এত কবিত্ব-কোমল নয়, প্রেমের কোন সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতিও তাহার নাই। সে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহার চরিত্র—তাহার মনে কোন দ্বৈধ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'কচ' অতি-আধুনিক আত্ম-সচেতন ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল পুরুষ; তথাপি তাহাকে সেই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে,—আত্মার সেই ধৈর্য্য ও বীর্য্য বজায় রাখিতে হইবে। এখানে ঐ 'কচে'র চরিত্র—দেবযানীর প্রতি বাহ্যিক ভদ্রতা বা হৃদয়বত্তা রক্ষা করিতে গিয়া একদিকে দৃঢ়তা ও অপরদিকে কোমলতার দোটানায় পড়িয়া সত্যকার দৃঢ়তা ও সরলতা হারাইয়াছে, দেবযানীর অভিযোগগুলি মিথ্যা মনে হয় না, কচ তাহার যে ব্যাখ্যাই করুক। অর্থাৎ কবি মহাভারতের সেই কচ-দেবযানী-উপাখ্যানের মূল তত্ত্বটি উজ্জ্বলতর করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও, এই কবিতায় রবীন্দ্রীয় কাব্যরস অল্প নহে; অতি সূক্ষ্ম মা ন-চিত্রাঙ্কণও যেমন, তেমনই ইহার প্রকৃতি-চিত্রাঙ্কণ অপূর্ব্ব ও অনবদ্য। ভাষার গীতি-র া াচ্ছলতাও রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যাহ্নদীপ্তি ঘোষণা করিতেছে। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় এই যে, ইহা প্রেমের কবিতা হইলেও—ইহার কাব্য-রস উজ্জ্বল করিয়াছে—তপোবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বর্ণনা, তাহাই এই কবিতার অধিকাংশ জুড়িয়া আছে। প্রেমের যত কিছু আকুতি সকলই ঐ তি-চিত্রের পটভূমিকায় এমন গীতিমুখর হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে রসসৃষ্টি হইয়া থাকে প্রধানতঃ দুইটি উপাদানে—এক, মানস-অনুভূতির সূক্ষ্মতা, তাহারই অপরূপ কারুকর্ম্ম; দুই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাবময় ও রূপময় চিত্র; এ কবিতায় ঐ দুই-ই পূর্ণমাত্রায় আছে। বরং এমনও বলা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নর-নারীর চিত্র অপেক্ষা প্রাকৃতিক চিত্রের সৌন্দর্য্যই অধিক— যেমন টেনিসনের কবিতা সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন—

"In Tennyson we have seen the human figrues matter less than the landscape, the 'moated granges' move us more than 'Mariana' herself, 'many-fountained Ida' than 'Ornone's tears'."

[*F. L Lucas*

অবশ্য টেনিসনের প্রকৃতি-প্রেম ও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম একরূপ নহে।

কবিতা পাঠ

আরবার দেখো চাহি, ইত্যাদি। দেবযানী বিশ্বাস করিবে না—নারী-সুলভ বোধ-শক্তির দ্বারা সে কচের দুর্ব্বলতা জানিতে পারিয়াছে।

আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন, ইত্যাদি। মহাভারতের কচ তাহাই বলিবে। এ কচের মুখে ঐরূপ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহার পরের কয়েকটি উক্তি সত্য নহে; অথবা সে জোর করিয়া আপনাকে বুঝাইতেছে!

আহা বিপ্র, বহু ক্লেশে, ইত্যাদি। কৌশলে স্মরণ করাইয়া দিতেছে—সে কত প্রকারে কচের সেবা ও সুখ সম্পাদন করিয়াছে। কথার ভঙ্গি-চাতুর্য্য লক্ষ্যণীয়, দেবযানী যেমন প্রগল্‌ভা, তেমনই চতুরা।

হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়, ইত্যাদি তুলনীয় –

থাকো স্বর্গ, হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী • ...
অতি দীনহীনা
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি।

['স্বর্গ হইতে বিদায়'—চিত্রা।

হেথা সুখ গেলে স্মৃতি একাকিনী, ইত্যাদি তুলনীয়—

"Sorrow's crown of sorrow is remembering
happier things"

—*Tennyson*

বল্লভ ছায়া। 'বল্লভ' অর্থে 'সুখকর'।

এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি, ইত্যাদি। কোন দেবতার মুখে এমন বাক্য সৌজন্য-সূচক মাত্র। কচ নিশ্চয় এতখানি মর্ত্ত্যমমতার বশবর্ত্তী হয় নাই, এমন দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী যে, সে কখনো ঐরূপ ভাবপ্রবণ হইবে না। এই সকল বচনে নাটকীয় কল্পনা অপেক্ষা লিরিক আত্মভাবের প্রাধান্যই অধিক।

অভিনব ব'লে যেন মনে হয়। কবির প্রকৃতি প্রেম, কচও কবির মত কাব্যরস-রসিক।

সুধা হতে সুধাময়…চিক্কণ পিচ্ছল। তপোবন-ধেনুর এই বর্ণনাটি এ কবিতার একটি শ্রেষ্ঠ অংশ; এই পংক্তিগুলিতে উৎকৃষ্ট কবিশক্তির নিদর্শন আছে। পয়স্বিনী গাভীর এমন চিত্র বাংলা কাব্যে, তথা ভারতীয় প্রাচীন কাব্যেও বিরল, অথচ, উহাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রতীক বলিলেও হয়। উহার মূলে—শুধুই প্রকৃতিপূজা বা প্রাণী-বাৎসল্যই নয়—একটি গভীরতর সাত্ত্বিক অনুভূতি আছে, এখানে কবির দৃষ্টিতে তাহা পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে।

তপোবন হইতে বিদায়ের এই দৃশ্য কালিদাসের 'শকুন্তলা'-নাটকের দৃশ্য বিশেষ স্মরণ করাইয়া দেয়।

স্রোতাস্বিনী বেণুমতী—এ নদী কিন্তু বাংলারই নদী।

তুমি সদ্য স্নান করি, ইত্যাদি। কচ নারী সৌন্দর্য্যের পূজারী মাত্র—সে প্রেমিক নয়।

হাতে সাজি ··পূজার লাগিয়া। তুলনীয়—

আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠিছে বাজি।

['রাত্রে ও প্রভাতে'—চিত্রা

অবশ্য, ঐ পূজার কথাটা ঠিক হয় নাই—কল্পনার শৈথিল্য ঘটিয়াছে; কারণ, সেই প্রাচীন যুগে যাগ-যজ্ঞই ছিল, 'পূজা' ছিল না। তপোবনের হোমধেনুও হোমের প্রয়োজনে (ঘৃত প্রভৃতির) পালিত হইত।

জাগায়ে রবে চিরকৃতজ্ঞতা। ইহাই সত্য; প্রেমের কথাই উঠিতে পারে না। কবি যেটুকু অন্তর্দ্বন্দ্ব আমদানি করিয়া কচের আত্মজয়কে মহনীয় করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না।

যদি আনন্দের গীতি, ইত্যাদি। দেবযানী যে সকল সুখ-সম্ভোগের বর্ণনা করিতেছে, তাহা প্রেমিকের নয়—ভাববিলাসী সৌন্দর্য্যরসিকের চিত্তরঞ্জন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রেমের কবিতায় বা প্রেমিক-চরিত্রে এইরূপ ভাববিলাসী রসপিপাসাই প্রেমের স্থান অধিকার করিয়াছে।

সেই কথা মনে কোরো······সুখস্বর্গধামে। তুলনীয়—

"দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্নসম···"

['স্বর্গ হইতে বিদায়'

এ কবিতা যেন অপর কবিতাটির বিপরীত, ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে—'মর্ত্ত্য হইতে বিদায়'।

তারি মাঝে হেন প্রাতঃ···চিররাত্রি চিরদিন। দেবযানী আপন রূপ, ও তাহার সেই হৃদয়-দানকে কচের পক্ষে মহামূল্য ও অবিস্মরণীয় বলিয়া দাবি করিতেছে। প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইলে আহত নারী-প্রাণ এমনই আত্মবিস্মৃত হয় বটে, এখানে সে সেই প্রত্যাখ্যান মানিতেছে না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, কচ তাহাকে ভালবাসে—কিন্তু স্বীকার করিতেছে না, এখনও তাহার আশা আছে।

জানি সখে, ইত্যাদি। কচের ঐটুকু স্বীকারোক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া দেবযানী সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইতেছে—সেই সুপ্ত প্রেমকে উদ্দীপ্ত করিতেছে।

তাই আজ হেন স্পর্দ্ধা রমণীর। কচের হৃদয় সে যে অধিকার করিয়াছে—এ বিশ্বাস তাহার আছে। এইখানে একটি নাটকীয় সন্ধিস্থান আসিয়াছে,—এইবার ঐ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবার পরেই আঘাত আরও প্রচণ্ড হইবে—তাহাতেই সেই অভিশাপ, এবং নাটকীয় পরিসমাপ্তি।

সুখ নাই যশের গৌরবে……কবির স্তুজন। দেবযানীর মুখে এই যে বাক্য—উহা যেন তাহার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়াছে; উহাতেই কচের দেব-মহিমা ও কীর্ত্তি-গৌরব ম্লান হইয়া গিয়াছে। কচ যাহা ত্যাগ করিয়া গেল, এবং যাহার জন্য ত্যাগ করিল—সেই দুইয়ের মধ্যে, সেই প্রেমই যে বড, এই উক্তি আধুনিক মানবিকতার দিক দিয়াও মূল্যবান। অতএব বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত দেবযানী ছোট হইয়া যায় নাই; কচের ঐ ত্যাগ যতই মহৎ হোক, তাহা আত্মনিগ্রহের মহত্ব, সে ত্যাগে সত্যকার আত্মবিসর্জ্জন নাই, আত্মরক্ষাই আছে। প্রেমের আহ্বানে স্বর্গকেও তুচ্ছ যে করিতে পারে, সকল আত্মগৌরবের কীর্ত্তিপিপাসা ভুলিতে পারে—তাহার ত্যাগেই সত্যকার আত্মবিসর্জ্জন আছে। সে প্রেমের অপর নাম—আত্মবিস্মরণ-সুধা। কিন্তু এ কবিতার আদর্শ অন্যরূপ, তাই দেবযানীর ঐ বাক্য তাহার ঐ চরিত্রের সেই কামনা-দুর্ব্বল প্রেমের উপযুক্ত হয় নাই।

শুচিস্মিতে…… .. ..এরি লাগি করেছি সাধনা? এই বাক্যে কচের অকপট স্বীকারোক্তি আছে, সে দেবযানীকে এতটুকু ভালবাসে নাই,—অথচ সেইরূপ একটা সেন্টিমেন্টের কবিত্বও কবিতেছে; আসলে কচের হৃদয়ে সত্যকাব কোন দ্বন্দ্ব ঘটে নাই; মূল মহাভারতেও তেমন কিছুর আভাস নাই; এখানেও কবি কচের আত্মজয়ের একটা ট্র্যাজিক মহত্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেদিক দিয়া কচের কোন মহত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। এতক্ষণ সৌজন্য ও ভদ্রতার খাতিরে সে যেটুকু হৃদয়-বেদনার ইঙ্গিত করিতেছিল, এই বাক্যে তাহাও সে প্রত্যাহার করিল।

সহস্র বৎসর ধ'রে, ইত্যাদি। দেবযানীর কথা যদি সত্য হয়, তবে কচ কায়মনঃ-প্রাণে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে নাই—অথচ ভালও বাসে নাই—কেবল কার্য্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ঐরূপ একটা অভিনয় করিয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের কচ এমন উনবিংশ শতাব্দীয় সৌখীন-হৃদয় কচ হইতে পারে নাই।

লহো সখা, চিনে যারে চাও, ইত্যাদি। একদিকে বিদ্যা, অপর দিকে নারীর প্রেম—বর্জ্জন ও গ্রহণ দুইই দুরূহ বটে। গ্রীক পুরাণের সেই কাহিনী মনে পড়ে—রাজকুমার প্যারিসকে একদিকে বিদ্যাদেবী আথেনী, অপবদিকে প্রেম-দেবতা আফ্রোদিতি মন্ত্রণা দিতেছে। এখানে দেবযানীই আফ্রোদিতি হইয়া কচকে প্রলুব্ধ করিতেছে, যেন—

> She with a subtle smile in her mild eyes… ..
> Half whispered in his ear "I promise thee
> The fairest and the most loving wife in Greece"
>
> [*Œnone* : Tennyson

এবং আরও বলিতেছে—

রমণীর মন সহস্রবর্ষেরি সখা, সাধনার ধন। এই বাক্যটি যেমন একটি নাটকীয় পরিস্থিতি ও চরিত্র উভয়ের সংঘাতে যেন স্ফুলিঙ্গবৎ নির্গত হইয়াছে, তেমনি, উহাতে মানবীয় হৃদয়-ধর্ম্মের একটি বহু-পরীক্ষিত সত্য ভাবে ও অর্থে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; এইজন্য এই

বাক্যটি একটি উৎকৃষ্ট কবিবচন হইবার যোগ্য। বাঞ্ছিতা নারীকে পত্নীরূপে বা আর কোনরূপে লাভ করা যায়; কিন্তু তাহার উপর স্বত্ব-স্বামীত্ব স্থাপন, কিম্বা জীবনে সাথী হইবার সম্মতি-লাভ সম্ভব হইলেও, তাহার 'মন' অর্থাৎ তাহার 'প্রেম' লাভ করা সত্যই একটা মহাসৌভাগ্য, কারণ, উহা প্রার্থনাপূরণ নয়, কোন প্রয়োজনে আত্মসমর্পণও নয়। 'সহস্র বর্ষের সাধনা' অর্থে— 'সাধনার অতীত' বুঝিতে হইবে। 'রমণী'র মহিমা ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

From woman's eyes this doctrine I derive,
They sparkle still the right Promethean fire;
They are the books, the arts, the academes,
That show contain, and nourish all the world.

—*Shakespeare*

কিন্তু এখানে স্বর্গের দেবযানীকে দেবযানী বুঝাইতেছে, সে বুঝিবে কেন? কবির 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটি এই কবিতার পরিপূরক বলিলেও হয়, কেবল, 'কচ' এখানে দেবতা হইয়াও ব্রতধারী. মহাসংযমী। মহাভারতের অর্জ্জুন-উর্ব্বশী সংবাদও স্মরণীয়।

পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, ইত্যাদি। অথচ 'কচ' প্রেমের ব্যথা ভুলিতে পারে না! এ কবিতার উহাই প্রধান দোষ হইয়াছে; কচের হৃদয়ে যে একটা দ্বন্দ্ব থাকা উচিত ছিল—কবিরও তাহাই অভিপ্রায়—যে দ্বন্দ্ব তাহার ঐ আত্মজয়কে মহিমান্বিত করিবে,– সেই দ্বন্দ্ব সত্য হইয়া উঠে নাই।

ধিক্ মিথ্যাভাষী, ইত্যাদি। এইখান হইতে কচকে দেবযানী বড় শক্ত করিয়া ধরিয়াছে। তাহার সমস্ত ছলনা—প্রেমের লোভ অথচ ব্রতভঙ্গের ভয়, চরিত্রের সেই দুর্ব্বলতার জন্য দেবযানীর সহিত চাতুরী—সব তাহার মুখের উপব বলিয়া যাইতেছে। ঐরূপ আচরণের পর এখন তাহার ঐ ধর্ম্মনিষ্ঠা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতা যে একপ্রকার মিথ্যাচার—দেবযানী তাহাই দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বিদ্যাশিক্ষাও যেমন, তেমনই তাহার অবকাশে, দেবযানীর রূপসুধাপান ও সঙ্গসুখ দুইই কচ উপভোগ করিয়াছে, অর্থাৎ দুই কূলই বজায় রাখিয়াছে। কবি অবশ্য ঐ চরিত্রকে আরও মহনীয় করিবার জন্যই এই সকল কথা যোজনা করিয়াছেন; ভাবার্থ এই যে, কঠিন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বা ধর্ম্মপালন সত্বেও কচ হৃদয়হীন ছিল না— সেই হৃদয়ের পিপাসা জাগা সত্বেও সে তাহা দমন করিয়াছে; আজ এই চিরবিদায়ের দিনে সেই হৃদয়কেই সে অসীম শক্তিতে রুদ্ধ করিয়া, একটা মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে চলিয়াছে। কিন্তু এতবড় ব্রত যাহার, এবং যে ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাহার পক্ষে ঐরূপ প্রেমপ্রবণতাই তো নিন্দনীয়, তেমন চরিত্রের গৌরব কোথায়? এমন চরিত্রে ঐরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন গুরুত্ব নাই; দ্বন্দ্বটা ঐ চরিত্রের নয়—উহা কবির কল্পনাগত, সে কল্পনাও দুর্ব্বল। কচের ঐ হৃদয়বিধুরতা একটা ভাববিলাসের চেয়ে গভীর নয়, তাই দেবযানীর ঐ অভিযোগ, এবং ধিক্কার মিথ্যা নহে।

নদীতীরে অন্ধকার·········দীর্ঘ পল্লবের মত। উপমাটি কবির বড় প্রিয়, পূর্ব্বে একাধিকবার আসিয়া পড়িয়াছে; তারও পূর্ব্বে বিহারীলালের কাব্যে উহা ছিল, যথা—

গন্ধ বায়ু ঝুর ঝুর
কাঁপে তরুরেখা ভুরু—
আরামে পৃথিবী দেবী এখনো ঘুমায় রে।

[সাধের আসন, তৃতীয় সং।

হা অভিমানিনী নারী, ইত্যাদি। কচের এই কথাগুলি মূল কাহিনীর সহিত মেলে। কিন্তু অকপট প্রাণে আনন্দ অন্তরে দেবযানীব সন্তোষ-সাধন করিয়া ব্রহ্মচারীর 'দোষ' বা অপরাধ হইবে কেন? তাহার জন্য সে বিধির হাতেই বা শাস্তি পাইবে কেন? এ সকলের অর্থ কি, তাহাতো স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—দেবযানী ঠিকই বলিয়াছে। আবাব ঐ যে "নিতান্ত আমার আপনার কথা"—ইহার অর্থ—প্রেমে দুইয়েব মধ্যে অন্তর বিনিময় অনাবশ্যক, উহা একেরই নিজস্ব সম্পদ, অপরেব তাহাতে কোন অধিকার নাই। ইহাও রবীন্দ্রীয় আদর্শের সেই ব্যক্তিস্বতন্ত্র প্রেম।

তুমি চলে যাবে ·কী রহিল, কিসের গৌরব। তুলনীয়—

Man's love is of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence, man may range
The court, the camp, church, the vessel and mart,
Sword, gown, gain, glory, offer in exchange
Pride, fame, ambition to fill up his heart,
.. .. We but one
To love again and be again undone

[*Don Juan* : Byron

[ঐ শেষের পংক্তিটিও দেবযানীর পক্ষে সত্য হইয়াছিল।]

জীবনের সুখগুলি ··সমস্ত মহিমা। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে এই কয় পংক্তিই উপমায়, কাব্য সৌন্দর্য্যে ও হৃদয়ের লিরিক প্রতি-বেদনে ভাবের চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে —নায়িকা-হৃদয়ের ট্র্যাজেডি উহাতেই পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে।

তোমা-'পরে এই মোর অভিশাপ, ইত্যাদি। এই অভিশাপও দেবযানীর গভীর ও অনিবার্য্য প্রেম বেদনাব পবিচায়ক, উহাও প্রেমেরই ধর্ম্ম।

আমি বর দিনু ইত্যাদি। ঐ চরিত্রের পক্ষে যেমন সহজ, তেমনই সঙ্গত। ঐ বর দেওয়ার অর্থ—প্রথমতঃ সে দেবযানীর ঐ প্রেমকে (কবির মতে ঐরূপ প্রেমমাত্রই) ও তাহার ব্যথাকে খুব গভীর মনে করে না, শীঘ্রই সে তাহা ভুলিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ তাহার নিজের কোন সত্যকার ব্যথা নাই বলিয়া সে অনায়াসে দেবযানীকে ক্ষমা করিতে পারিল, উপরন্তু ঐরূপ মহত্ত্বেব দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ কবিল। কবি অবশ্য দেবযানীর পরবর্ত্তী কাহিনীও স্মরণ করিয়াছেন—যযাতির সহিত তাহার বিবাহ; কচের ঐ বাক্যে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়—'চিত্রা'

'চিত্রা'য় রবীন্দ্রকাব্যের রসধারা মোটামুটি একই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে; কাব্যকল্পনা ও কাব্যকলার দিক দিয়া কেবল এইটুকু প্রভেদ বা বিকাশ লক্ষ্য করা যায় যে, এই কাব্যে কবি নিজস্ব ভাব-জগতে বাস করিয়াও বাহিরের জগৎ-সংসারকে (প্রকৃতিকেই নয়) রসকল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছেন, নিজের সেই ভাবদৃষ্টিতেই বস্তুর রূপ ও রঙকে একটু বিষয়গত ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন; ইহাও 'সোনার তরী'তেই আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে কবি-কল্পনায় যেটুকু Objectivity বা আত্মভাব-মুক্তির পবিচয় আছে, তাহাই কবিশক্তির তথা রসসৃষ্টির উৎকর্ষের কারণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই কবিতাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে—'এবার ফিরাও মোরে' (প্রথমার্দ্ধ); 'সান্ত্বনা', 'নগর-সঙ্গীত', 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুইবিঘা জমি' প্রভৃতি। দ্বিতীয় এক স্তরের কবিতায় আমরা কবির সৌন্দর্য্যধ্যানে একটি গভীরতর স্থিরদৃষ্টির পরিচয় পাই; এই স্তরের কবিতাকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—নিছক কবিস্বপ্ন বা সৌন্দর্য্যধ্যান; দ্বিতীয়, কবির অতিশয় আত্মগত ও আত্ম-সচেতন ভাবনা কল্পনা—নিজ কবিজীবনের ইষ্ট ও তাহার মন্ত্র-জপ; 'সোনার তরী'র 'মানস সুন্দরী' নয়—'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সেই অন্তর-দেবতা আরও স্পষ্ট-রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রথমটির প্রেরণায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম হইয়াছে, যথা,—'বিজয়িনী', 'উর্ব্বশী', 'আবেদন'। কিন্তু এই স্তরের অপরভাগে যে কয়টি কবিতা পড়ে, তাহাতে এই কাব্যে কবি তাঁহার সেই আজন্মের আত্ম-জিজ্ঞাসাকে একটি দৃঢ়তর প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, নিজ কবিজীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নিজেরই অন্তরতব কবিপুরুষরূপে—'জীবন-দেবতা' নামে বন্দনা করিয়াছেন। এখন হইতে আর দুই নাই—অন্ততঃ সেই কল্পিত ব্যবধান নাই, ঐ 'এক'ই দুই-হইয়া লীলা করিতেছে; নিজেকেই 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে কবির আশ্বাসও যেমন, আনন্দও তেমনই। এই 'আমি-তুমি'র যে লীলারসই কবির শেষ জীবনে বহু গান ও কবিতায় উৎসারিত হইয়াছে—তাহার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ এইখানেই আরম্ভ। ঐ ভাবনা নূতন নহে, আদি হইতেই ঐ আত্মজিজ্ঞাসা কবিকে কতরূপে মুগ্ধ ও উৎকণ্ঠিত করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু এই 'চিত্রা' কাব্যেই তাহা একটা স্থায়ী ও সুস্পষ্ট ভাব-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সেই বড-'আমি'টার আশ্রয়ে কবির সাক্ষাৎ কবি-'আমি' তাঁহার আর্টচর্য্যাকেও সর্ব্ব-বন্ধনমুক্ত করিয়াছে। ঐ 'জীবন-দেবতা' অর্থাৎ 'বড়-আমি'র তত্ত্ব পরে রবীন্দ্রকাব্যের বিচিত্র বিকাশে বুঝিয়া লইবার অবকাশ আমরা পাইব।

কিন্তু এ কাব্যে কাব্যকল্পনা ও কবিপ্রাণের উৎকণ্ঠাই কয়েকটি কবিতায় উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি করিয়াছে; তাহাতেও কবির আত্মভাবের (Subjective) ধ্যানধারণা এমন কাব্যগৌরব লাভ করিয়াছে; যথা,—'এবার ফিরাও মোরে', 'প্রেমের অভিষেক', 'মৃত্যুর পরে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'আবেদন' প্রভৃতি। এই কবিতাগুলিও যেমন, তেমনই কয়েকটি উৎকৃষ্ট লিরিক, যেমন—'চিত্রা', 'দিন-শেষে', 'সুখ', 'গৃহশত্রু', '১৪০০ সাল', 'রাত্রে ও প্রভাতে' রবীন্দ্রীয় গীতি-প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হইয়া আছে।

সুখ

[নূতন 'সঞ্চয়িতা'র 'চিত্রা'র নাম-কবিতাটি প্রথমে নাই, অনেক পরে আছে, তার কারণ—কাব্যকে কবির ডায়ারী করিয়া দেখানো হইয়াছে, নহিলে কবিমানসের দৈনিক বিকাশ বুঝিতে পারা যাইবে না! ঐ mood বা মানস-অবস্থার সঙ্গে দিন-ক্ষণের এমনই গূঢ় সম্বন্ধ। কবি সম্ভবতঃ এইরূপ ইতিহাস-রচনার পক্ষপাতী ছিলেন এই কারণে যে, উহাতে কাব্য অপেক্ষা কবিকে—তাঁহার সেই কবি-ব্যক্তির সূক্ষ্মতম পরিচয়কে—পাঠকের চিন্তাগোচর করা হইবে। কিন্তু 'চিত্রা' কাব্যখানির নামকরণ হইয়াছিল ঐ কবিতার দ্বারা। এ কবিতায় কাব্য ও কবি সম্বন্ধে একটি সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে, অতএব অন্য কবিতাগুলির মধ্যে নয়—বাহিরে, এবং সমগ্র কাব্যখানির আরম্ভেই উহার স্থান। যদিও 'সঞ্চয়িতা'র সংকলিত কবিতাগুলিতে মূল কাব্যখানির সেই গঠন ও বিন্যাস-রস রক্ষা করা সম্ভব নয়, তথাপি যতদূর সম্ভব সেই ধারাটি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, একালে রবীন্দ্রকাব্যের পরিচয় মূখ্যত ঐ 'সঞ্চয়িতা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ—মূল কাব্যগুলি অনেকে চোখেও দেখে না।]

বর্ত্তমান কবিতাটিতে কবি এমন একটি ভাব-সত্যকে আমাদের হৃদয় গোচর করিয়াছেন যাহা নিঃশ্বাস-বায়ুর মতই সহজ, সেইজন্যই আমরা তাহা জানিয়াও জানি না। অতি সুপরিচিত পরিবেশে, প্রাকৃতিক শান্তি ও শোভার সুলভ অনুভূতিতে আমরা যে অপূর্ব্ব স্বস্তি অন্তরে লাভ করি, কবি তাহাকেই 'সুখ' বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা সেই সত্যকার সুখ চাই না, বা অনুভব করিবার অবকাশ পাই না; কামনার উদগ্র তাড়নায় মনের সেই ঋজুতা ও প্রসন্নতা হারাইয়া ফেলি—সর্ব্বদাই একটা ক্ষণিক উন্মাদনা, অথবা অতৃপ্ত ক্ষুধার ক্ষণিক পরিতৃপ্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করি—তাহা যত দুর্লভ, ততই উন্মাদকর, কিন্তু যাহা সত্যকার সুখ তাহা যেমন সরল, তেমনই সুলভ।

কবি সেই আনন্দকে একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে—জলস্থল-আকাশের উন্মুক্ত বিস্তারে—কেবলমাত্র ঐ চিত্রটির সাহায্যে আমাদের অন্তরে সংক্রামিত করিয়াছেন। ঐ প্রকৃতি-চিত্র ছাড়া উহাতে আর কিছু নাই; তাহার অনুভূতিমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাহাতেই কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অনুভূতির এতখানি সরলতা,—অর্থাৎ, সূক্ষ্মমানসক্রিয়া বর্জ্জিত ঠিক এই ধরণের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বড় বেশি নাই। ইহাও প্রকৃতি-প্রেম বটে, কিন্তু ইহাতে রবীন্দ্রীয় Sensuousness বা রূপ-রসাবেশ অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় (Wordsworthian) ভাবমন্ত্রই লক্ষণীয়। এমন কি, ঐ যে কয়টি কথা—

মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল…
…পরিব্যাপ্ত বিকশিত,—

উহাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা। সে সম্বন্ধে একজন সমালোচক যাহা বলিয়াছেন তাহাই এই কবিতারও ভাব-বস্তু, যথা,—

The source of joy from which he (Wordsworth) draws in the

true and most unfailing source of joy accessible to man. It is also accessible universally. Wordsworth brings us word therefore—

"Of joy in widest commonalty spread."

অতএব, এমন কথা বলিলে অযথার্থ হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই মন্ত্রটিই অন্তরে গ্রহণ করিয়া তাহাকে এমন একটি কবিতার আকারে ধরিয়া দিয়াছেন। আমরা বাংলা ভাষায় একটি খাঁটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় কবিতা পাইয়াছি।

কবিতা-পাঠ

শিশু-আননের হাসির মতন, ইত্যাদি। এই উপমাটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুভূতির গভীরতা ও উৎকৃষ্ট কাব্যকল্পনার ছাপ আছে। একটি ভাবকে রূপ দিবার—একেবারে মূর্ত্তিদান করার (Personification) এবং তাহার সেই আচরণ-ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত চাক্ষুষ করিয়া তোলা—"উন্মুখ অধরে ধরি চুম্বন-অমৃত চেয়ে আছে সকলের পানে"—ঐ কবিকর্ম্ম কিন্তু Wordsworth-এর নয়—কবি কীটস্‌কে (Keats) স্মরণ করাইয়া দেয়—সেই পংক্তিগুলি (পূর্ব্বে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি)—

And Joy
With his hand ever at his lips
Bidding adieu.

[কবিতার এইরূপ রূপকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ কবিশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সর্ব্ববিধ—এমন কি বিসদৃশ কবিশক্তিরও সমন্বয় হইয়াছে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্যশিল্পের প্রায় সকল কারু কলা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীর বসনখানিতে বুনিয়া দিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর সহিত পরিচয় বাল্যবয়সেই হইয়াছিল—বিহারীলালের কাব্যে তাহার একটা বাংলা প্রতিভাস ছিল; কিন্তু কীটস্‌ ও টেনিসনের কাব্যকলাকেও তিনি আপন বাণী-প্রতিভায় নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন—অবশ্য যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হইয়াছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের বাক্‌-বিভূতি ও কলাকৌশল কোন একজন কবির অনুগামী নিশ্চয় নহে; বাল্য হইতে এই যৌবন পর্য্যন্ত, তাহাতে একদিকে কালিদাস ও বাংলার বৈষ্ণব কবি, অপরদিকে বিহারীলাল, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্‌ ও টেনিসন—এই সকলেরই বাক্যরীতি বা রূপ-রীতি কিছু কিছু মিলিয়াছে। ইংরেজী প্রভাব প্রধানতঃ ঐ তিনজনের; শেলীর ভাববাদ (Idealism) ও সঙ্গীতাবেগ, এবং কীট্‌স্‌ ও টেনিসনের রূপ-রীতি। এই সকলের একটি অপূর্ব্ব মিশ্রণে, রবীন্দ্রকাব্য যেমন একটি অভিনব আর্ট-রূপ ধারণ করিয়াছে, তেমনই ভাব ও ভাবুকতার দিক দিয়া বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। তাঁহার নিজস্ব কবিধর্ম্ম ও কাব্যমন্ত্র যেমনই হৌক, কবিজীবনের এই যৌবন-মধ্যাহ্নে, তিনি তাঁহার সেই স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াও কাব্যের রূপরস-পিপাসায় সর্ব্বভূক হইতে পারিয়াছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাবদৃষ্টি ও তাঁহার কাব্যের প্রকৃতি-চিত্রাঙ্কণে—রঙে, রেখায় না হৌক—অনুভূতিমূলে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়।]

সে সঙ্গীত কী ছন্দে গাঁথিব, ইত্যাদি। উহা অতি সহজ ও সরল বলিয়া, একটু রং

বা অতিরিক্ত বাণী-সৌন্দর্য্য তাহাতে যোগ করিলে সেই অনুভূতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া যায়, সে যেন—"নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।"

এ পর্য্যন্ত কবির কথা বুঝিতে পারা যায়, এমন কি, উহাই যে ভাষায় ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করিবার একটি গুরুতর সমস্যা—যাহা যত সহজ তাহাকে প্রকাশ করা আরও দুরূহ—কবি তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন ও পারিয়াছেন। কিন্তু ইহার পরে "দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে" এবং "কি প্রেমে জীবনে তারে করিব প্রকাশ"—এই যে ভাবনা, ইহা আর সহজ বা সরল নহে। এখানে আর সেই অনুভূতিমাত্রের কথা নাই, কবি রবীন্দ্রের নিজস্ব মানস-উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে।

দিব তারে উপহার ভালোবাসি যারে। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, "আমার হৃদয়ের এই সুখ, কেমন করিয়া তাহাকেও অনুভব করাইব, যাহাকে ভালবাসি বলিয়া একত্রে ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়।"

কঠিন আগ্রহভরে, ইত্যাদি। কবি পুনরায় আপন কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবেগের আতিশয্যই যে সহজকে—সত্যকার আনন্দকে—আমাদের নাগালের মধ্যে আসিতে দেয় না—তাহার কি সুন্দর উপমা-চিত্র!

প্রেমের অভিষেক

কবিতা-প্রসঙ্গ

প্রথম রচনাকালে এই কবিতার রূপ একটু ভিন্ন ছিল, ইহার প্রেরণা মূলে একটু বাস্তবের আঘাতও ছিল, সেই ইতিহাস জানিবার বা সেই কবিতার পরিত্যক্ত অংশ পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই; এই-কবিতায় কবি-জীবনের একটি আত্ম-ঘোষণা আছে, ব্যক্তি জীবনের কোন বেদনা যদি ইহার সাক্ষাৎ প্রেরণা হইয়া থাকে, তথাপি সে বেদনার সেই বাস্তবতা তৎক্ষণাৎ কবির মানসলোকে একটি অপরূপ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই কবিতাটির মূল ভাববস্তু হইয়াছে। ভাবটি এই। সমাজের সাধারণ ব্যক্তি-জীবন কবিকেও যাপন করিতে হয়, কিন্তু সেই সমাজ ও সেই জীবন হইতে কবির অন্তর্জ্জীবন এত স্বতন্ত্র যে, সেখানে তাঁহার অধিকার ও মহিমার সীমা নাই। তার কারণ, সেখানে কবি একটি অপর জগতের, অপর সমাজের অধিবাসী, অমর কবি সমাজের তিনি আত্মীয়। সেই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অমরাবতীতে অবাধ অধিকার লাভ করিয়াছে যে, তাহার মত মুক্ত, স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ কে? কোন পার্থিব সাম্রাজ্য কি সেই সাম্রাজ্যের সমান হইতে পারে? সেই সম্রাটপদে কবিকে অভিষেক করিয়াছেন নিখিলের কাব্যলক্ষ্মী, যেহেতু, সেই অধিকার—সেই কবিত্ব-সম্পদ, সেই দৈবী-প্রতিভা কেহ নিজ শক্তি, বুদ্ধি বা তপস্যার জোরে অর্জ্জন করিতে পারে না—সে যেন প্রেমের অভিষেক, কাব্যলক্ষ্মী নিজে যাহাকে বরণ করেন সে-ই তাহা লাভ করে, অতএব, ঐ সৌভাগ্য

অতিশয় দুর্লভ। তাই তাহার এত গৌরব। একমাত্র কবিরাই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অমর-বীণার ঝঙ্কার তাহাদের প্রাণ-কর্ণে শুনিতে পায়—

সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।

—ইহাই কবির আত্মমহিমা-বোধের সবচেয়ে বড় কারণ। শুধু তাহাই নয়, সকল কালের সকল কবি কাব্যলক্ষ্মীর সেই একই প্রসাদ লাভ করিয়া যে কাব্য-জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছে—সেখানে সকলের সমান অধিকার; অর্থাৎ সে প্রেম, সে সৌন্দর্য্য যে কোন অপর কবি যেমন উপভোগ করে, তেমন অ-কবিরা করে না; এই অর্থে, নিখিল কাব্য-জগৎ কবিমাত্রেরই নিজস্ব, যেখানে যাহা কিছু কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে তাহা যেন নিজেরই সৃষ্টি, সর্ব্বত্র সেই এক কাব্যলক্ষ্মীর সহিত কবির মিলন হয়, সকল বীণায় সকল গান সেই মিলনেরই গান।

এই কবিতায় কবি 'প্রেমের অভিষেক' বলিতে যে ভাব, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন তাহার বীজ বিহারীলালের এই পংক্তি কয়টিতে ছিল, যথা—

তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার!

[পূর্ব্বে দেখ]

[কবি-রবীন্দ্রের কবি-আত্মার প্রথম দীক্ষালাভ যে কাহার কাব্যমন্ত্রে হইয়াছিল, তার প্রমাণ আরও কত চাই? ভক্তগণ কিন্তু বিহারীলালকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চান, এমন কি রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে তাঁহার নামটার উল্লেখ করাও একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন।]

এ কবিতায় কবির যে কবি-গৌরব ঘোষিত হইয়াছে তাহার অনুরূপ কবিগৌরব-গাথা এক ইংরেজ কবি রচনা করিয়াছেন, দুই কবির দাবি একরূপ না হইলেও, প্রেরণা একই, অর্থাৎ কবিপ্রতিভার মাহাত্ম্য-ঘোষণা, বাহিরের কোন ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব বা অপরবিধ কীর্ত্তি মহিমা না থাকিলেও কবি কাহারও চেয়ে ক্ষুদ্র নহেন, বরং এক হিসাবে সকলের উচ্চে; মানুষ কর্ম্মবীর ও শক্তিমানের জয়ঘোষণা করে, কবির সেই গৌরব পূরাপুরি স্বীকার করিতে চায় না। কোন কীর্ত্তিতৃষা বা সাম্রাজ্যজয়ের লালসা কবির নাই—সেইরূপ কাঙালপনা বা মনের দৈন্য নাই বলিয়াই কাব্যলক্ষ্মীর সেই সকল পিপাসাহরা প্রেম তাঁহাদের সকল দৈন্য হরণ করিয়াছে বলিয়াই ফারসী কবি হাফেজ বলিতে পারিয়াছিলেন—"আমার প্রিয়ার গালের ঐ তিলটির বদলে আমি বোখারা-সমরখন্দের রাজপাট বিলাইয়া দিতে পারি।" কিন্তু ঐ ইংরেজী কবিতাটির সহিত (O'Shaughnessy-এর বিখ্যাত 'Ode') তুলনা করিলেই দুই কবির মানসধর্ম্ম কেমন পৃথক তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। একটিতে কবির নিকটে মানব-সমাজের ঋণের কথা আছে—কবি যে মানব-ইতিহাসের কতবড় তন্ত্রধার তাহারই ঘোষণা আছে—

We are the music-makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams—

World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.
[*Ode*—Arthur O'Shaughnessy

—সেই জীবনে কবির নেতৃত্ব ও ঋষিত্বের কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাহিরের মানব-সমাজের সহিত কবির সকল সম্পর্ক অস্বীকৃত হইয়াছে—তিনি একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র মানব-রাজ্যের অধীশ্বর। যে প্রেমের অভিষেকে তিনি সম্রাট-মহিমা লাভ করিয়াছেন সে তাহার কাব্যলক্ষ্মীর প্রেম, সেই কাব্যলক্ষ্মীকেই তিনি পরবর্ত্তী কবিতায় ('এবার ফিরাও মোরে') 'বিশ্বপ্রিয়া', 'সৌন্দর্য্য-প্রতিমা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'সোনার তরী'র 'মানসলক্ষ্মী'তে যাহার বন্দনা আছে, এখানে কবি তাহার প্রেমের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাই কবি-মহিমা। লোকে তাঁহার বাহিরের ব্যক্তি-জীবনকে যতই ক্ষুদ্র মনে করুক—

"এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজী
না তাকায় মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর" ইত্যাদি।

ইহাই কবির সেই কবি-'আমি'র আরাধ্যা বিশ্বসৌন্দর্য্যরূপিণী মানসলক্ষ্মী। বিহারীলালের সারদা-স্তুতির মত, রবীন্দ্রনাথ ইহাকে তাঁহার কবিজীবনের বিভিন্ন সোপানে কত নামে স্তুতি করিয়াছেন, এই 'চিত্রা' কাব্যে তিনিই হইয়াছেন কবির 'জীবন-দেবতা'। বিহারীলালও তাঁহার 'সারদা'কে এক এক ভাবের আবেশে এক এক রূপে দেখিয়াছেন; তফাৎ এই যে, তাঁহার ছিল সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ বা আত্মনিমজ্জনের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের ঐ অন্তর-দেবতা তাঁহার আত্মচেতনাকেই উদ্বুদ্ধ ও আশ্বস্ত করে। এই কবিতাতেও কবির সেই ব্যক্তি-স্বতন্ত্র সাধনার জয়ঘোষণা আছে।

কবিতা-পাঠ

নিভৃত সভায়...বিশ্বের কবিরা মিলি। তুলনীয়—

মাঝে মাঝে মনে হয়, শত কথা ভারে
হৃদয় পড়েছে যেন নুয়ে একেবারে।
যেন কোন্ ভাব-যজ্ঞে বহু আয়োজনে
চলিতেছে অন্তরের সুদূর নন্দনে।

*   *   *

মনে হয় কত ছন্দ, কত না রাগিণী
কত না আশ্চর্য্য গাথা, অপূর্ব্ব কাহিনী,
যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে
সব মিলিতেছে আসি' অপূর্ব্ব-মিলনে।

['শেষ কথা'—চৈতালি

প্রেমের অমরাবতী, ইত্যাদি। এইখান হইতে প্রাচীন কাব্যের সৌন্দর্য্য-প্রতিমা-গুলির ("Brides of ancient song") প্রেম বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রেম অপেক্ষা প্রেমের সৌন্দর্য্যচিত্রগুলিই কবির পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে।

হাত ধ'রে…সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি, ইত্যাদি। সেই সৌন্দর্য্য কবি-মানসের মহার্ঘ রাজবসন; অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের পূজারী বলিয়াই কবির ঐ গৌরব।

তব স্পর্শ, তব প্রেম, রেখেছি যতনে, ইত্যাদি। তুলনীয়—'মানসসুন্দরী'। এ প্রেম যে নিছক সৌন্দর্য্য-প্রেম তাহাতে সন্দেহ নাই।

রেখেছে যেমন সুধাকর, ইত্যাদি। সেই পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভট কল্পনা কেমন নূতন অর্থে আধুনিক কবি-কল্পনার সহায় হইয়াছে!

দেবতার গুপ্ত সুধা। সমুদ্রমন্থন-কাহিনী স্মরণীয়।

বিধাতার পুণ্য অগ্নি, ইত্যাদি। বৈদিক ধর্ম্মে ঐ অগ্নিই ছিল সর্ব্ব কর্ম্মের বা যাগ-যজ্ঞের সহায়; ঐ যজ্ঞই বিধাতার সৃষ্টি-কর্ম্মের প্রতীক, ঋষিদেব ঐ অগ্নির মতই সূর্য্যই বিধাতার সৃষ্টিযজ্ঞের অগ্নি। সূর্য্যের তাপ বা অগ্নিই জীবজগতের প্রাণাগ্নি—ইহাও স্মরণীয়।

কমলার চরণকিরণে, ইত্যাদি। এই বিশেষণ-বাক্যটি আকাশের মহিমা-জ্ঞাপক মাত্র। 'কমলা' অর্থে লক্ষ্মী বা সৌন্দর্য্যের দেবতাই বটে; "অনন্ত গগনের অনন্ত ললাট" তাঁহার চরণ-কিরণের হার পরিয়াছে, অর্থাৎ জ্যোতিষ্কমালায় ভূষিত হইয়াছে—সমস্ত আকাশ তাঁহারই চরণ-কিরণে আলোকিত হইয়াছে। এ কল্পনা কবিত্বময় বটে, চিত্রহিসাবেও সুন্দর—কিন্তু মূল ভাবসূত্রের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

এবার ফিরাও মোরে

কবিতা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রকাব্যের একটি অতি জনপ্রিয় কবিতা। কবিতাটি জনপ্রিয় হইবার কারণ—উহার ঐ প্রথমাংশে কবি এ দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী গভীর আবেগে ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—উহার কয়েকটি পংক্তি নিত্য উচ্চারিত হইবার মত, যথা—

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী" ইত্যাদি।'

পরে—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;…
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু

—শুনিলে মানুষ মাত্রেরই হৃদয় সাড়া দেয়, মনুষ্যত্ব-পিপাসা জাগে। ইহাতে কবির আত্মকথাও আছে;(তিনি তাঁহার নির্জ্জনবাসিনী আত্মমুগ্ধা কল্পনাকে জনতা-জীবনের দিকে ফিরাইবার জন্য কবিতা-লক্ষ্মীর নিকটে ঐ আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন—'এবার ফিরাও মোরে'; অর্থাৎ ব্যক্তিগত আদর্শের সেই সজ্ঞান সাধনায় তিনি নিজেও মাঝে মাঝে বড় কুণ্ঠা বোধ করেন; তাঁহার জ্ঞান যেন উচ্চ ভাব-সাধনাতেই নিঃশেষ না হয়—বাস্তব-জীবন-সংগ্রামে তাহা যেন মানুষের প্রাণে আশা উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করে।) কিন্তু ঐ কবিতাতেই আমরা দেখিতে পাই, এ প্রবৃত্তি তাঁহার কবিতার পক্ষে সম্ভব নয়; (তাঁহার সেই অন্তরের প্রেরণা অতি শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যায়; কিয়ৎক্ষণ মাত্র উহার মধ্যে থাকিয়া, তাঁহার কবিতা আবার সেই ব্যক্তি-স্বপ্ন, সেই লোকাতীত ভাব-স্বর্গ, সেই 'বিশ্বপ্রিয়া' ও 'নিরুপমা সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী'র ধ্যানে এই ধরা ছাড়িয়া উর্দ্ধগামিনী হয়। কোথায় সেই বাস্তব জগতের বাস্তব-দুঃখের প্রতিকার-বাসনা, আর কোথায় সেই সুদূর বিশ্বাকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কেবল আত্মগত আদর্শের—সেই সৌন্দর্য্য-ধ্যান ও সত্যনিষ্ঠাভিমানের জয়যাত্রা!—)

> মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।...
> ...যাব অভিসারে
> তার কাছে—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি।

"সম্মুখেতে যে কষ্টের সংসার" রহিয়াছে তাহার দুর্গতি নিবারণ করিতে হইলে—তাহাদের সম্মুখে তখনই ঐ খ্রীষ্ট, চৈতন্য, গ্যালিলিও, লুথারের আদর্শ স্থাপন করিলে, অথবা, 'জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে'—সেই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর সাধনমন্ত্র উচ্চারণ করিলে, নিশ্চয়ই সেই দুর্গতদের উদ্ধার সাধন হইবে না।) বরং একটি এই সহজ সত্যই আমরা জানি যে, (মানুষের দুঃখমোচন ব্রত যিনি গ্রহণ করেন) তাঁহার কাছে এই প্রত্যক্ষ নর-মূর্ত্তি ছাড়া আর কোন নারায়ণ থাকিতে পারে না; (তাঁহার কাছে বিশ্বমানব, বিশ্বজীবন বা বিশ্বপ্রিয়া একটা অতিশয় আত্ম-পরায়ণ (Egoistic) কল্পনা-বিলাস মাত্র। তেমন মানুষের একমাত্র প্রার্থনা এইরূপ—

> নত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
> কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কবিতাটি পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া সহসা মধ্যপথে পশ্চিমমুখে ফিরিয়াছে। অর্থাৎ যে দিকে ছিল সেই দিকেই ফিরিয়াছে, কবির ঐ আবেদন তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মী মঞ্জুর করেন নাই।

(এই দীর্ঘ এবং গভীর আবেগময়, কবিত্বপূর্ণ কবিতাটিতে সেই এক মহৎ দোষ ঘটিয়াছে—প্রেরণার দ্বৈধ বা বিরোধ ঘটিয়াছে; এজন্য উহা একটি সুডৌল, সুসম্পূর্ণ, আদ্যন্ত-সঙ্গত রস-মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। এ কবিতায় তাহার কারণ আরও লক্ষণীয়; কবি-রবীন্দ্র কিছুতেই সাধারণ মানব-সংসারের, বাস্তব-জীবনের বাস্তব নিয়তিকে তাঁহার সেই একান্ত আত্মগত ভাবনায় ও কবিধর্ম্মে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, করিলে তাঁহার কবি-জীবন ও কাব্য-সাধনা মিথ্যা হইয়া যাইবে।)

কবিতা-পাঠ

আগুন লেগেছে কোথা…লুকাইছে ছদ্মবেশে। মনে হয়, কোন এক সময়ে তদানীন্তন রাজশক্তির অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার দর্শনে, কবির মন সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পরে, তিনি কোন একটা ঘটনাই নয়—সমগ্র শাসন-নীতির ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন,—বিদেশী, বিজেতা রাজার জাতি, এদেশবাসীর নিরীহতা, দুর্ব্বলতা ও উপায়-হীনতার সুযোগ লইয়া, একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। 'কার শঙ্খ' অর্থাৎ 'বিধাতার রোষ'; 'জগৎজনে'—সর্ব্বজনে, সকল দেশবাসীকে; 'অনাথিনী'—'পরাধীনা মাতৃভূমি।'

স্ফীতকায় অপমান। 'অপমান' অর্থে অপমানকারী; ভাষার রীতি বাংলা নয়—ইংরেজী, যেমন—

"Or Flattery soothe the dull cold ear of Death"

[Gray's Elegy

'স্বার্থোদ্ধত অবিচার'—ঐ এক রীতি।

ভীত ক্রীতদাস লুকাইছে ছদ্মবেশে। প্রভুর প্রসাদজীবী ব্যক্তিগণ নিজ দেশ-বাসীর সহিত আত্মীয়তা-সম্বন্ধ অস্বীকার করিতেছে; প্রভুদের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাহাদেরই সমর্থন করিতেছে।

ঐ যে দাঁড়ায়ে নতশির, ইত্যাদি। ইংরাজ-শাসনে স্বদেশীয় সমাজের দুর্গতির এমন চিত্র বাংলা ভাষায় আর কোথাও নাই। কবি-রবীন্দ্রের ভাবোদ্দীপনা ও অনুভূতির গভীরতার ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন; ঐ অনুভূতি যেমন তীব্র তেমনই বাস্তবাশ্রয়ী। এ কবির স্নায়ুমণ্ডল অতিশয় সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই কোন mood বা ভাবাবস্থার কালে, সময়ে সময়ে তাঁহার সারা চিত্তভূমি যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তাই এখানে সেই বেদনা এমন বিস্ফুরিত হইয়াছে। সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে ঠিক এই ধরণের হৃদয়-মুখরতা আর কোথাও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ; অন্যত্র অনুভূতি তীব্র হইলেও এমন 'শোণিত-রাঙা' হইয়া উঠে নাই, এবং কল্পনাও এমন অনুভূতিকে অতিক্রম করে নাই।

ডাকিয়া বলিতে হবে, ইত্যাদি। এই যে বাণী, ইহা বীণার ঝঙ্কার নয়—পাঞ্চজন্যের নিনাদ। কবিগণের ইহাও একটা বড় কাজ, জনগণকে উদ্বোধিত করা। স্মরণীয়—শেলীর সেই উক্তি—

"Poets are the trumpets which sing to battle...Poets are the unacknowledged legislators of the world."

যার ভয়ে ভীত তুমি, ইত্যাদি। একটি বড় সত্য; ভয়ই মানুষকে ঐ সত্যের সাহস ও শক্তি হইতে বঞ্চিত করে। অন্যায়কারীর মত কাপুরুষ আর নাই—তাহার ঐ সাহস একটা দম্ভ মাত্র, অপর পক্ষের ভীরুতাই সেই দম্ভের কারণ।

কবি, তবে উঠে এসো, ইত্যাদি। ইহাও কবিদের একটি বড কাজ, উপরে উদ্ধৃত শেলীর বচন দ্রষ্টব্য। আরও এক কবি বলিয়াছেন—

One man with a dream of pleasure,
Shall go forth and conquer a crown ;
And three with a new song's measure
Can trample a kingdom down.

[*Ode*—Arthur O'Shaughnessy

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, ইত্যাদি। ইহাই মানুষের স্বভাবদত্ত অধিকার উহাদের একটিরও অভাব ঘটিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়—সমগ্র মানব-পরিবার অসুস্থ হইয়া উঠে।

এ দৈন্য মাঝারে কবি…বিশ্বাসের ছবি। ঐ বিশ্বাস একটা বড় তত্ত্ব—উহাই সেই আত্মবিশ্বাস ; সেই বিশ্বাসই শক্তি, তাহাই ন্যায় এবং সত্যকে জীবনে জীবন্ত করিয়া তোলে, ঐ বিশ্বাসই সেই বল যাহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। 'স্বর্গ হ'তে' কারণ উহা দেহ সংস্কারের ঊর্দ্ধে বিরাজ করে—মনের যুক্তি-তর্কের দ্বারাও উহাকে লাভ করা যায় না। দেহের ধর্ম্ম—ভয়, অবিশ্বাস, দীনতা, প্রভৃতি। এ বিশ্বাস আত্মার ধর্ম্ম। সমস্ত জগৎ যে একটা ন্যায়-বিধানের (moral order) উপরে প্রতিষ্ঠিত মানুষ যখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারে, তখন তাহার সাহস ও শক্তির সীমা থাকে না ; সে যেন একটা দিব্য-চেতনা, তাই তাহা স্বর্গের দান।

এবার ফিরাও মোরে, ইত্যাদি। অর্থাৎ কবির কল্পনা-কুঞ্জ হইতে বাস্তব মানব-সংসারে। পরবর্ত্তী পংক্তিগুলিতে কবি তাঁহার একান্ত আত্মমুখী সাধনার জন্য লজ্জা ও অনুশোচনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবি কীটস্‌ও (Keats) একদা মানব-সাধারণের হৃদয়-ধর্ম্ম এবং আপন কবি-স্বপ্নের বৃথা অভিমান স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলেন—

"They seek no wonder but the human face !'

কবি রবীন্দ্র আপন কবি-স্বভাবের এই ত্রুটি স্বীকার করিয়াও, এমন কি স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের সেই কবি-স্বপ্নকেই শেষে আরও আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। 'কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে, ইত্যাদি। কবিতার এই শেষার্দ্ধে কবি বাস্তব জগৎ ভুলিয়া একেবারে তাঁহার নিজেরই সেই ভাবস্বর্গে স্বপ্নপ্রয়াণ করিয়াছেন। ঐ অত্যাচার-পীড়িত অন্নহীন, দুর্ব্বল, দুর্গত জনগণকে তিনি সত্যের জন্য সর্ব্বস্বপণ, সুস্থ ও সবল আত্মার পথ্য যাহা, সেই আত্মবিসর্জ্জনের মহিমা, এবং শেষে জগৎ-সংসার ও মানব সমাজ বিস্মৃত হইয়া, সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনা ও সাধন-মন্ত্রের সৌন্দর্য্য প্রতিমা ও তাহার সহিত চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আশ্বাসের কথা শুনাইয়াছেন। সেই 'মূঢ় ম্লান মুখ' সর্ব্বজন, খ্রীষ্ট বুদ্ধের মত, সত্য ও সুন্দরের দুর দুর্গম পথে যাত্রা করিবে। ইহাই হইল তাহাদের আশু দুঃখ নিবারণের উপায়। ইহাও অনেকটা সেই কাহিনীর মত :—দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের রুটি জোটেনা শুনিয়া ফরাসী-দেশের রাণী নাকি বলিয়াছিলেন, "কেন রুটির পরিবর্ত্তে তাহারা তো কেক খাইতে পারে !" বাকি পংক্তিগুলির পৃথক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মৃত্যুর পরে

কবিতা-প্রসঙ্গ

ইংরেজী কাব্যে মৃত্যুর পরে এইরূপ শান্তিপাঠের কবিতা-রচনা একটা সুন্দর রীতি হইয়াছে, তার কারণ, খ্রীষ্টিয় অন্ত্যেষ্টিপ্রথার উহা একটা অঙ্গ, মৃতের উদ্দেশ্যে ঐরূপ শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, যেমন—'Requiescat in peace,' অর্থাৎ 'May his soul rest in peace' (ইহার আত্মা যেন শান্তি পায়)। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ সেইরূপ কবিতার আদর্শে বাংলায় এমন একটি নূতন ভঙ্গির কবিতা লিখিয়াছেন—উহা যে কবিকল্পনার বড়ই উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই; রবীন্দ্রনাথ উহাকেই নিজস্ব ভাবনার বাহন করিয়াছেন।

এই কবিতার ভাববস্তু এই। জীবনে, মানুষের যে পরিচয় আমরা পাই তাহা খণ্ড ও অসম্পূর্ণ, তাই তাহা তুচ্ছ, মৃত্যু সেই তুচ্ছতার আবরণ খুলিয়া দিয়া, দেশ, কাল ও পাত্রের সীমা ঘুচাইয়া, মানুষের আত্মাকে অসীমের সহিত এক করিয়া দেয়। জীবনে আমরা তাহাকে যেমন জানিতাম সে তেমন নয়, তাহার সেই পাপ-পুণ্য, দোষ-ত্রুটি যতকিছু হিসাব সবই মিথ্যা। মৃত্যুর পরে সেই মানবাত্মা দেহের সকল কলঙ্ক মুক্ত হইয়া যে একটি নির্ম্মল নির্ব্বিশেষ সত্তা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত এই জীবিত আমাদের শত্রু-মিত্র কোন সম্বন্ধই আর থাকে না; প্রেমেই হোক, আর অপ্রেমেই হোক, আমরা আত্মার সেই বিশালতাকে কোথাও কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারি না। অতএব মৃত্যুকে গালি দিও না; মৃত্যু অভিশাপ নয়, বরং সে-ই সকল মিথ্যা-সংস্কার ছিন্ন করিয়া মানবাত্মাকে তাহার সেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে, জীবনের জ্বর ও যতকিছু গ্লানির মৃত্যুতেই অবসান হয়—আত্মার পূর্ণ-মুক্তি ঘটে—

সকল অভ্যাসছাড়া সর্ব্ব আবরণ-হারা
সদ্য শিশু সম।
নগ্নমূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম।

—কবি ইহাই ভাবনা ও কল্পনা করিয়াছেন।

মৃত্যুর সম্বন্ধে এই যে ভাবনা ইহাতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিধর্ম্ম-মন্ত্র যেমন, তেমনই তাঁহার কবিশক্তির একটি বিশেষ প্রকাশ আছে। ঐ শ্লোকগুলির ভিতর দিয়া যে একটি করুণ অথচ বৈরাগ্য-গম্ভীর সুর রহিয়াছে, তাহাতেই কবিতার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উহাতে, এক দিকে যেমন প্রাণের ঐ মানবীয় আকুতি—সংশয় ও শূন্যতাবোধ, অপরদিকে কবির ঐ চিন্তাগুলি শোক বা সান্ত্বনা কোনটাকেই অনুভূতি-গভীর করিয়া তোলে না। তার প্রধান কারণ—ঐ মৃত আত্মীয় বা পরম প্রিয়জন 'হৃদয়ের ধন' না হইয়া একটা সর্ব্ব সম্পর্কহীন 'আত্মা' বা 'অনন্তের ধন' হইয়া উঠে—তাহা মানবীয় সংস্কারের বিরোধী। উহা যোগী-সন্ন্যাসীর মত তত্ত্ব-চিন্তা—অতিশয় নীতিজ্ঞানমূলক আধ্যাত্মিক গবেষণা। শেষ পর্য্যন্ত একটা শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই প্রাণকে তৃপ্ত বা আশ্বস্ত না করিয়া সূক্ষ্ম ভাবুকতার তৃপ্তি সাধন করে।

এমন হইবার কারণ, কবির সেই সংসার-বিমুখ অত্যুচ্চ ভাববাদের অভিমান। ব্যক্তির

উপরে অব্যক্ত, সীমার মধ্যে অসীম, জীবনেব উপরে মহাজীবন বা বিশ্বজীবন—ইহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্র। উহাই কবিব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটা বড় আশ্রয়। সামাজিক বাস্তব ও দেহ জীবনের এবং তৎসংক্রান্ত যতকিছু প্রবল হৃদয়াবেগ কবিকে কখনো সেই আত্মভাবসাধনা হইতে বিচ্যুত কবিতে পাবে নাই। এখানেও সেই ব্যক্তি আত্মা, মানুষেব সেই একান্ত আত্মগত, সংসার ও সমাজেব সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত Individual Self-এব মাহাত্ম্য-ঘোষণা আছে—'মানসী'ব 'নিস্ফল কামনা'য় ঠিক এই কথাই আছে, এই কবিতাটিতেও কবিব সেই এক 'আত্মদর্শন' ঐ মুক্তিচিন্তায অনুস্যূত হইয়া আছে। যে কবি প্রেমেব ও আত্মার স্বাধীনতা বা সর্ব্ববন্ধনমুক্তি দাবী কবেন, তিনি যে মৃত্যুকেও ঐরূপ মহিমাদান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি?

কিন্তু ভাব ও তত্ত্বের মূল্য যেমনই হোক, কবিতাটিব প্রেবণামূলে যে দ্বৈব যে কাবণেই থাকুক, উহার ঐ সুব আব ঐ ভাষা অপূর্ব্ব। ববীন্দ্রকাব্যে ভাষা ও ছন্দেব ঐ সঙ্গীত-বস সর্ব্বত্র আর সকলেব উপবে। উহাবই একটা পৃথক আবেদন আছে, ভাবের সমগ্রতা-বোধ না জাগিলেও পাঠক-চিত্তে ঐ সুবই তাহাকে ঢাকিয়া বাখে। ববীন্দ্রনাথেব 'আত্মদর্শন' ও তাঁহাব কবিশক্তিব সেই যাদু—এই দুইয়েব সম্পর্ক কিরূপ তাহাও এই কবিতায় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গক্রমে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেব একটি বিখ্যাত কবিতা স্মরণ কবা যাইতে পাবে। কবিতাটিতে কবি ঐ 'মৃত্যু' সম্বন্ধেই নানা মানুষের নানারূপ চিন্তা ও মুখব ভাষণকে সংযত করিতে চাহিয়াছেন, ববীন্দ্রনাথেব এই কবিতাও তাহাব মধ্যে পড়ে কি না—দুই কবির মধ্যে সে বোঝাপড়া হউক, আমি কেবল কাব্যপাঠেব অনুষঙ্গ হিসাবে তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত কবিলাম।—

Art thou a statesman, in the van
Of public business trained and bred?
First learn to love one living man,
Then may'st thou think upon the dead.

*   *   *

Physician art thou? One, all eyes,
Philosopher, a fingering slave,
One that would peep and botanise
Upon his mother's grave?

*   *   *

A moralist perchance appears
Led, Heaven knows how; to this poor sod,
And he has neither eyes nor ears,
Himself his world, and his own God.

[*Poet's Epitaph*

কবিতা-পাঠ

প্রথম হইতে চতুর্থ স্তবক পর্য্যন্ত মৃত্যুশয্যার বর্ণনা। পঞ্চম হইতে অষ্টম স্তবক পর্য্যন্ত মানুষের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ ভাবনা বা জিজ্ঞাসা আছে—খুব নূতন নয়, কিন্তু স্বাভাবিক। নবম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত—ভাবনার গতি অন্য দিকে ফিরিয়াছে। কবি আপনার মনোগত বা মনোমত একটি চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুকে জীবন অপেক্ষা সুবিচারক বা মহত্তর জ্ঞানের উন্মেষক বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ স্তবক হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত—কবি মানবাত্মার অনন্ত স্বরূপকে ধ্যান করিয়াছেন; সকল মায়া-মমতা, জীবিত-দশায় যতকিছু আত্মীয়-পর সম্পর্ক ও তজ্জনিত রাগ-দ্বেষ যে অর্থহীন, সেই 'অনন্তের ধন'কে বুকে বাঁধিতে যাওয়া যে কি বিমূঢ়তা—তাহাই দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ স্তবকে পুনরায় মনুষ্য-হৃদয়ের সেই অবুঝপনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কাতরতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। সর্ব্বশেষ স্তবকে বৈরাগ্যই শেষ আশ্রয় হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক। রাত্রিদিন ধুকধুক, ইত্যাদি। তুলনীয়—

Her life was, turning turning
In mazes of heat and sound ;
But for peace her soul was yearning,
And now peace laps her round.

[*Requiescat* : M. Arnold

যতকিছু ভাল মন্দ, ইত্যাদি। উভয় পক্ষে; জীবিতদেরও তাহার সম্বন্ধে সকল ভাবনা শেষ হইয়াছে, মৃতেরও তাহার জীবদ্দশার সেই সকল হিতাহিত, কর্ত্তব্য চিন্তা ও নানা সমস্যার অবসান হইয়াছে।

যদি কোথা থাকে লেশ, ইত্যাদি। 'জীবন-স্বপ্নের' শেষ—তুলনীয়—

After life's fitful fever, he sleeps well.

[*Macbeth*

করুণ মরণ যথা, ইত্যাদি। জীবনই অকরুণ, মরণ তাহার তুলনায় কত স্নেহময়! মৃতের মুখ দেখিয়া এই যে অনুকম্পা—ইহাই এ কবিতার শ্রেষ্ঠ রস।

তৃতীয় স্তবক। ইহার ঐ একটি পংক্তিতে—শুধু ওই আঁখি 'পরে ইত্যাদি।—অনুভূতি-কল্পনার অপূর্ব্ব কাব্যরস আছে। মরণ-নিদ্রায় নিদ্রিত যে চক্ষু তাহাতে আলোকের—জীবন-চেতনার—রূঢ়-আঘাত নাই; চোখে ওই যে অন্ধকার নামিয়াছে—মরণ যেন স্নেহভরে সেই আলোকের উপরে ঐ আবরণ টানিয়া দিয়াছে। উপমায় এবং অর্থে বাক্যটি যেমন আবেগ-গভীর, তেমনই কবিত্বময়।

চতুর্থ স্তবক। মিছে আনিয়াছ আজি, ইত্যাদি। বিলাতী প্রথা; এখন আমাদেরও প্রথা হইয়া উঠিয়াছে।

ছিলে যারা রোষভরে,…করিছ মার্জ্জনা। এই পংক্তিগুলিতে আত্মীয়-বিয়োগের মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ আছে। Washington Irving-এর 'Sorrow for the Dead'-শীর্ষক রচনাটি এই প্রসঙ্গে পঠনীয়। কিন্তু পরবর্ত্তী পংক্তিটি 'অসীম নিস্তব্ধ দেশে' ইত্যাদি—অতিউচ্চ ভাবুকতায় মণ্ডিত হইয়াছে; কথাটা জীবিতের পক্ষে একটা রূঢ় আঘাত। যেন তাহাদের উপরে সেই মৃতজন একটা বড় জয়লাভ করিয়াছে, সে আর তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। ইহার পরিবর্ত্তে বরং এমন কথাই আরও সুন্দর ও মহৎ হইত যে, আজ তাহার মুক্ত আত্মা তোমাদের সকল ত্রুটি সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে, তাহার মনে আর কোথাও কোন দাগ নাই। কিন্তু যেহেতু দেহের সহিত, সেই প্রাণটাকেও সে আর বহন করে না, অতএব সে প্রয়োজনও তাহার আর নাই। 'অসীম নিস্তব্ধ দেশে অনন্ত সান্ত্বনা'—অর্থাৎ, দেশকালাতীত অবস্থায় "সর্ব্বসুখ-দুঃখের অবসান।" তুলনীয়—

Her cabin, ample spirit,
It fluttered and foiled for breath;
To-night it doth inherit
The vasty hall of death

[M. Arnold

পঞ্চম স্তবক। একটা আগন্তুক চিন্তা, হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। পরে আবার পূর্ব্ব চিন্তার জের চলিয়াছে।

এখনি কি দুঃখ সুখে, ইত্যাদি। কবির নিশ্চয় গীতার সেই শ্লোকটি মনে পড়িয়াছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

—এমন চিন্তা করিতে অবশ্য ভয় হয়। রবীন্দ্রীয় ভাবসাধনায় বিবর্ত্তন-বাদ আছে—ঐরূপ জন্মান্তরবাদ কোথাও নাই।

সপ্তম স্তবক। চিন্তাটি নিতান্ত দুর্ব্বল ও মামুলী।

দিয়ে যায় যত যাহা, ইত্যাদি। অর্থ খুব স্পষ্ট নয়, অন্তত যুক্তিসহ, বা বিচারসম্মত নয়। কবি 'মানবাত্মা'র ঐরূপ সর্ব্ববন্ধন-মুক্তি বা নিত্য স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া দাবি করিয়াছেন। দেহ ধারণ করিয়া জীব যে সকল কর্ম্ম করে, তাহার ফলাফল, লাভালাভ সে সঙ্গে লইয়া যায় না—সংসারকে উপহার দিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, অর্থাৎ কোন কর্ম্মবন্ধন আর থাকে না। সংসারকে সে সব ছাড়িয়া দিয়া যাইতে পারে কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িবে কেন? সে কি কেবল দান করিয়াছে? কোন ঋণ করে নাই? রবীন্দ্রনাথের 'আত্মদর্শনে' 'আত্মা' এমনই নিত্যমুক্ত—তাহার সম্মুখ-গতি, পশ্চাতের কোন বন্ধন মানে না। বহুপরে কবি 'বলাকা'য় এই ধরণের কথা ভিন্ন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যথা—

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন বিহীন।……..

তাই এ ধরাবে
জীবন-উৎসব শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।

['শাজাহান'

কথাটা বড়, কিন্তু উহা কবিরই আত্মগত একটি ভাবমন্ত্র; উহাতে কোন সমস্যা-সমাধানের দায়িত্ব নাই। উপনিষদে 'আত্মা'র যে গৌরব-ঘোষণা আছে তাহা ঐ 'আত্মা'র নয়, এবং সে গৌরব কেবল ভাবুকতা বা মনোবিলাসের দ্বারা লভ্য নয়—সকল মানুষই তাহাতে অধিকারী নয়। কেবল দেহত্যাগ করিলেই যদি ঐরূপ আত্ম-লাভ হইত, তবে শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষায়—

Who would fardels bear............
If he could his own quietus make
With a bare bodkin ?

ভাব-চিন্তার এই শৈথিল্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ দার্শনিক কাব্য-কল্পনায় আছে; শেষে আত্মার ঐ নিত্যমুক্তির আশ্বাস জীবনেই একরূপ দায়িত্বহীন ভোগবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অষ্টম স্তবক। এই পংক্তিগুলিতে জীবনের যে নিষ্ফলতা, ও অসম্পূর্ণতার প্রতি কবির সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, পরবর্ত্তী স্তবকগুলিতে তজ্জন্য জীবনকেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ বলিয়া তিনি মৃত্যুর মহনীয়তা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নবম স্তবক। **হেথায় সে অসম্পূর্ণ**, ইত্যাদি। 'কবিতা প্রসঙ্গ' দেখ।

মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি, ইত্যাদি। কারণ জীবনের এই আধখানা মৃত্যুর দ্বারাই সম্পূর্ণ হয়। নদীর উপরে সেতুর যে অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলান থাকে, জলে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া সেই অর্দ্ধ-বৃত্তের বাকি অর্দ্ধ যেমন পূরণ করিয়া দেয়, মৃত্যুও তেমনই জীবনের ঐ অর্দ্ধ-বৃত্তের একটা ছায়াময় অপরার্দ্ধের মত; কালস্রোতের রহস্যময় জলতলে, মৃত্যু-রচিত সেই অপরার্দ্ধই জীবনের অসম্পূর্ণতা বা অর্থহীনতা দূর করে। কবির ঐ উপমাটির সহিত একটি ইংরেজী রচনার ঐ উপমাটি তুলনীয়। মৃত্যু হয়তো তাহাই করে, এইরূপ কল্পনা কবিতে ভাল লাগে, কিন্তু তাহা কল্পনা-সুখ মাত্র।

দশম স্তবক। কবি সেই একই স্বপ্ন দেখিতেছেন—মৃত্যুই সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবে।

জন্মান্তের নব প্রাতে, ইত্যাদি। মৃত্যুও আরেক জগতে একটা নবজন্মের মত—রাত্রিশেষে নবপ্রভাতের মত। তুলনীয়—

Her quiet eyelids closed—she had
Another morn than ours.

[*The Death-Bed* : T. Hood.

উহাও রোচক-কল্পনা মাত্র—ঐরূপ প্রশ্ন ভাবুকমাত্রেরই মনে জাগে। কিন্তু কবির কথাগুলিতে শুধুই প্রশ্নকাতরতা নয়—একটু তত্ত্বগন্ধও আছে। 'আপনাতে পেয়েছে উত্তর'—ভাষাটা দার্শনিক হইলেও, উহার সহিত মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ, ঐরূপ পাওয়া যদি সত্য বা সম্ভব হয়, তবে, শুধুই 'মৃত্যুর পরে' নয়, এই দেহী-অবস্থাতেও সেই উত্তর পাওয়া অসম্ভব নয়।

একাদশ স্তবক। **যেথায় ঘৃণার সাথে,** ইত্যাদি। জীবনে মানুষ যাহাকে তাহার একটি দুষ্কৃতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল, মৃত্যুর সত্য-আলোকে তাহাই হয়তো একটা উজ্জ্বল কীর্ত্তির রূপ ধারণ করিয়াছে; অর্থাৎ আমাদের সংকীর্ণ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়-সংস্কার সেখানে বাতিল হইয়া যায়, তার কারণ সেখানে সেই পূর্ণের দৃষ্টিতে কোন সংকীর্ণ নীতির অবকাশ নাই। কবি কিন্তু মৃত্যুর এপারে থাকিয়াই, সেই দৃষ্টিতে জীবনের সব-কিছুকে দেখিয়াছেন—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

['কলিকা'—গীতালি

পরবর্ত্তী স্তবকে ইহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে।

দ্বাদশ স্তবক। **সকল অভ্যাস ছাড়া,** ইত্যাদি। এই পংক্তিগুলির ভাবও যেমন—ভাষারও তেমনই মন্ত্রবৎ গাম্ভীর্য্য লক্ষনীয়। মৃত্যুর এমন বন্দনা আর কোন ভাষায় আছে কিনা জানি না। মৃত্যুকে কবি 'নগ্ন', নিষ্কলঙ্ক', 'সদ্য শিশু' প্রভৃতি বিশেষণে যে একটি মূর্ত্তিদান করিয়াছেন, তাহার মূল-ভাব এই যে, জন্ম-মুহূর্ত্তে—অর্থাৎ পার্থিব-জীবনের সংস্কারগুলা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে মানব-শিশু যেমন 'সকল অভ্যাস-ছাড়া' 'সর্ব্ব আবরণ-হারা' থাকে, মৃত্যুও পুনরায় তাহাকে তেমনই নগ্ন, নিষ্কলঙ্ক করিয়া দেয়; নবজাত ও মৃত—দুই অবস্থাই সমান, অর্থাৎ পবিত্র ও নিষ্পাপ।

ত্রয়োদশ স্তবক। এখান হইতে কবি আরেক ভাবে মগ্ন হইয়াছেন—সেই ভাবই তাঁহার অভ্যস্ত কবি-ভাব। প্রকৃতির ধ্যানে সব এক হইয়া গিয়াছে—উহাই 'বিশ্ব'; সেই এক বিশ্ব-সঙ্গীতে মৃতের লোকান্তরিত জীবন—সেই 'ব্যক্তি'র দেহ-জীবনের সংকীর্ণতা-মুক্ত জীবন —লয় হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চদশ স্তবক। **ব্যাপিয়া সকল বিশ্বে,** ইত্যাদি। 'ব্যক্তি'তে যাহা ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাই 'অব্যক্তে' বিশ্বময় হইয়া গিয়াছে। এই ভাব-বীজ রবীন্দ্রকবিমানসে সর্ব্বদা বিদ্যমান। পূর্ব্বে দেখ।

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে, ইত্যাদি। অতি সত্য কথা, ইহাই আত্মার তত্ত্ব। কিন্তু সেখানে সেই 'ব্যক্তি'ও নাই, অতএব ঐ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাব সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিতে গিয়া এক অদ্ভুত স্ব-বিরোধী চিন্তায় যেন অজ্ঞাতসারে জড়াইয়া পড়ে। 'ব্যক্তি'কেও চাই, আবার তাঁহার সেই অসীম 'অব্যক্ত'কেও চাই! একটার চিন্তায় 'ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ' থাকিবেই; একইকালে 'ব্যক্তি' ও 'অব্যক্তে'র ভাবনা করা যায় না। যদি সে সেই 'আত্মা'ই হইয়া গিয়া থাকে—তবে এই কবিতায় তাহার ঐ 'ব্যক্তি'-রূপটা স্মরণ করিয়া এত প্রশ্নের—ভাব ও অভাবের এত রঙীন কল্পনার প্রয়োজন কি? "সে আর নাই", অর্থাৎ 'অব্যক্ত'-রূপে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে; এমন কথা বলিয়াও কবি তাহার

সম্বন্ধে ব্যক্তি-মানবীয় সংস্কার ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না! কবি-মানুষের দার্শনিকতা বা অত্যুচ্চ তত্ত্ববাদের অভিমান এমনই নিরর্থক।

ষোড়শ স্তবক। যে বিশ্ব কোলের পরে, ইত্যাদি। ঐ 'বিশ্ব'—রবীন্দ্র-কবি-ধর্ম্মের, তথা সকল উচ্চ ভাব-কল্পনার প্রধান আশ্রয়। আমি পূর্ব্বে বহুবার এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। উহা যে ঠিক কি বস্তু, রবীন্দ্রনাথ ঐ নামে আপন মনোগত কোন্ ভাব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছেন—ভারতীয় 'জগৎ-ব্রহ্ম' ও রবীন্দ্রনাথের 'জগৎ-ব্রহ্ম' যে এক নয়, বরং ঐ দুইয়ের একটা মনঃকল্পিত—সমন্বয়-তত্ত্ব হিসাবে দুর্ব্বল ও ভাব-বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। মৃতের ঐ আত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়াও ব্যক্তিত্ব হারাইল না; অথচ সে ব্যক্তিত্ব একমাত্র এই জীবনে ও দেহ-ধারণেই সম্ভব, অর্থাৎ, তার জন্য 'আত্মা'কে দেহী হইতেই হইবে। আবার, যাহা 'অনন্ত' তাহার তো আমরা ধারণা করিতেই পারিনা; তাহার জন্য এত কাতরতাই বা কেন?

সপ্তদশ স্তবক। সে কি আমাদের, ইত্যাদি। মানসীর 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি এই সঙ্গে পঠনীয়।

ঊনবিংশ স্তবক। হায় রে নির্ব্বোধ নর, ইত্যাদি। ইহার ঠিক বিপরীত ভাব—

এ নিঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হ'তে
মানবের প্রাণে।......
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে,
অপূর্ব্ব অমৃতপানে অনন্ত নবীন,
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনখান্
তিলেক পেয়েছে স্থান, সেকি মাতৃহীন।

['সিন্ধু তরঙ্গ'— মানসী

মানুষ ভালবাসে বলিয়াই এমন 'নির্ব্বোধ'; ঐরূপ তত্ত্ব-কথায় তাহার প্রাণ আশ্বস্ত হয় না। উহাই মানবের মানবতা; 'আত্মা' নয়, 'বিশ্ব' নয়—ঐ অতি দুর্ব্বল, অতি ক্ষুদ্র, ধূলিময় জীবনের যে মানুষ তাহাকেই সে বক্ষে বাঁধিবে, এবং মৃত্যুতে তাহার বিরহে শোকাকুল হইবে। ইহাই মানবতা; কবি-রবীন্দ্রের মানবতা অন্যরূপ, এবং তাহা একান্তভাবে তাঁহারই। ঐ 'মানব' এবং ঐ 'বিশ্ব' উভয়েরই কাব্য-কল্পনা ও ভাব-সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করিব, কিন্তু উহাকে একটা তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিব না। কিন্তু কবি তাহাকে—কাব্যে এবং কাব্যের বাহিরে—তত্ত্বরূপেও প্রচার করিয়াছেন, তাই কাব্যপাঠকালেও ঐরূপ বিচারণ আবশ্যক হইয়াছে। কবি অন্যত্র এই মৃত্যুশোককে মানবীয়-প্রেমের ভাষায়, অতি সহজ সরল কবিতার আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশে নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!.....

মোরা বসি কাঁদিব হেথায়
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়—
মহা সে বিজন মাঝে হয়তো সে বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে।
হায়, কোথা যাবে।

['কোথায়'—কড়ি ও কোমল

বিংশ স্তবক। ওরি মাঝে পরিশ্রান্ত, ইত্যাদি। তুলনীয়—

পিতা নাই, মাতা নাই, পতিপুত্র নাই,
অতি অসহায়—
সকল বন্ধন ছিঁড়ে একাকিনী কোথা ফিরে—
অনলে অনিলে, শূন্যে—কোথায়। কোথায়।

['এষা'—অক্ষয় কুমার বড়াল

একবিংশ স্তবক। এই শেষ স্তবকে কবি মৃত্যু সম্বন্ধে সকল ভাবনাচিন্তা নিরর্থক জানিয়া কেবল ঐ মর্ত্ত্যজন্মশিখার পূর্ণ-নির্ব্বাণ কামনা করিয়াছেন। ইহাতে একটি কঠিন বৈরাগ্যের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কিম্বা, এই জীবনের জবজালা যে কত যন্ত্রণাদায়ক, মানব-জীবনের প্রতি সেই গভীর সহানুভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত—সেই বিশ্বজীবন, বা আত্মার সেই অসীমা-গৌরব কবিপ্রাণকে আশ্বস্ত করিল না, তাই—"সব তক হোক শেষ"। এই প্রার্থনা সকল মানুষের প্রার্থনা—কবিও শেষে আবার তাহাই করিয়াছেন—

বল শান্তি বল শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।

আরেক কবি দুইটি মাত্র কথায় তাঁহার কামনা ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

In quiet she reposes,
Ah! would that I did too!

[M. Arnold

—প্রিয়জনের মৃত্যুতে প্রেমিক-হৃদয়ের কি সবল অথচ গভীর আকাঙ্ক্ষা!

আমাদেরই আরেক কবির ঐ শেষ প্রার্থনা এইরূপ—

কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথা বিশ্বদেব,
কোথা প্রেতপুরী।
আমি আজ ধরাতল সভক্তি নয়নজলে
মাগিতেছি মুক্তি তার দুই কর জুড়ি'।

[অক্ষয়কুমার বড়াল

মাগিতেছি মুক্তি তার—অর্থাৎ সে যেন সকল মমতাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, তার কারণ, মৃত্যুতেই সে তো সকল বন্ধনহারা হইয়া বিশ্বাত্মায় ব্যাপ্ত হইয়া যায় নাই—সেও হয়তো আমাদের মতই কাঁদিতেছে

সাধনা

কবিতা প্রসঙ্গ

'অন্তর্য্যামী', 'সাধনা', 'উৎসব', 'জীবন দেবতা'—এই কয়টি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজ কবিজীবনের অতিশয় ব্যক্তিগত একটি উপলব্ধিকে ভাবাবেগ সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব, এই কবিতার প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা একটু সবিশেষ আলোচনা করিব।

এই কবিতাগুলির দুইটা দিক আছে—কবির নিজস্ব ইষ্টমন্ত্রে সেই ইষ্টদেবের আরতি, ইহা নিছক ভাবের দিক ; এবং তাহার কাব্যরস, অর্থাৎ সাধারণ মানব-হৃদয়ের পরিচিত একটি ভাবসংস্কার। ঐ দ্বিতীয়টিতে আমাদের বৈষ্ণব-সাধকের সেই প্রেম-ভক্তির রস আছে, তাই তাহা আমাদের চিত্তে সহজেই সঞ্চারিত হয়। বৈষ্ণবও তাহার ভগবানকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া, আপনাকে তাঁহার লীলারস-আস্বাদনের পাত্র করিয়া তুলিতে পারিলে কৃতার্থ হয়, তাহাই তাহার সাধনা। এই প্রেমলীলার রস বৈষ্ণব কবিতায় ও বহুতর গানে আমাদের সংস্কারগত হইয়া আছে, তাই রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতায় একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে, উহা সহজেই আমাদিগকে মুগ্ধ ও আবৃষ্ট করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঐ জীবনদেবতা তাঁহারই বিশ্বদেবতা হইলেও তিনি আর সকলের সহিত সেই লীলা করেন না; কবি তাঁহারই সেই অনন্যাসাধারণ কবিজীবনের ভিতর দিয়া ঐ বিশ্বদেবতার যে একটি বিশেষ প্রকাশ হইতেছে, তাহারই রস আপনার মত করিয়া আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার ঐ জীবন, সেই বিশ্ব-দেবতার একটি লীলা, তিনি তাহা ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন, ঠিক তেমনটি আর সকলের জীবনেও করিতেছেন কিনা, সে সংবাদ নিষ্প্রয়োজন, বরং—"তুমি আমারি যে, তুমি আমারি" এই বিশ্বাস কবিকে গভীরভাবে আশ্বস্ত ও আত্মস্থ করে। ঐ যে তাঁহার জীবন—তাহার অর্থ কি, তিনি তাহা জানেন না, তিনি তাহাকে খণ্ডিত করিয়া দেখেন বলিয়া কতবার কত ভুল করেন,--কখনো আশা, কখনো নিরাশা, কখনো হর্ষ, কখনো বিষাদ তাঁহাকে অভিভূত করে ; কিন্তু যে হেতু সেই জীবনের সূত্রটি জীবনদেবতা ধরিয়া আছেন, অতএব, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের মধ্যে--সকল খণ্ডতার মধ্যে—সেই পূর্ণ ও অখণ্ডের একটি অর্থসঙ্গতি আছে—জীবনের আদ্যন্ত সেই জীবনদেবতার অভিপ্রায়কে পরম সার্থকতায় উত্তীর্ণ করিতেছে।

কবির এই যে একটি পৃথক আত্মচেতনা, ইহা কাব্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন বলিলে হয়; কোন কবিই ঠিক এমনটি বিশ্বাস করেন নাই—করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। ঐ জীবনদেবতা কবির ইষ্টদেবতা, মানবসাধারণের দেবতা নয়,—এমন কি, বৈষ্ণবের সাধন-দেবতাও নয়, তাহা আমরা দেখিলাম। কারণ, ভগবানকে- নিজের উপাস্যদেবতাকে-- সর্ব্বলোকে ও সর্ব্বভূতে বিরাজিত (বিশ্বদেবতা-রূপে) দেখিয়াও, নিজের জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র ইষ্টমূর্ত্তি কল্পনা করা যদি বা সাধকের প্রয়োজন হয়, তথাপি, নিজ-জীবনের যতকিছু ভাল-মন্দ, ভুল ভ্রান্তি, মোহ বা দুর্ব্বলতাকে পর্য্যন্ত সেই পরমপুরুষের লীলা বলিয়া এই যে আত্মপ্রসাদ-লাভ, উহা ভক্তির আত্মনিবেদনের মত দেখাইলেও, আসলে উহা স্বাতন্ত্র্যাভিমানেরই একটা রকমফের মাত্র। ঐ যে 'সাধনা', উহা আত্মভাবেরই সাধনা; কবি সেই সাধনায় সকল ভুল-ভ্রান্তির

দায়িত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। প্রথমতঃ কবি তাঁহার কবিজীবনকে সমগ্রভাবে ঐ জীবন-দেবতার আসন বা লীলারস-আস্বাদনের যন্ত্র বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, তিনি যাহা কিছু করেন, যাহা কিছু ভাবেন, যাহা কিছু রচনা করেন, বা প্রচার করেন, তাহার কিছুই তাঁহার নহে, সেই দেবতাই তাঁহার মধ্য দিয়া সেই সব করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ দেবতার সেই লীলা-কর্ম্মের বাহিরে কবির জীবনে আর কিছু নাই, অর্থাৎ কবি-মানুষটি ছাড়া সাধারণ মানুষহিসাবে তাহার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। অন্যত্র কবিতাহিসাবে ইহার বিপরীত কথা থাকিলেও তাহা কবির কাব্যমন্ত্র বা সাধনতত্ত্বের কথা নয়—রসরসিকতার ভাববিলাসমাত্র, সেই সকল কবিতার প্রেরণাই স্বতন্ত্র। ঐরূপ প্রেম-ভক্তির যে 'সোঽহং' তাহাতে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তি-আমি সদাজাগ্রত হইয়া আছে (এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যই জীবনদেবতারও স্বাতন্ত্র্য, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি); এখানে 'সোঽহং' অর্থে 'তুমিই' 'আমি' নয়—'আমি'ই 'তুমি'। 'আমি' মুছিয়া গিয়া 'তুমি'তে লয় হওয়া সহজ কথা নয়, সে অবস্থায় এতবড় একটা 'অহং' চেতনা থাকিতেই পারে না—এমন কি, ঐরূপ কবিতারচনাও অসম্ভব—লিখিলে তাহা পুরা মিষ্টিক-কবিতা হইয়া উঠিবে। অতএব এই যে 'সাধনা' এবং তাহার 'ইষ্ট' ঐ 'জীবনদেবতা', উহা কবির নিজ-মানসেরই একটা লুকাচুরী-খেলা। ঐ বৈষ্ণবী ভক্তিও এখানে সেই আত্মরতি রস-আস্বাদনের একটি রীতিমাত্র।

এই 'জীবনদেবতা'র আদি সূচনা বা কবিচিত্তে তাহার অঙ্কুর কিরূপে ও কিভাবে দেখা দিয়াছিল তাহার আলোচনা 'প্রথম পর্ব্বে' সবিস্তারে করিয়াছি, ইহাও বলিয়াছি, আত্মভাব-সাধনায় ঐরূপ একটি ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা আমাদের আধুনিক গীতিকাব্যের আদিকবি বিহারী-লালের কাব্যপ্রেরণায় সর্ব্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা হইতেই উহার ইঙ্গিত পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু ইহা তো কেবল আত্মগত ভাবের সাধনাই নয়, অতিউগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-সাধনা, তাহাতে কেবল অন্তর্মুখীনতাই নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার বা আত্মপ্রসারের জয়যাত্রা আছে। কবি-মানস ও কবি-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাহার কবিজীবনকে এমনই স্বতন্ত্র ও অনন্যসদৃশ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন—তাহার কবিভাবের প্রেরণাও এমন নিত্যনব, তাহার রূপ এমন বিচিত্র এবং একইকালে তাহাতে এমন বিরুদ্ধ তত্ত্বের তির্য্যক আবির্ভাব হইতে লাগিল যে শেষে, তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া আত্মমানসের সেই বৈচিত্র্য বিলাসকেই তাঁহার প্রতিভার একটা নিগূঢ় সত্য বলিয়া আশ্বস্ত হইতে চাহিলেন, সেই রসসাধনায় সর্ব্বদায়িত্ব এখন হইতে একটা উচ্চতর শক্তির উপরে আরোপ করিয়া, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"র মনোভাব আশ্রয় করিলেন,

কিন্তু এইখানে আরেকটি কথাও আছে—সাধারণ কবি-জীবনের কথা। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'কে সেই দিক দিয়া দেখিলে পার্থক্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সকল বড় কবিরই কাব্য রচনাকালে যে একটা আবেশ হয় (Inspiration)—যেন আর কোন শক্তির অধীন হইয়া তাঁহারা অবশে কাব্যসৃষ্টি করেন, ইহা একরূপ সর্ব্বজনস্বীকৃত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঐরূপ দৈবীশক্তির প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাও আমরা জানি যে, কবিগণের দুইটা সত্তা

আছে—একটা ঐ কবিজীবন, আরেকটা সাধারণ মনুষ্য-জীবন। এমনও দেখা গিয়াছে যে অতিবড় কবিও সাধারণ মানুষের মতই সংসার ও সমাজের একজন হইয়া জীবনযাপন করিয়াছেন, যেমন—ইংরেজ-কবি শেক্‌স্‌পীয়ার। অতএব ঐ কবি-শক্তি একটা অতিরিক্ত শক্তিই বটে, এবং উহা যে সেই কবি-মানুষকেও বিস্মিত করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কোন কবিই ইচ্ছা করিলেই যখন-তখন উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে পারেন না; আবার একটা কাল অতিবাহিত হইলে ঐ শক্তিও যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও নিজের মধ্যে ঐরূপ একটা শক্তির অধিষ্ঠান অনুভব করিবেন, ইহা তো স্বাভাবিক; সেই শক্তির আবির্ভাব নৈমিত্তিক না হইয়া তাঁহার জীবনে প্রায়ই—এমন কি নিত্যই ঘটিত, তাহার অনেক কারণও ছিল। কিন্তু অন্যকোন কবি, তাঁহার মত ঐ দৈবী-প্ররণাকেই—কবিমানসের সেই আবিষ্ট অবস্থাকেই ব্যক্তি-পুরুষের সর্ব্বকালীন অবস্থা বা তাহাকেই ব্যক্তিজীবনেরও একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করে নাই; সেই কবি-জীবনকে স্বীকার এবং বহির্জীবনের যতকিছু পরিচয়কে অস্বীকার করে নাই। এদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের ঐ জীবনদেবতার তত্ত্ব অতিশয় অসাধারণ; উহা তাঁহারই নিজস্ব প্রত্যয় বলিয়া কাব্যসাহিত্যের বিচারে তাহাকে পৃথক রাখিতে হইবে, কারণ, উহা একান্তই তাঁহার অন্তর্জ্জীবনের ঘটনা,—উহাতে কবিমানসের একটা গূঢ়তর পরিচয় আছে মাত্র; উহার দিক দিয়া কাব্যরস-বিচার নয়, কাব্যবসের দিক দিয়া উহার কিছু মূল্য থাকিতে পারে। কাব্যে আমরা যে কবিমানসকে পাই, তাহার পরিচয় সহজ, তাহা সাধারণ নিয়মেরই অধীন; তাহাতে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ঐ কবিমানস অতিশয় আত্মকেন্দ্রিক; তাহাতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরস-প্রেরণা, এবং সূক্ষ্ম মানসক্রিয়া ও তীব্র ভাবানুভূতি (hyper-sensitiveness) আছে। 'জীবনদেবতা' বিষয়ক কবিতাগুলিতেও আমরা সেই মানসক্রিয়া ও সেই অনুভূতির কাব্যরস আস্বাদন করিব।

কবিতা পাঠ

বেশ বুঝিতে পারা যায় এ কবিতাটি কবির কাব্যলক্ষ্মীর সহিত নিভৃত আলাপ নয়—যাহারা তাঁহার কাব্যকে এখনও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না বা তাহা দুর্ব্বোধ্য মনে করে, কবি সেই বাহিরের সমাজকে শুনাইয়া একটা কৈফিয়ৎ বা আত্মনিবেদন লিখিয়াছেন।

এনেছি বহিয়া ব্যর্থ সাধন খানি। ব্যর্থ সাধনার মধ্যে একমাত্র সত্যবস্তু—ঐ 'নয়ন-জল'। এত যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অন্তর তৃপ্ত হয় নাই।

মোর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধের ধন, ইত্যাদি। যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তমকে চায় না, জানেও না, তাহারাই অল্পে চরিতার্থ হয়; আমার এই ব্যর্থতার গৌরব তাহারা বুঝিবে না।

তুমি জানো, ওগো, করি নাই হেলা। সেই অন্তরবাসী দেবতার সহিত কবির যাহা কিছু বোঝাপড়া; বাহিরের সমাজ যাহাই বলুক না কেন, অন্তরে আত্ম-প্রত্যয়, বা নিজ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলেই হইল। তন্ত্রী যদি ছিঁড়িয়া যায়, সেও ভাল, কারণ তাহাও সেই অতিউচ্চ সুরে তাহাকে বাঁধিবার প্রয়াসে।

এ জীবনে আমি, ইত্যাদি। এ পর্য্যন্ত আমি যত কাব্য রচনা করিয়াছি তাহা আমার সেই অন্তরের পিপাসা বা একান্ত নিজস্ব সাধনার সম্পদ নয়। সেই সাধনার অবকাশে যে সকল গান গাহিয়াছি, তাহাতে কোন স্বত্বাধিকার দাবি করি না—তাহাকে আমা হইতে পৃথক রাখিয়াছি; বিশ্বজন তাহা ভোগ করিবে—তাহার যেটুকু ভোগ্য তাহা গ্রহণ করিবে, যাহা নয়—তাহা ফেলিয়া দিবে; আমার তাহাতে কোন মমত্ব নাই। সকল কাব্য তো তাহাই; কাব্যকেই লোকে আদর করে—কবিকে ভুলিয়া যায়; কবির নাম তাহাতে যুক্ত না থাকিলেও কিছুই যায় আসে না। কিন্তু ঐ কাব্যের মধ্য দিয়া আমি আমাকেই খুঁজিতেছি—অতএব, কাব্যের ঐ দিকটা আমার নিকটে মূল্যহীন, আমার সাধনার উহা একটা অবলম্বন বা সোপান মাত্র।

এই ভাব-বীজ নূতন, এই কালেই উহার প্রথম স্পষ্ট উন্মেষ হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কবি নিজকাব্যের উপরে—তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণাকে—তাঁহার সেই 'আমি' টার বৃহত্তম উপলব্ধিকে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, শেষে "তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ" এই মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন।

যা কিছু আমার শ্রেষ্ঠ ধন, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যাহা কবির একান্ত নিজস্ব, যাহা কেবল সর্ব্বজনভোগ্য কাব্যরসবস্তুই নয়—যাহাতে জগতের সকলের অধিকার নাই—তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। তাহাকে কোন কার্য্যে, গানে বা বাণীতে ধরিতে পারা যায় না। সেইজন্য সংসারের দিক দিয়া যাহা চিরদিনই বিফল—কবি সেইগুলির উপরেই তাঁহার দেবতার সানুগ্রহ দৃষ্টি প্রার্থনা করিয়াছেন।

অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, ইত্যাদি। উহাই সেই ভিতরকার আসল 'আমি'টার সম্পদ, তাহা কখনো বাস্তব-জীবনে বর্জ্জনীয় নয়, তুলনীয়।

"The little done and undone vast"

—R. Browning

বিফল বাসনারাশি। অর্থাৎ যে বাসনা বড় বলিয়াই চিরদিন বিফল হইয়া থাকিবে।

ব্রাহ্মণ

কবিতা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন গাথা-কাহিনী ও আখ্যান হইতে ঘটনা, চরিত্র বা বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া যে অনুপম কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন, এই কবিতাটি তাহারই অন্তর্গত; ইহার পরে 'কথা' ও 'কাহিনী' নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি গাথা (Ballad) অথবা ক্ষুদ্র কাহিনীর আকারে যেগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার ভাববাদী কল্পনা (Idealism) অপূর্ব্ব কাব্যকলায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, এই কালে কবি ভারতীয় কালচার বা ইষ্ট-সাধনার বিশিষ্ট আদর্শটিকে অতিপ্রাচীন সমাজের আচার-আচরণে, সন্ধান করিতেছিলেন; বৈদিক ও বৌদ্ধ, দুই কালের ভারত-ইতিহাসে তথা পৌরাণিক যুগে, তিনি তাঁহার নিজস্ব নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বহু সাক্ষ্যও যেমন, তেমনই ব্রাহ্মণসাহিত্যে

তথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সমাজে সেই উচ্চ আদর্শের বিরোধী কদর্য্য কুসংস্কার ও বিশেষ করিয়া বর্ণ-ব্রাহ্মণের দম্ভ ও মিথ্যাচারের প্রমাণ সংকলন করিয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতীয় সমাজকে তিনি কখনো শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই—তেমনই প্রাচীন ভারতীয় সাধনার গৌরবময় আদর্শকে তিনি এককালে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন; অবশ্য সেই আদর্শকে তিনি নিজের মত করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, যেমন—উপনিষদের শ্লোকগুলিকে তিনি আপনার মত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই ধরণের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁহার সেই আত্মগত আদর্শ ও কবিশক্তি—দুইয়ের পূর্ণমিলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কবিতাটিতে আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি গাথাকে কবিকল্পনার যাদুশক্তির বলে, আমাদের কালের কাব্যভঙ্গিতে ও আমাদের ভাষায় হুবহু পুনরুদ্গীত হইতে দেখি। তপোবনের দৃশ্য, প্রাচীন সমাজেব সরল ও বলিষ্ঠ জীবন এবং একস্থানে উপনিষদেব ভাষা পর্য্যন্ত (জননী জবালার উক্তি) যেন সেই অতীতকে পুনরুদ্ধাব করিয়াছে। কবিতাটিব বহিরঙ্গে কবির সেই ব্যক্তিগত মনোভাবের কোন চিহ্ন নাই বটে—পডিবার কালে আমরা বর্ত্তমান সমাজকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইযা একটি সত্য ও সুন্দব ভাবকে হৃদয়ে ধারণ কবিয়া অপরূপ শুচিতা লাভ কবি। কিন্তু কবির ঐ প্রেরণার অন্তরালে একটা গূঢ়তব ভাববস্তু যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—'ব্রাহ্মণ' নামটা তাহার প্রমাণ। ঐ কাহিনীটি উদ্ধৃত করিয়া কবি আধুনিক ধর্ম্মহীন সত্যহীন অতিদম্ভী বর্ণ ব্রাহ্মণকে শুনাইয়া দিয়াছেন যে জাতি বা জন্মের আভিজাত্যই ব্রাহ্মণত্ব নহে, সম্পূর্ণ কুলহীন, পিতৃপবিচয়হীন, এমন কি সমাজে যাহাকে জারজ বলে, তেমন ব্যক্তিও যদি সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সে শুধুই 'দ্বিজ' নহে—"দ্বিজোত্তম"। এই বিচারে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য-সমাজের ভিত্তি ধ্বসিয়া যায। হিন্দুসমাজে গুরু ও পুবোহিতরূপে ব্রাহ্মণেরা যে কেবলমাত্র জাতির অজুহাতে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী কবে, আচাবে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত শুচিতা রক্ষা কবিয়া তাহারা যে দেবত্বেব অভিমান করে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক কবিতায় ও ছোটগল্পে এবং বহুতর প্রসঙ্গে তাহাকে আঘাত করিয়াছেন। ইহাও স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের পরিবার ঐ সমাজে 'পতিত' ছিলেন। 'বিসর্জ্জনে'র রঘুপতি, 'দুরাশা' গল্পেব কেশরলাল এবং 'সোমক ও ঋত্বিক' কবিতাব পুরোহিত চরিত্র—এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কবিতা-পাঠ

অর্ঘ বহি' করপুট ভরি'। শিষ্যত্বকামী হইয়া গুরু সমীপে গমন করিতে হইলে, কিছু অর্ঘ্য ও উপহারসহ যাওয়াই বিধি।

সত্যকাম নাম মোর। সম্ভবতঃ ঐ নাম পবে সে লাভ করিয়াছিল, নতুবা ঐ বালককে অন্বর্থনামা বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণের আছে অধিকার, ইত্যাদি। ঐরূপ জাতিগত অধিকার ভেদ আবও প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই ছিল না; কাবণ প্রাচীনতর উপনিষদে—ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদেই

প্রমাণ আছে যে, 'ব্রহ্মবিদ্যা' আদৌ ব্রাহ্মণজাতি-ঋষিদের মধ্যে ছিল না, জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজাদের নিকট ব্রাহ্মণেরা শিষ্যরূপে উহা লাভ করিয়াছিল।

বহুচর্যা করি' পেয়েছিনু তোরে, ইত্যাদি। জবালার এই উক্তিটি মূল উপনিষৎ হইতেই অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, যথা—

ছান্দোগ্য (চতুর্থ অধ্যায়)

সত্যকামো হ জবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে,
ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রো ন্বহমস্মীতি।
সা হৈনমুবাচ নাহমেতদবেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি,
বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে,
সাহহমেতন্ন বেদ যদগোত্রস্ত্বমসি।

একদা সত্যকাম জাবাল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে (গুরুগৃহে) বাস করিতে চাই; (সুতরাং) জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয়?"
জবালা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে কোন্ গোত্রীয় তাহা জানি না। বহুকর্ম্মব্যাপৃতা, ও পরিচর্য্যানিরতা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম: সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয় তাহা জানিতে পারি নাই।" ('উদ্বোধন'-সংস্করণ)
কিন্তু পরবর্ত্তী ভাষ্যকারেরা (সায়নাচার্য্য প্রভৃতি) ঐ বাক্যের অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন। এখানে বহুপরিচর্য্যার সহজ অর্থই—বহু পুরুষের ভোগ্যা হইয়া (অতিথি সৎকারের প্রয়োজনে) গ্রহণ করিতে হইবে।

পুছিলাম জননীরে, কহিলেন তিনি, ইত্যাদি। কি সরল, সর্ব্বসংস্কার মুক্ত সহজ ভীষণ! পরবর্ত্তী সমাজে 'জননী-জার' সম্বন্ধে পুত্রের যে কঠিন মৌন-রক্ষা বিহিত হইয়াছিল, তাহার নীতি বা আদর্শ অন্যরূপ। কিন্তু ঐ বিষয়েও এইরূপ সত্যভাষণ—সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত বলিতে হইবে। সেই আদিম বৈদিক সমাজে বিবাহবিধির ও সতীত্বধর্ম্মের বন্ধন তেমন দৃঢ় ছিল না, অতএব সেই সংস্কারও ছিল না, তথাপি গুরু-গৌতমের ঐ উদারতায় এবং ঐরূপ উক্তিতে মনে হয়, নর-নারীর ঐরূপ সংসর্গ সেকালে অশুচি বা অনার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, ইত্যাদি। এই উক্তিতে, ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার যে নাই, সেই অধিকার-ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে; সত্যকাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন বলিয়াই গুরু তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। 'সত্যকুলজাত'—সত্যই ব্রাহ্মণের কুল, অর্থাৎ তাহার আত্মার জাতি-পরিচয়, এত বড় কঠিন সত্য যে এমন অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারে, তাহার স্বভাবে সেই বস্তু আছে যাহা দ্বারা সে 'ব্রহ্মবিদ্যা'কে অর্থাৎ সত্যের পরমতত্ত্বকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে।

উর্ব্বশী

কবিতা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা। বিখ্যাত হওয়ার কারণ, ছন্দ-সৌন্দর্য্য (Stanzaic music), শব্দঝঙ্কার ও কতকগুলি মনোহর কল্পচিত্রাবলী (Poetical imagery)। এই সকল কারণে এ কবিতার একটি প্রবল লিরিক-সংবেদনা আছে। ভাববস্তুরও একটা বিশেষ গৌরব এই যে, উহা মানব-হৃদয়ের একটি নিত্য উদ্দীপন-সামগ্রী—সর্ব্বকালে সকল কবিকে বিভিন্নরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে; সেই চিরন্তনতাই ইহার গৌরব; সেজন্য উহা যেমন মহৎ, তেমনি ভাবের দিক দিয়া মৌলিক নহে, মৌলিকতা—সুরে ও রূপে। কিন্তু কবিতাটি ভাষায়, ছন্দে ও কবিত্বময় পংক্তিরাজিতে এত সুন্দর হইলেও, উহাতে ভাব-বিরোধ ঘটিয়াছে, তাই একটি পূর্ণ রস-রূপ লাভ করিতে পারে নাই। এ বিষয়ে কবির নিজের ব্যাখ্যা, এবং ভক্ত সমালোচকের উচ্ছ্বাসময় সমর্থন যেমনই হৌক—যাঁহারা কবিতায় শুধুই ভাব-পরম্পরার সঙ্গীতময় শব্দ-সমারোহে মুগ্ধ হইতে পারেন না, তাহার অন্তর্গত একটি ভাব-সঙ্গতি ও তাহারই চমৎকৃতি প্রত্যাশা করেন—অর্থাৎ কবিতাকে একটি সাঙ্গীতিক প্যাটার্ণ হিসাবে নয়—একটি অখণ্ড ভাবের বাণী-সৃষ্টি বলিয়াই জানেন, তাঁহারা এই কবিতা পাঠ শেষে —ইংরেজ সমালোচক রেভারেণ্ড টমসন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিবেন; টমসন সাহেবের সেই মন্তব্য আর সকল কবিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবেও যতটা সত্য হৌক না হৌক, উর্ব্বশী কবিতাটির সম্বন্ধে তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, যথা—

"His poems rarely fail in beauty of style, but they often fail in grip."

এ কবিতা ঐরূপ হওয়ার কারণ, রবীন্দ্রনাথ 'উর্ব্বশী'র রূপে যে সৌন্দর্য্যের বন্দনা করিয়াছেন তাহা আদৌ Physical বা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৌন্দর্য্য—sensuous, এমন কি, sensual-এরও কাছাকাছি, Spiritual বা Intellectual Beauty নয়। কবি নিজেও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"উর্ব্বশী যে কী, কোন ইংরেজী তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চাইনে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ, উর্ব্বশী তারই প্রতীক।.....এর মধ্যে কেবল এব্‌স্ট্রাক্ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারীরূপকে অবলম্বন ক'রে এই সৌন্দর্য্য, সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবতঃ নারীর মোহও আছে। শেলী যাকে ইনটেলেক্‌চুয়াল-বিউটি বলেছেন, উর্ব্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে, তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই।...সে নিছক নারী—মাতা, কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—সে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই। মনে রাখতে হবে উর্ব্বশী কে। সে স্বর্গের নর্ত্তকী, দেবলোকের অমৃতপান সভায় সখী। উর্ব্বশীতে সেই দেহসৌন্দর্য্য ঐকান্তিক হয়েছে.....।"

স্বর্গত চারু বন্দোপাধ্যায়কে লিখিত এই পত্রে কবি যাহা লিখিয়াছেন, মূল কবিতাটি অপেক্ষা তাহা স্পষ্ট নহে। তথাপি এবস্‌ট্রাক্‌ট্‌ সৌন্দর্য্য, ইনটেলেকচুয়াল বিউটির দাবি ত্যাগ না করিয়াও কবি তাহাকে ঐ যে "নারী—'নিছক নারী', মোহিনী" বলিয়াছেন, উহার অর্থ

খুবই স্পষ্ট ; ঐ সৌন্দর্য্য কায়াহীন নয়—বিশ্বই উহার কায়া ; এবং তাহা নিছক নারী-কায়া ; উহা যে কামনা উদ্রেক করে তাহাতে যৌন-পিপাসা নিশ্চয়ই আছে ; কবি তাঁহার 'উর্ব্বশী'তে তাহা বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন ; যদিও ঐ পত্রে তিনি 'কামনা' কথাটার অর্থ একটু শোধন করিয়াছেন, যথা—

"কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় ক'রেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য।"

অর্থাৎ, "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল" কিম্বা "ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা"—উহার কোনটাতেই লালসা নাই—আছে কামনা ; বস্তু নাই—আছে ভাবের প্রাধান্য। অর্থাৎ ত্রিলোকের সর্ব্বমানবই রবীন্দ্রনাথের মত কবি, তাহারা নারীর উর্ব্বশী-রূপকে ভোগ করিতে চায় না—উপভোগ করিতেই আকুল, সেইজন্যই,—ঐ "হৃদি-রক্ত" এবং "অশ্রুধার"। আত্মভাবপরায়ণ, এবং আর্টতান্ত্রিক লিরিক-কবির পক্ষে এমন কল্পনাই স্বাভাবিক, কিন্তু, ঐ 'নারী' এবং "ঐকান্তিক দেহসৌন্দর্য্য"—কামনার বস্তু করিতে গিয়া কবি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। 'কামনা' কথাটার ঐ অর্থ ঠিক নহে, উহা 'ভাবপ্রধান' নয়, বিশেষভাবে 'বিষয়' বা 'বস্তু-সাপেক্ষ'—ইংরেজীতে উহাই "desire"—ঐ 'desire' কথাটিই Swinburne-এর কবিতায় আছে (পরে দ্রষ্টব্য)। কবি এখানে 'কামনা'র যে অর্থ করিয়াছেন তাহা খাঁটি রস-পিপাসা—সেই—

"বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জ্জং"

রবীন্দ্রনাথ 'কামনা'র যে অর্থ করিয়াছেন সেই অর্থেই 'উর্ব্বশী' যদি 'কামনা'-রূপিনী হয়, তবে আমাদের অর্থে ; অর্থাৎ 'কামনা'র যাহা আদি অর্থ, সেই অর্থে—তাঁহার 'উর্ব্বশী'কে কামনাহীনই বলিব। কিন্তু কবির ঐ ব্যাখ্যাও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই ; কবি নিজেই বলিয়াছেন—"কাব্যের মধ্যেই তাহার অর্থ আছে"। আমরা সেই অর্থ সন্ধান করিতেছি।

[উপরে রবীন্দ্রনাথের পত্রে ঐ যে 'কামনা' ও 'লালসা'র পার্থক্য নির্দ্দেশ আছে, উহাই রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি ধাতুগত লক্ষণ। 'বস্তু' মাত্রেই লালসা বা স্থূল জৈব প্রবৃত্তির আশ্রয়-'ভাব'ই উপাদেয়, তাহাতে দেহের অর্থাৎ মৃত্তিকার অশুচি স্পর্শ নাই, তাহাতেই স্বাধীন স্বতন্ত্র-জগতে বাস করা সম্ভব হয়, ব্যক্তির আত্মা জীবন ও জগৎ হইতে দূরে থাকিয়া সেই জগৎ ও জীবনকে আপনারই 'কামনা' অনুসারে গড়িতে ও ভাঙিতে পারে ; উহাকেই আর্টের 'জীবন্মুক্তি' বলে।]

তবু আমরা দেখিলাম, কবি তাঁহার ঐ উর্ব্বশীকে যেমন আদৌ 'এবস্ট্রাক্‌ট্' বা 'ইনটেলেক্‌-চুয়াল' বলিতে রাজী নহেন, তেমনই আবার, উহার 'দেহসৌন্দর্য্য ঐকান্তিক' হইয়াছে, এমন কথা বলিয়াও সেই দেহের সৌন্দর্য্যকেই খাঁটি রসের ভূমিতে উন্নীত করিতে চাহিয়াছেন। তাই ঐ মোহিনী কামিনী উর্ব্বশীকেও কবি এমন সকল বিশেষণে ও 'এবস্ট্রাক্‌ট্' ভাবসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন, যাহা বাস্তব জীবন-চেতনার বহির্ভূত—এ 'উর্ব্বশী' সাধারণ ইন্দ্রিয় জগতের ঊর্দ্ধে—একটা আধিমানসিক সৌন্দর্য্যলোকে—বিশুদ্ধ Aesthetic রস-সাধনার মানস-বিগ্রহই

বটে। এইখানেই কবিতাটির গুরুতর ভাববিরোধ ঘটিয়াছে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যরসও চাই, আবার রোমান্টিক কামনার জ্বালাও চাই! কবিতা-পাঠকালে এই ভাববিরোধ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এক্ষণে সাধারণভাবে ঐ 'উর্ব্বশী'র একটু পরিচয় করা যাক।

আমাদের বেদে-পুরাণে উর্ব্বশীর কাহিনী আছে। বেদে পুরুরবার উর্ব্বশী; পুরাণের মোহিনী অপ্সরা—ইন্দ্রসভায় নর্ত্তকী, মুনিগণের ধ্যানভঙ্গকারিণী। সেই আদি বৈদিক ঋষির চক্ষেও—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটি অপরূপ প্রকাশ (পূর্ব্বাকাশে উষার ক্ষণজ্যোতি) নারী-রূপচ্ছায়া বলিয়া মনে হইয়াছে, ইহা বিস্ময়কর নহে।—সৌন্দর্য্যের সহিত যৌন চেতনার সম্বন্ধ কি সে প্রশ্ন আজিকার এই মনোবিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে উত্থাপন করাই বাহুল্য। বৈদিক ঋষির মতই, অন্যদেশের কবি-ঋষিরাও রাত্রিশেষে পূর্ব্বাকাশের সেই জ্যোতির্ম্ময় ক্ষণ-সৌন্দর্য্যকে একটি নারীরূপ ও 'স্বর্ণকুন্তলা উষা'—নাম না দিয়া পারে নাই। পরে শুধুই সেই অন্তরীক্ষ-চারিনী উষাই নয়—জল-স্থল-আকাশের যেখানে যাহা কিছু নয়নমনোহর তাহাই যেন মানুষের ইন্দ্রিয়দ্বারে দাঁড়াইয়া রতি ভিক্ষা করে—অর্থাৎ তাহা কামনা-রূপিণী; ইহা কিন্তু সকল পুরুষের পক্ষে নয়—যাহাদের ইন্দ্রিয়গুলা অধিকতর সজাগ ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই সব কবি-জাতীয় মানুষের। একটু আগে আমরা রবীন্দ্রকাব্যেই ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়াছি —কবি তাঁহার 'মানসসুন্দরী' কবিতায় সেই বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যকেই প্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া কি রূপ-রসে বিভোর হইয়াছেন! ঐ যুগের আরেক কবিও গাহিয়াছেন—

> পড়ে আছি নদীকূলে শ্যামদূর্ব্বাদলে
> কি যেন মদিরাপানে
> কি যেন প্রেমের গানে
> কি যেন নারীর রূপে ছেয়েছে সকলে।

[অক্ষয় কুমার বড়াল

এ সকলই সেই এক আদি-পিপাসার, সেই বৈদিক ঋষির উর্ব্বশী-দর্শনের—জের। পরে যখন ঐ সহজ সুস্থ পিপাসা মদন বা মন্মথ হইয়া উঠিল, তখন সৌন্দর্য্য ও কাম দুইয়ের মধ্যে একটা সজ্ঞান দ্বৈতবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইল। ঐ কাম পূর্ব্বে প্রকৃতি-ধর্ম্মের মতই একটা সুস্থ প্রবৃত্তি (ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ) ছিল, পরে সজ্ঞান সৌন্দর্য্য-পিপাসার যোগে তাহা অসুস্থ, এমন কি উন্মাদকর ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইল; রূপ সাক্ষাৎ কামেরই ইন্ধন হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেহে-মনে কোন বিরোধ ছিল না, কারণ, তখন ঐ মনসিজ মন্মথ হইয়া উঠে নাই। অতএব আধুনিক কবিগণ—বিশেষ করিয়া এই অতিরিক্ত মানস-কর্ষণের যুগে, তাহাদের কাব্যে সেই সৌন্দর্য্যকে মোহিনী প্রেয়সীর সহিত এক করিয়া তাহাকে যে মদনের জায়া অথবা জননীরূপে দেখিয়া, তপ্তইক্ষু-চর্ব্বণের মত এমন জ্বালাময় সুখে আর্ত্তনাদ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী'র এক অংশে কামনার সেই সুর বেশ একটু রঙীন হইয়া উঠিয়াছে; উহার ঐ নামটিতে তাহাই ঘোষণা করে; সে স্বর্গ-বেশ্যা, মোহিনী নারী—বিশ্বের প্রেয়সী, তাই সেই প্রেয়সী নিশ্চয়ই নিছক সৌন্দর্য্য-পিপাসার প্রেয়সী নয়—উহার এক হাতে সুধাভাণ্ড থাকিলেও অপর হস্তে বিষভাণ্ড রহিয়াছে। বৈদিক ঋষির সেই উষা—উর্ব্বশীও নয়;—তাহার

হাতে বিষভাণ্ড নাই, পুরুরবার কাম আছে বটে, ক্রন্দনও আছে। কিন্তু তাহা সেই 'নারী-অপ্সরী' নিষ্ঠুরা বলিয়া—সে কীটসের সেই "La bel'e dame"; তাহাতে বিশ্বের ক্রন্দন নাই, সেই রূপ-পিপাসা ব্যক্তি বিশেষের, অর্থাৎ সেই রূপের—সেই জাতি—Intellectual নয়—অতএব তাহা একটা Universal মানস-পিপাসা নয়। আবার, পৌরাণিক অপ্সরা-প্রেমও ইহা নয়, কারণ তাহা আদৌ সৌন্দর্য্য-লালসা বা স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তি মাত্র। তাহা হইলে ইহা কেমন পিপাসা?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদ ও পুরাণের পরিচয় ত্যাগ না করিলেও, এ 'উর্ব্বশী'তে পাশ্চাত্য কবি-প্রসিদ্ধি ও তথাকার নব্য-রোমান্টিক কাম কল্পনার রং আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কামনার সেই হৃদয়-শোণিতরাগের ফাঁকে ফাঁকে আরেকটা রংও আছে—মনোজীবনের সেই Aesthetic রস-সম্ভোগ। সে সৌন্দর্য্য মুনিগণের ধ্যানভঙ্গ করে না, 'পুরুষের বক্ষোমাঝে রক্তধারা'কে উদ্দাম-চঞ্চল করে না। উহা 'স্বপ্ন সঙ্গিনী' ও 'অখিল মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী'ই বটে। জাগ্রত ভুবনে উহার একটা কান্তিচ্ছায়া আছে—কায়া নাই, তাই তাহা জীবনের কোন বিপ্লব সৃষ্টি করে না—কেবল মানসলোকে একপ্রকার স্বপ্নবিধুরতার সুখকর ব্যথার উদ্রেক করে। সেই রস সম্ভোগের স্বপ্নসুখেই কবি নব্য-য়ুরোপীয় 'কামনা'র সুর যুক্ত করিয়াছেন। অথচ উহা যে সর্ব্বকামনামুক্ত, অতি-উদার, জ্বালাহীন, পবিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও প্রতীক, তাহা কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে, যেমন—

"স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী",

কিম্বা—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী।

* * * * *

কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

—এ সৌন্দর্য্য যেমন শুভ্র, তেমনই সদাই পূর্ণপ্রস্ফুটিত, অর্থাৎ উহা নিছক সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়—Physical হইলেও ইহা সেই 'Ideal Beauty' যাহার সহিত বাস্তব হৃদয়-বেদনার কোন সম্পর্ক নাই, বরং সকল বেদনার নির্ব্বাণই তাহাতে আছে। অতএব কবিতাটি বাণী শিল্পের একটি অপরূপ কারুকর্ম্ম হইলেও তাহাতে ঐ ভাববিরোধ থাকায়, কবিতা হিসাবে একটি সুডৌল রসরূপ লাভ করে নাই। তথাপি কবিতাটি যে এত মুগ্ধকর তার কারণ, ভাব সঙ্গতির অভাব উহার ঐ অপূর্ব্ব কাব্যসঙ্গীতে ঢাকা পড়িয়াছে—এক এক স্তবকেও যেমন, এক এক পংক্তিতেও তেমনই, নব-নব কল্প-চিত্র (imagery) ও নব-নব ভাবের চমক আবেশে আমাদের চিত্তহরণ করে—তাহাতেই উহার আর্ট সার্থক এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে—কবিতা হিসাবে উহা যেমনই হৌক।

কবিতা-পাঠ

প্রথম স্তবক। নহ মাতা, নহ কন্যা, ইত্যাদি। অর্থাৎ (সর্ব্ববিধ স্নেহ-সম্পর্কের সংস্কারবর্জ্জিত। পরে আছে 'তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী', অর্থাৎ, ঐ এক সম্পর্ক-মাত্র আছে—সম্ভোগের সম্পর্ক, নিছক কাম বা কামনার সম্পর্ক। কিন্তু ঐ যে কাম উহাও তো একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করে—'প্রেয়সী' 'বধূ' না হইতে পারে, কিন্তু সে-ও তো একটা সম্পর্ক; ঐরূপ কোন সম্পর্ক থাকিলে, সেই সৌন্দর্য্য আত্মার আনন্দ-মুক্তির হেতু হয় না—সেই—"A thing of beauty is a joy for ever"। উহার মূলে কাম আছে বলিয়াই উহা সুন্দর)—একজন বড় পাশ্চাত্য দার্শনিক তাহাই বলিয়াছেন—It is the sexual instinct in man that makes him see beauty in woman।" অতএব (ঐরূপ 'মাতা, কন্যা', না-হওয়াটাই উর্ব্বশীর গৌরব নহে, বরং, তাহাই উহাকে নিছক কাম বা কামনার বস্তু করিয়াছে।)

কিন্তু ইহার অপর অর্থও হয়। (ঐ সৌন্দর্য্য সর্ব্বপ্রকার মমতা—সামাজিক, সাংসারিক ও জৈব প্রয়োজনের উর্দ্ধে; অর্থাৎ উহা সেই রস যাহা বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। খাঁটি Aestheic বা সুন্দর-তত্ত্বের 'সুন্দর' উহাই।) আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রের 'শক্তি' ও ঐরূপ-সকল মানবীয় বা পশু-সংস্কারের বহির্ভূত; অষ্টপাশমুক্ত না হইলে তাহাকে আত্মার সামগ্রী করা যায় না। এই স্তবকের শেষে আছে 'উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা'—উহাও তত্ত্বের পরিপোষক। অতএব ঐ পংক্তিটির দুই অর্থই হয়—পরে অন্যান্য স্তবকে তাহার প্রমাণ আছে। কবিতার আরম্ভই—অর্থাৎ প্রেরণামুখে, এই দ্বৈধ দেখা দিয়াছে।

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে, ইত্যাদি। একটি অতি সুন্দর কল্পচিত্র, পংক্তিগুলির পৃথক কাব্যরস অতিশয় উপভোগ্য।

উষার উদয়সম, ইত্যাদি। পূর্ব্বাকাশে সেই জ্যোতির বিস্তার তাহাতে যেমন কোন বাধা বা কুণ্ঠা নাই—যেমন মুক্ত, তেমনই অসীম; তুলনীয়—

স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা
অয়ি প্রশান্তহাসিনী

[চিত্রা

কিন্তু (উষার সৌন্দর্য্য আদিকালেও যেমন, এখনও তেমনই—পৌরাণিক উর্ব্বশীর মত নহে; তাহাতে ইন্দ্রিয়াতীত অপার্থিব সৌন্দর্য্যের আভাস আছে; এ কবিতায় উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ Physical বা পার্থিবও বটে;) তবু কবি ঐ 'উষা'কে ছাড়িবেন না। আবার, ঐ সৌন্দর্য্যের প্রকাশ যদি উষার মতই হয়, তবে তাহা চিরদিনই ভাবুক, কবি ও সৌন্দর্য্যপিপাসুর নেত্রে দর্শনীয় হইয়া আছে, তাহা হইলে—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।

[পরে দেখ

—ইহার অর্থ কি ?

দ্বিতীয় স্তবক। বৃন্তহীন পুষ্পসম, ইত্যাদি। এবং পরে আছে—"কোনকালে ছিলে নাকি মুকুলিকা-বালিকাবয়সী", এই স্তবকের প্রায় সবটাই ইংরেজ কবি Swinburne-এর একটি কবিতাকে স্মরণ করাইয়া থাকে। সেই কবিতায় গ্রীক পুরাণের মোহিনী-সুন্দরী আফ্রোদিতি দেবীর বন্দনা আছে, তিনিও উর্ব্বশীর মত সাগরোর্ম্মি সম্ভবা। Swinburne তাঁহার সেই আবির্ভাবের বর্ণনা ঠিক এইরূপ ভাষায় করিয়াছেন, যথা—

'And the waves of the sea as she came
Clove, and the foam at her feet
Fawning, rejoiced ..."

[*Chorus : Atalanta in Calydon*

ডান হাতে সুধাপাত্র, ইত্যাদি। ঐ বিষভাণ্ড হিন্দু পুরাণের নয়, সুইনবার্ণের কবিতায় উহার বর্ণনা আরও কবিত্বপূর্ণ, যথা—

'An evil blossom was born
Of sea foam and the frothing of blood,
Blood-red and bitter of fruit,
And the seed of it laughter and tears
And the leaves of it madness and scorn

উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য আফ্রোদিতিরই মত—তাহা কামজননী, কামনা বিষে পুরুষকে জর্জ্জরিত করে। তবু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাঁহার উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্যে 'কামনা' আছে—'লালসা' নাই, (পূর্ব্বে দেখ)। অর্থাৎ ঐ বিষ—মনেরই ভাববিধুরতা, দেহ-শোণিতের জরজ্বালা নয়।

তৃতীয় স্তবক। কোনোকালে ছিলে নাকি, ইত্যাদি। এই স্তবকের মূল কথাটি কবি আরেক স্থানে আরও বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন, যথা—

কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি,
কি আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টিশতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হ'য়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে। আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহুদিনে—তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।

[চিত্রাঙ্গদা

অর্থ :—সকল সৌন্দর্য্যই অখণ্ডভাবে, এক-কালে ও পূর্ণ-বিকশিতরূপেই আমাদের চিত্তে প্রকাশ পায়, তাহাতে বোধ-ক্রিয়ার কালক্রমিকতা নাই ; সে একটা অপরোক্ষ দর্শন বলিয়া (direct,

immediate apprehension) তাহাকে "পলে পলে, তিলে তিলে জানিতে" হয় না। এই জন্যই, কোন কিছুর সৌন্দর্য্য চিত্তস্পর্শমাত্রেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, পরে বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

মণিদীপদীপ্ত কক্ষে, ইত্যাদি। সমুদ্রতলের ঐরূপ কবিত্বময় বর্ণনা ইংরেজী-কাব্য হইতেই আমাদের কাব্যে সঙ্কলিত হইয়াছে, যথা—

Sand-strewn caverns cool and deep
Where the winds are all asleep.
Where the spent lights quiver and gleam ;

এবং—

We shall see while above us
The waves roar and whirl,
A ceiling of amber,
A pavement of pearl.

[*The Forsaken Merman :* M. Arnold

কবি মধুসূদনও এই পাশ্চাত্য কবিকল্পনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, যথা—

যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজবনে প্রবাল-আসনে
বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিল।

[মেঘনাদবধ কাব্য

চতুর্থ স্তবক। তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী। 'প্রেয়সী' অর্থে, 'কামনার ধন', হৃদয় যাহা চায়, তাহাই। তাই তোমার ঐ সৌন্দর্য্য পুরুষকে যৌবন-চঞ্চল করে, মুনিগণের ধ্যানভঙ্গ করে, কবিচিত্ত সঙ্গীতে উদ্দাম করিয়া তোলে।

(আমাদের কবি সৌন্দর্য্যের দ্বারা কামনার উদ্দীপন ঐ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন ;) অর্থাৎ তাহার ফলে মনের ঐ চাঞ্চল্য ছাড়া,—বাস্তব-জীবনে কোন মহা-অনর্থ বা গুরুতর বিপ্লবের সৃষ্টি করে না। তার কারণ, (ঐ উর্ব্বশী নিছক সৌন্দর্য্য-প্রেমের 'প্রেয়সী' মাত্র, সে উন্মাদনা মানস-জীবনেই সীমাবদ্ধ ; সাক্ষাৎ নারীপুরুষ-সম্পর্কের যে তীব্র পিপাসায়—রূপলালসার যে অগ্নিতে ট্রয় ধ্বংস হয়, লঙ্কা ভস্ম হয় ; তাহার সর্ব্বনাশিনী শিখা ঐ উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্যে নাই তাহা নারীরূপ-লাবণ্যের একটা মানসী (Ideal) বিশ্বময়ী কান্তিমাত্র, মানুষের বাস্তব জীবনে তাহার বিষ-বিসর্প নাই। তাই সুইনবার্ণের আফ্রোদিতির সহিত এতখানি সাদৃশ্য সত্ত্বেও তাহা হৃদয়ের প্রবল প্রবৃত্তি (Passion) বা আত্মঘাতী রূপোন্মাদের কারণ হইয়া উঠে না।) সুইনবার্ণ তাঁহার 'উর্ব্বশী'র উদ্দেশে গাহিয়াছেন—

Wilt thou not turn thee yet, nor have pity,
But abide with despair and desire

—সেই desire বা 'কামনা' কেবল হৃদিরক্তে ও অশ্রুধারেও শেষ হয় না (পরে দেখ), তাহার ফলে—

> And the cryin, of armies undone
> Lamentations of one with another, .
> The dividing of friend against friend,
> The severing of brother and brother

—তাই কবি আর্ত্তনাদ করিয়াছেন—

> ' Wilt thou utterly bring to an end
> Have mercy, Mother

এ যেন সৃষ্টির মূলে যে কাম আছে—সেই মহাশক্তি ও জীবের মহা-নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া—কবি তাহার নিকটে কৃপাভিক্ষা করিতেছেন। ইহার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' – Intellectual Beauty-র একটা Physical বা ইন্দ্রিয়রাগরঞ্জিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়। তুলনীয়—

> মানসরূপিনী তুমি তাই দিশে দিশে
> সকল সৌন্দর্য্যসাথে যাও মিশে মিশে।
> চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
> নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
> মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি',
> মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।

['নারী' – চৈতালি

পঞ্চম স্তবক। সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর, ইত্যাদি। এই স্তবকটিতে একটি পৃথক চিত্র যেমন সম্পূর্ণ তেমনই অনবদ্য হইয়াছে। সুর-সভাতলে উর্ব্বশীর সেই নৃত্যই সমস্ত ভূমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া যেন চক্ষুগোচর হইয়াছে ; সেই নর্ত্তকীর স্তনহার হইতে খসিয়া-পড়া উল্কাগুলি সমগ্র দৃশ্যটিকে একটি বিরাট গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছে।

অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে, ইত্যাদি। কবিতাপ্রসঙ্গ দেখ।

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে, ইত্যাদি। সুইনবার্ণের কবিতায় আছে—

> But thee
> Who shall discern or declare
> In the uttermost end of the sea
> The light of thine eyelids and hair,
> The light of thy bosom as fire
> Between the wheel of the sun
> And the flying flames of the air

—এখানে ঐ 'flying flames'-ই "খসি' পড়ে তারা"। তথাপি, এই দৃশ্যটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিশক্তির নিদর্শনও আছে, প্রথমতঃ, উহার ঐ মূর্ত্তিকল্পনা (Personification) আরও সহজগ্রাহ্য হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, ঐ উর্ব্বশী নর্ত্তকী বলিয়া উহার স্তনহারের প্রবল আন্দোলন এবং মেখলাস্খলিত হওয়ার বর্ণনা বড় সার্থক ও উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু ঐ রূপ

যদি উর্ব্বশীর রূপ হয়, তবে তাহাতে কামনার সম্পর্ক নিশ্চয়ই নাই ; অন্ধকার রাত্রে উল্কাপতন যদি তাহার স্তনহার হইতে খসিয়া-পড়া মণি বলিয়া মনে হয়, সে সৌন্দর্য্য যদি এমন গম্ভীর ও রহস্যময় হয় তবে তাহাতে পুরুষের চিত্তে আদিরসের সঞ্চার না হওয়াই স্বাভাবিক।

ষষ্ঠ স্তবক। স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী। ঐ উষা নিশ্চয়ই ইন্দ্রসভার নর্ত্তকী উর্ব্বশী নয় ; উদয়াচলে আবির্ভূতা প্রশান্ত হাসিনী উষা একটা লোকোত্তর সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগায়, তাই তাহাকে দেখিয়া ঋষিকণ্ঠে মন্ত্র-আরতির স্তোত্রগীত উচ্চারিত হয়—মুনিগণের ধ্যানভঙ্গ হয় না। অথবা উহাই যেন সেই—"A thing of Beauty is a joy for ever।" 'উষসী' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ; 'উষস' হইতে 'উষা'ই হয়—'উষসী' হয় না।

জগতের অশ্রুধারে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে দেখ। স্যুইনবার্ণের আফ্রোদিতিও 'মুক্তবেণী বিবসনা' বটে, তাহার নগ্ন অঙ্গে সমুদ্রফেন লাগিয়া আছে এবং তাহার সেই বিবসনা-রূপ পুরুষকে নৈরাশ্যজর্জ্জর বা হিংসা ও ঈর্ষ্যায় উন্মত্ত করে। আমাদের পুরাণ 'উর্ব্বশী'কে নয়— তিলোত্তমাকে সেই সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীতে ঐ তিনরূপই আছে— উষা, উর্ব্বশী ও তিলোত্তমা। তথাপি, সে সৌন্দর্য্যে—কামনা নয়—বাসনার উদ্রেক হয়। তাহার 'পাদপদ্ম'ও যেমন 'অতি-লঘুভার' তেমনই, সেই 'বিশ্ববাসনা'ও উগ্র নয়—অরবিন্দের মত স্নিগ্ধ ও কোমল। এইখানে কবি তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যপূজার আত্মগত বিগ্রহটিকে নিজের মন্ত্রে আরতি করিয়াছেন।

শেষ পর্য্যন্ত ইহাই দাঁড়াইল যে, রবীন্দ্রনাথের এই উর্ব্বশী খোলাখুলি কামনা বা ইন্দ্রিয়-লালসার সৌন্দর্য্য নয়—তাহা বাহ্যতঃ Physical বা পার্থিব সৌন্দর্য্য হইলেও মানস পিপাসারই সামগ্রী ; আরেকটু শোধন করিয়া লইলেই তাহা "Pure aesthetic pleasure" বা খাঁটি সৌন্দর্য্যরস হইয়া উঠিবে। এখানে 'কামনা'র নামে অতিসূক্ষ্ম মানস-উৎকণ্ঠাকেই কবি এমন কবিত্বময় আবেগে মণ্ডিত করিয়াছেন। 'উর্ব্বশী'র ঐ নারী-রূপ তাঁহারই মানসী—সে নারী পুরুষমাত্রের হৃদিরক্তে চরণ রঞ্জিত করে না—স্যুইনবার্ণের কবিতায় তাহা করে। একদিকে স্যুইনবার্ণের আফ্রোদিতি, অপরদিকে কবির নিজের সেই মানসী-প্রতিমা—এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া কবিতাটির রস বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'তনুর তনিমা'—শব্দ যোজনায় ইংরেজী রীতি লক্ষণীয়—বিশেষ করিয়া, ঐ 'ধৌত' বিশেষণটি।

বিকশিত বিশ্ববাসনার, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> আজি এ বসন্তদিনে বিকশিত মন
> হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব্ব স্বপন,...
> নাহি দিন, নাহি রাত্রি, নাহি দণ্ডপল,
> প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
> যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
> একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।

['ধ্যান'—চৈতালি

সপ্তম ও অষ্টম স্তবক। ভাবার্থ :—আদি যুগের সেই সহজ ও সুস্থ সৌন্দর্য্য-প্রেম মনুষ্যসমাজে আর নাই, যে কল্পনা তোমার সেই সাগর-সম্ভবা, সদ্যোজাতা তরুণী-রূপ যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল সে কল্পনাও আর নাই। সেই উর্ব্বশী চিরদিনের মত অন্তর্হিতা হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ব-হৃদয়ে তাহার এক স্মৃতিময় বিরহ বেদনা আজও জাগিয়া আছে।

এই দুই স্তবকে মূল-কবিতার ভাব খণ্ডিত হইয়াছে, অথবা সেই ভাব-বিরোধ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এইজন্যই বোধ হয় কবিতাটির ওই অংশ একদা বৰ্জ্জিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে 'উর্ব্বশী'র যে কতকগুলি উপমা ও বিশেষণ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় নাই যে, ঐ উর্ব্বশী সর্ব্বযুগের নয়; তাহার জন্ম-ইতিহাস যেমনই হৌক, সে চিরদিন ঐ বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ে সমান আধিপত্য করিতেছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব হঠাৎ কবি সেই উর্ব্বশীকে 'অস্তাচলবাসিনী' বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন কেন? উর্ব্বশী যদি এই মর্ত্ত্য-লোকে আর নাই থাকিবে, তবে কাহার স্তনহার হইতে দিগন্তের তারা খসিয়া পড়ে? কাহার মদিরগন্ধে মুগ্ধ কবি মধুমত্ত ভৃঙ্গসম ফিরে লুব্ধচিত্তে উদ্দাম সঙ্গীতে? তাহার সেইরূপ অবশ্য কবিরাই দেখে। কিন্তু 'উর্ব্বশী' যদি নারী সৌন্দর্য্যের সাংভূতা মোহিনী রূপসী হয়, তাহা হইলে "জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা"— এ উক্তি কি এখনও সত্য নয়? অতএব কবির এই দীর্ঘশ্বাস হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি এখানে সেই কামনাবর্জ্জিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-পিপাসার কথাই বলিতেছেন, কিন্তু সেই উর্ব্বশী কোনকালেই "বিশ্বের প্রেয়সী" ছিল না—সে কবির "মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী"ই বটে। আবার যদি তাহা সেই আদিকালে আলো-বাতাসের মতই সহজসেব্য ছিল, এখন আর তাহা নাই—এমন অর্থ হয়, তবে এই কবিতায়, সেই মোহিনীর জন্য মানব হৃদয়ে কামনার যে বিষজ্বালার বর্ণনা আছে, তাহা তো সেই সুস্থ সহজ সৌন্দর্য্য পিপাসা নয়!

আদি যুগ পুরাতন, ইত্যাদি। এইরূপ একটি ভাব—ভিন্ন ভঙ্গিতে—'কল্পনা'র 'মদন-ভস্মের পূর্ব্বে'-নামক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব, ইত্যাদি। চিত্রটি চমকপ্রদ হইলেও—ভাবসঙ্গতির দিক দিয়া যথার্থ হয় নাই। পূর্ব্বে আছে "জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা"—যেমন কবিত্বময়, তেমনই ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, পুরুষের লালসাতুর রূঢ় কটাক্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া উর্ব্বশীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিতে থাকে—ঐ সমুদ্রবারিসিক্ত দেহ যেন অশ্রুবারিসিক্তের মত দেখায়, তাহা হইলে উর্ব্বশী মোহিনী অপ্সরা বা ইন্দ্রসভার নর্ত্তকী নয়, সে অসূর্য্যম্পশ্যা কুমারী অতি পবিত্র ও নিষ্কলুষ, যেন সেই রকম—

"বাসনা মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবেনা তায়"।

কিম্বা—

বিমল-হৃদয় আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিশ্বাস-রেখাছায়া?

['সুরদাসের প্রার্থনা'—মানসী

—সে এমনই পবিত্র, এমনই নিষ্কলুষ! এমন অর্থ নিশ্চয়ই এখানে সঙ্গত হইবে না।

আরও একটা কথা এই যে, সুন্দরীকে ঐরূপ নয়ন আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা আদিযুগেও যেমন ছিল, এযুগেও তেমনই আছে—তফাৎ এই যে, তখন, একালের মত—মনের অতিবুদ্ধির বশে—সেই পিপাসা বা কামনা এতখানি আত্মসচেতন ছিল না।

ফিরিবে না, ফিরিবে না, ইত্যাদি। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে আদিকালে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল,—সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহারা কত দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিল—যেমন উষা ও উর্ব্বশীর;—সেই সহজ সৌন্দর্য্য-প্রীতি মানুষ আর ফিরিয়া পাইবে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কবি নিজে যে সৌন্দর্য্যের উপাসক এখানে তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে; উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য নয়।

পূর্ণিমা নিশীথে যবে, ইত্যাদি। একদা উর্ব্বশী যেন অঙ্গ ধরিয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিত, তাহার সহিত একটা সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। আজ সে নয়নের অন্তরাল হইয়াছে, অথচ সেই যৌবন ও সেই বসন্ত এখনও তেমনই ধরাতলে গতায়াত করিতেছে; অর্থাৎ প্রাণের পিপাসা তেমনই রহিয়াছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সেই স্থূলভদর্শন আর নাই। তাই যৌবনের বসন্ত উৎসবেও একটা কিসের অভাব আমাদের হৃদয়কে আতুর করে, সকল মাধুরীই একটি নিগূঢ় বেদনার সুরে অশ্রুময় হইয়া উঠে। তুলনীয়—

> তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
> এত ব্যাকুলতা, অলস ঔদাস্যভরে
> মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
> শুষ্কপত্র ল'য়ে। বেলা ধীরে যায় চ'লে
> ছায়া দীর্ঘতর করি অশ্বত্থের তলে।
> মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
> বিশ্বের প্রান্তর মাঝে।

['যেতে নাহি দিব'—সোনার তরী

এবং কালিদাসের—

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকী ভবতি যদ্ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।

[অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্

—কালিদাস অবশ্য তাহার অন্যকারণ অনুমাণ করিয়াছেন।

* * * *

উর্ব্বশী কবিতার এই যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিলাম তাহাতে উহার অপূর্ব্ব গীতি-ঝঙ্কার এবং আবেগ-গভীর বর্ণাঢ্য ভাব-চিত্রাবলীর গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না; কেবল ইহাই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, Physical Beauty-কে অতিরিক্ত Idealise

করিতে গিয়া এবং তাহাতেও কাম বা কামনার নিকট-সম্পর্ক রাখিতে গিয়া, কবি-রবীন্দ্রের প্রেরণা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, য়ুরোপীয় কাব্য-কল্পনার প্রভাবই ইহার কারণ। এই উর্ব্বশী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আদর্শ নয় বলিয়াই এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহার নিজস্ব সৌন্দর্য্য-প্রেরণা এই কাব্যেরই 'বিজয়িনী' কবিতায় বিজয়িনী হইয়াছে। উর্ব্বশীতে কবি যে সৌন্দর্য্যের বন্দনা করিয়াছেন, তাহা Physical বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বটে, এবং তাহাতে ঐ নারী-রূপের অধ্যাসও যথার্থ হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু, কবি নিজের কবিধর্ম্মবশে সেই সৌন্দর্য্যকে অতিমাত্রায় Idealise বা মানস-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন, এজন্য ঐরূপ ভাববিরোধ ঘটিয়াছে। মানুষের রক্তমাংস ঘটিত সুখ-দুঃখ, কামনা বাসনার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহা অতিশয় সত্য যে —

> "Ideal physical beauty is incompatible with emotional development and a full recognition of the coils of things."

[Thomas Hardy

অর্থাৎ আদর্শ-সৌন্দর্য্যের সহিত হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ বা জীব-জন্মের বন্ধন-পীড়া—এ সকলের কোন সম্পর্ক নাই। শেষ দুই স্তবকে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এই অর্থে সত্য যে —

" Orthodox beauty may have had its way, and that human souls may find themselves in closer and closer harmony with external things wearing a sombreness distasteful to our race when it was young, ... Keeping with the moods of the more thinking among mankind "

[ঐ]

ভাবার্থ।—যাহাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য বলে তাহার দিন সম্ভবতঃ গিয়াছে। কালক্রমে মানুষের প্রাণ বহির্জগতের সেই সকল বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা অনুভব করিবে—যাহাদের রূপ বিষাদ-গম্ভীর .. মানবজাতির বাল্য বা কৈশোর বয়সে সেই রূপ তাহার প্রীতিকর ছিল না।... যাহাদের মনের উৎকর্ষ ঘটিয়াছে তাহারা চিন্তালেশহীন, সরল ও তরল সৌন্দর্য্য-রসের পরিবর্ত্তে ঐ গভীর-গম্ভীর সংযত কঠিন রূপগুলাই অন্তরে গ্রহণ করিবে।

স্বর্গ হইতে বিদায়

কবিতা-প্রসঙ্গ

একালের রবীন্দ্রকাব্যে একটি অনবদ্য কাব্য-কুসুম। কবিতাটিতে আধুনিক ('অতি আধুনিক' নয়) কাব্য, তথা সাহিত্যের যাহা মর্ম্মবাণী—সেই মানব-জীবন ও মর্ত্ত্যের ধূলি-কণার গৌরব-কীর্ত্তন আছে, যে সুরে এবং যে রূপময়ী ভাষায় তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে, বাংলা-

কাব্যে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু ঐ ভাববস্তুটি বাংলাকাব্যে নূতন নয়, এমন কি, এ-কবিতার ঐ প্রেরণা ও ভাবনা-ভঙ্গি সে-যুগের আদি-গীতিকবি বিহারীলালের কাব্যে প্রথম দেখা দিয়াছিল। বিহারীলালের কাব্য কোনকালেই সুপরিচিত ও প্রচারিত হয় নাই বলিয়া সহসা কথাটা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইবে; আমি পূর্ব্বে এই গ্রন্থে, তাঁহার যে কবি-পরিচয় ও কাব্য-পরিচয় সবিশেষভাবে ও সবিস্তারে করিয়াছি, তাহাতে এ গ্রন্থের পাঠককে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। বিহারীলালের ভাব-সাধনা যে কত মৌলিক, এবং পরবর্ত্তী বাংলা গীতি-কাব্যে তাঁহার প্রভাব যে কত গভীর, তাহার একটি প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি। শুধুই মর্ত্ত্যপ্রীতির কাব্য প্রেরণাই নয়,—সেই প্রীতিবিদ্ধ হৃদয়ের সহানুভূতি তিনি যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সরলতা ও আন্তরিকতা সমান চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটিকে বিহারীলালের সেই ভাব-বস্তুর একটি উৎকৃষ্ট রস-রূপ বলা যাইতে পারে—তাঁহার সেই অনুভূতি-মাত্রকে এই রূপরস রসিক অদ্বিতীয় বাণী-শিল্পী একটি পরিপূর্ণ কাব্য-রূপ দান করিয়াছেন।

বিহারীলালের সেই ভাবগুলি এইরূপ। 'সাধের আসন' নামক কাব্যের একস্থানে কবি কল্পনায় স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া, এবং সেখানে এক মর্ত্ত্যবাসিনীকে দেখিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই মর্ত্ত্যপ্রীতির এক নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে—

আমি ভূমণ্ডলবাসী
স্বর্গেতে বেড়াতে আসি
করি নাই ভাল কাজ,
মনে-মনে পাই লাজ,
এখানে সকলই যেন স্বপ্নের রচনা!

*　　*　　*

(কেহ)

জীবন্ত মানুষ হেথা দেখিতেই চাহে না।
আপনার ভাবে ভুলে,
কহি আমি প্রাণ খুলে—
মধুর উজ্জ্বল ভাষা
পরিপূর্ণ ভালবাসা।
বুঝি কি অদ্ভুত ঠ্যাকে,
মুখপানে চেয়ে থাকে,
সদয় হৃদয়ে কেহ ধীর হ'য়ে শোনে না,
বুঝিতেও পারে না।

তারপর স্বর্গে সেই নবাগতা মানবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

স্বর্গে অমৃতসিন্ধু—
পাই নাই একবিন্দু……

[ইহা সেই—"Water water every where, not a drop to drink!"]

তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন—
পেয়ে এ অদ্ভুত-লোকে জুড়ালো তৃষিত মন।

রবীন্দ্রনাথের এ কবিতারও মূল মর্ম্ম—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত—
মর্ত্ত্যে থাক সুখে-দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত—
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

কবিতা-পাঠ

পুণ্যবল হল ক্ষীণ, ইত্যাদি। স্মরণীয়, গীতা—

"—তে তং ভুংক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

[৯।২১

শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি। তুলনীয়—

কিছুই কামনা নাই
মনে মনে ভাবি তাই,
কেন বা পশিতে চাই
দেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে ?

[সাধের আসন, চতুর্থ সর্গ

অশ্বত্থশাখার প্রান্ত হতে, ইত্যাদি। একটি উৎকৃষ্ট উপমা। এইরূপ উপমা রবীন্দ্রকাব্যের একটি অনন্যসাধারণ গৌরব। ইহার মূলে আছে, সেই শক্তি—রবীন্দ্রনাথ যাহাকে বিশ্ব-সৃষ্টিরই একটি গূঢ়-গভীর রহস্য বলিয়াছেন, সেই "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।" কবি-রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতেও তাহাই হয়—ভাব রূপে, এবং রূপ ভাবে বিপরিবর্ত্তিত হয়—'অশ্বত্থশাখার জীর্ণতম পাতা'—কবির দৃষ্টিতে পড়িবামাত্র, একটা ভাবে পরিণত হইয়াছে, ভাব ও রূপের মধ্যে ঐ যে নিখুঁত সাদৃশ্য—তাহাতেই রবীন্দ্রনাথের উপমাগুলি এমন সার্থক হইয়া উঠে।

সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, ইত্যাদি। এইখান হইতে 'নন্দনবনে কুসুম-মঞ্জরী' পর্য্যন্ত পংক্তিগুলিতে, স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও মর্ত্ত্যের প্রেম—তুলনাচ্ছলে এই দুইকে মিলাইয়া, কবি এক অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছেন ; স্বর্গের উপরেই মর্ত্ত্যের আলো প্রতিফলিত হইয়াছে—মর্ত্ত্যই জয়ী হইয়াছে। পংক্তিগুলি মুখস্থ করিবার মত।

সন্ধ্যা আসি দিবা-অবসানে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

আমাদের মর্ত্ত্যভূমে
কেহ জাগে, কেহ ঘুমে,
সূর্য্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয়,
এ চির-পূর্ণিমানিশি তেমন সুন্দর নয়।

[বিহারীলাল

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে, ইত্যাদি। এইখান হইতে 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' পর্য্যন্ত—এ কবিতার ভাববস্তু একটি সংক্ষিপ্তসার। তুলনীয় (কবি তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—

চাই না সে স্বর্গ যথা না পাই তোমায়।
ভুলে কি আমার মন অমর বালায়?
কোথায় পাইবে প্রেম করুণ এমন!
নাই দুখলেশ যথা
করুণা না বসে তথা,
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম-আস্বাদন?
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ!

হে মাতঃ ধরণি, বসি হৃদয়ে তোমাব
সুখে-দুখে কিশোরান্ন আহাব আমার।
পরলোক-পায়সান্ন নাহি চায় প্রাণ
তব ভাল মন্দ যাহা
আমার অভ্যাস তাহা
পরলোক? পরলোক সংশয়নিদান,
বিশেষ তোমাব সম প্রিয়া বিদ্যমান।

[মহিলা-কাব্য

[উপরের ঐ পংক্তিগুলি কাব্য হইয়া উঠে নাই বটে—কিন্তু ভাব-অর্থের মৌলিকতায় জ্বল জ্বল করিতেছে! উহার ঐ ভাষা নিরতিশয় গদ্য হইলেও উপমাগুলি যেমন সরল, তেমনই ভাব-গভীর। তথাপি উহা যে কোন্ গুণের অভাবে কবিতা হইয়া উঠে নাই তাহা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে; এমন দৃষ্টান্তও আর মিলিবে না। সেই গুণ কি? পাঠক নিজেই তাহা অনুভব করিবেন, বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। অতএব, ভাব-চিন্তা মৌলিক ও উৎকৃষ্ট হইলেই তাহা যে কাব্য-গৌরব লাভ করে না, এবং মৌলিক না হইলেও উৎকৃষ্ট কবিতার তাহাতে গৌরবহানি হয় না—এই তত্ত্ব অতিশয় সত্য।]

স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান, ইত্যাদি। তুলনীয়—

কেবল পরমানন্দ,
কে যে বিষম ধন্দ
বিকল্পবিহীন দশা না জানি কেমন!...
নিরলিপ্ত পাপ-পুণ্যে
থাকা শুধু শূন্যে শূন্যে,
সদাই কেবলই সুখ,—
হা কি কষ্ট! কি অসুখ!

[সারদামঙ্গল, ঐ

ধরাতলে দীনতম ঘরে, ইত্যাদি। এই পংক্তিগুলি এ কবিতার দ্বিতীয় কাব্য-তরঙ্গ; ইহার ভাষায়, বর্ণনার রসোল্লাসে কি অপূর্ব্ব লিরিক মূর্চ্ছনা! ইহাই উৎকৃষ্ট রবীন্দ্রীয় কাব্যরস, কবির

শেষ-বয়সের কবিতায় এ রস আর নাই—না থাকাই স্বাভাবিক ; তাঁহার সেই কঠিন আত্মতান্ত্রিক মানসিকতা, এবং ভাষা ও ছন্দের নিছক আর্ট—অতি আধুনিক মনোবিলাসীদের বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। তুলনীয়—

সদানন্দময়ী আনন্দ রূপিনী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিময়ী ;
মানস-সরস-বিকচ-নলিনী
আলয়-কমলা করুণাবতী !
প্রিয়ে ! তুমি মম অমূল্য রতন !
যুগ-যুগান্তরে তপের ফল ;
তব প্রেম-স্নেহ-অমিয়-সেবন
দিযাছে জীবনে অমব বল।
* * *
হেন ধবাধাম থাকিতে সমুখে,
সুরলোকে লোকে কেন রে ধায !
নবে কি অমবে আছে মনসুখে,
যদি কেহ মোরে সুধা'তে চায়।—
অবশ্য বলিব, নারীর মতন
সুখ শান্তিময়ী অমৃত লতা
নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন—
শচী, পারিজাত—কপোল-কথা।

['প্রিয়তমা'—বঙ্গসুন্দরী

জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে, ইত্যাদি। এইরূপ জীবনকেই ইংরেজীতে 'Idyllic' বলে। কুমারীদের জন্যে কত ব্রত, কত আচাব-অনুষ্ঠান এককালে আমাদের সমাজে ছিল, এখন আব নাই—সেই Arcadia বা স্বভাব-সুন্দব সবল জীবন যাত্রা—সেই স্নেহ-প্রেমের বৃন্দাবন আর নাই। কবি গ্যেটে যথার্থই বলিয়াছেন—"Superstitions are the poetry of life."

দেবগণ, মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ, ইত্যাদি। তাহা হইলে স্বর্গের মোহ তখনও ঘুচিবে না ! কাবণ, ইহা দ্বারা স্বর্গকেই শ্রেষ্ঠ সুখের স্থান বলিয়া স্বীকার করা হইল ; অথচ, যে সুখ তিনি এখানে বর্ণনা করিতেছেন, স্বর্গে তাহা নাই। বরং ইহাই আরও সত্য—

শচীর ঘুমন্ত মুখ—দেবরাজ, দেখনি ?
মহাসুখে মহিয়সী আমাদের অবনী।

[সাধের আসন : বিহারীলাল

এই কবিতাটিতে কবিত্ব-কল্পনা একটু অসাবধান হইয়াছে।

অয়ি দীনাহীনা, ইত্যাদি। এইখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই কাব্যরসের উচ্ছ্বাস আর নাই, এ যেন অনেকটা ওকালতীর মত শুনাইতেছে।—যেন বক্তৃতায় উপসংহার। পূর্ব্বে দুইবার

যে দুইটি প্রেয়সী-বন্দনা আছে তাহার সহিত তুলনা করিলেই, ভাবের ঐ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যাইবে। তথাপি মর্ত্ত্যভূমিকে মাতৃভূমি বা মূর্ত্তিমতী জননীরূপে এই যে স্তুতি তাহারও কবিত্ব অল্প নহে, কেবল সেই খাঁটি গীতিসুর তাহাতে নাই।

তব নীলাকাশ, তব আলো, ইত্যাদি। 'বসুন্ধরা' বিতা দ্রষ্টব্য।

বিন্দু অশ্রুজলে, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সেই বিরহ-ব্যথা জানিবামাত্র একসঙ্গে সকলই মনে পড়িতেছে।

দুঃখে-সুখে-ভয়ে-ভরা প্রেমের সংসারে। কারণ—

বেদনা বিহনে কোথা প্রেম-আস্বাদন ?

[পূর্ব্বে দেখ

তবু জানি মনে, ইত্যাদি। কবিতাটির কাব্যকল্পনা ও গীতিরসোচ্ছ্বাস যে কেমন তাহা আমরা দেখিয়াছি ; সেই রস এমনই যে, তাহা পানকালে, মনে আর কোন প্রশ্নের উদয় হয় না। কিন্তু কবি ঐ যে ক্ষীণ-পুণ্য, স্বর্গভ্রষ্ট মানবের মুখে মর্ত্ত্য-মাতৃভূমির এমন মহিমা গান সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—কবিতাব ঐ setting, বা স্থান-কাল পাত্রের সংযোজনা যতই নাটকীয় হউক—পাত্রটি তেমন উপযুক্ত হয় নাই ; কারণ পূর্ব্বে বহুশত বৎসর স্বর্গসুখ-ভোগের কালে তাহার ঐ বিরহ জাগে নাই, আজ স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইবার সময়ে তাহার হৃদয়ে ঐ মর্ত্ত্যপ্রীতি উথলিয়া উঠিয়াছে ; যেন সেই পুনর্মূষিক অবস্থা অনিবার্য্য ও অখণ্ডনীয় বলিয়াই সে প্রাণপণে তাহারই মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া নিজ হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতেছে ; এতদিন পরে 'পুত্রহারা জননী'কে তাহার মনে পড়িয়াছে। বহুদিন বিলাত-স্বর্গে বাস করিয়া যখন পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে, তখন দেশে ফিরিতে বাধ্য হয় বলিয়াই বুদ্ধিমান বাঙালী সন্তায় যেমন হঠাৎ স্বদেশ-প্রেমিক হইয়া পড়ে—ইহাও যেন সেইরূপ। কিন্তু কবিতা পাঠকালে এতখানি বাস্তব জ্ঞান না থাকাই ভালো, থাকিলে বহু উৎকৃষ্ট কবিতার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইতে হয়।

দিন-শেষে

কবিতা প্রসঙ্গ

খাঁটি রবীন্দ্রীয় লিরিক। ইহাকে 'সন্ধ্যার সুর' নাম দেওয়া যাইতে পারে। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির প্রদোষকালীন শোভাকে কবি কাব্যচ্ছন্দে—পূরবী-রাগিণীতে—একইকালে সঙ্গীত ও চিত্রকলার বিষয় করিয়াছেন।

কবিতা পাঠ

প্রথম স্তবক। কবিতাটির এই Stanza-রচনা রবীন্দ্রীয় ছন্দ-শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ; ছন্দ-নির্ম্মাণে এমন সাঙ্গীতিক সুর-যোজনা বাংলা ভাষায় পূর্ব্বে বা পরে দেখা যায় নাই। মাঝের ঐ ত্রিপদী মিলগুলি এবং শেষে একটি পূর্ব্ব-পদের পুনরাবর্ত্তন—মাত্র ঐটুকু বিন্যাস-

কৌশলে, স্তবকগুলি অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে। মূল ছন্দটি চতুর্মাত্রিক পর্ব্বভাগের ছন্দ, শেষ একটি তিন মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব আছে, যেমন—

বেলা শেষ। হয়ে এল। আঁধারিল।—ধরণী ॥

প্রায়ই দুই-পর্ব্ব যুক্ত হইয়া আটমাত্রা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সেখানেও (৪+৪) ই আছে, (৩+৩+২) নাই। যথা—

অমনি ক। থা না বলি। ভরাঘট। ছল ছলি

—ঐ শেষেব দুই পর্ব্ব দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় স্তবক। নামিছে নীরব ছায়া, ইত্যাদি। প্রথম স্তবকেব সেই তরুণীটি দ্বিতীয় স্তবকে, সন্ধ্যাব নিস্তব্ধ কাননচ্ছায়াকে তাহার ঐ কাঁকন-ধ্বনিতে করুণ-বিধুব কবিযা তুলিয়াছে, সে যেন মূর্ত্তিমতী গ্রাম-লক্ষ্মী, ঐ সন্ধ্যাব রূপ তাহাবই রূপ। এমন প্রকৃতি-চিত্রাঙ্কন বাংলা কাব্যে আব কোথাও নাই।

ইহাও লক্ষনীয় যে, ঐ চিত্র যতই রূপময় হউক, সেই রূপ-রং-বেখার সর্ব্বাঙ্গ-সঞ্চাবী সুবই আমাদিগবে রসাবিষ্ট কবে। ইহাব মূলে কোন্ বিশিষ্ট কাব্য-মন্ত্রের প্রেবণা আছে, তাহাও স্মরণীয়, আমি তাহাকেই ববীন্দ্র-কবিধর্ম্মেব তথা সমস্ত ববীন্দ্র-কাব্যের বীজমন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি – কবিব কাব্য-প্রেবণা ও কাব্যকলা যতই বিচিত্র ও বহুরূপা হউক, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই এক কবি-প্রকৃতিব নব-নব রস সৃষ্টিব লীলা তাহাতে আছে।

শুধু এ সোনার সাঁঝে, ইত্যাদি। কবিতার এই কয় পংক্তিতে ভাষাব কাব্য-কলাও চবমে পৌছিয়াছে। 'সোনাব সাঁঝে'—গোধূলির স্বর্ণবর্ণ আকাশ। 'কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে'—বাক্যটির ঐ গঠন (Syntax) উৎকৃষ্ট কাব্যকলার নিদশন, ঐ অতি সংক্ষিপ্ত শব্দ-যোজনাব কৌশলে কতখানি প্রকাশ পাইয়াছে। কলসের জল মৃদু ছলকিয়া উঠিতেছে, সেইসঙ্গে তরুণীর কবমূলের অলঙ্কারও মৃদুঝঙ্কাব করিতেছে। আবাব, ঐ 'কাঁদিয়া বাজে' কথাটিতে, সন্ধ্যার করুণ সুব যেন অলক্ষিতে আমাদের প্রাণে প্রবেশ কবে।

তৃতীয় স্তবক। গ্রামে কোন বড জমিদারের ঠাকুব-বাড়ী, তাহারই মন্দির চূড়া দূরে দেখা যাইতেছে—সন্ধ্যাকাশেব শেষ অস্তচ্ছটা তাহাব ত্রিশূলকে সুবর্ণমণ্ডিত কবিয়াছে। আমাদেব গঙ্গাতীবের গ্রামে এমন দৃশ্য দুর্ল্লভ নহে। তুলনীয়—

বজ্রসেন বন হ'তে ফিরিল যথন—
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ বরণ
মন্দির ত্রিশূল-চূড়া জাহ্নবীর পারে।

['পরিশোধ'—কথা

চতুর্থ স্তবক। জমিদারেব বৈঠকখানা-বাড়ীতে গানের আসর বসিয়াছে—ওস্তাদ-কণ্ঠের সন্ধ্যারাগিণীর সুর দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে, তাহাতে পথিকের প্রাণ সেই সন্ধ্যাচ্ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে আরও উদাস হইয়া যায়।

ভাল নাহি লাগে আর, ইত্যাদি। এই দুই পংক্তিও ভাবের সহিত ভাষার সুর-সঙ্গতিতে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চম স্তবক। সন্ধ্যাকালের শ্রান্তি ও ক্লান্তি। প্রত্যেক দিনই যেন সারাজীবনের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ; জীবন শেষের মতই দিন-শেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত মানুষ আর কিছু চায় না—চায় কেবল—বিশ্রাম। তখন, দিবসের সেই কর্ম্মব্যস্ততা নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। 'বেচা কেনা'—অর্থাৎ, সংসারের হাটে লাভের প্রত্যাশায়, ছুটাছুটি করা। প্রাণ তখন ঘরে ফিরিতে চায়—স্নেহ-প্রেম, সেবা ও শুশ্রূষার জন্য আকুল হইয়া উঠে। তাই নদীপারের পথিক গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া, প্রথমে সেই সন্ধ্যার দৃশ্য, পরে গৃহাভিমুখগামিনী সেই বধূটিকে দেখিয়া, তাহার প্রবাসী হৃদয়ে একটা বড় ক্ষুধা অনুভব করিতেছে। ইহাই এ কবিতার মূল প্রেরণা। প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের এই ঘনিষ্ঠ যোগ রবীন্দ্রকাব্যের অধিকাংশ লিরিকের রস-প্রেরণা হইয়াছে। এই কবিতার এই শেষ স্তবকে সেইরূপ একটি mood বা কবি-ভাবের সুন্দর পরি-সমাপ্তি হইয়াছে। লিরিক কবিতার যতকিছু গুণ সকলই ইহাতে আছে, তাহারও অধিক কিছু আছে—ভাষা ও সুরের অসাধারণ কারুকর্ম্ম।

সান্ত্বনা

কবিতা প্রসঙ্গ

আরেকটি উৎকৃষ্ট লিরিক। অতি-সাধারণ নিত্যকার জীবনে অন্তরানুভূতিকে কবি কল্পনার মহিমা ও সুরের মধুরিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ঐরূপ ঘটনা খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন পুরুষের জীবনে প্রায়ই ঘটে, আমাদের একালের কাব্যে আরও একাধিক কবি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, পরে তাহা উদ্ধৃত করিব। রবীন্দ্রনাথই পূর্ব্বে আরেকটি কবিতায় (প্রেমের অভিষেক) এইরূপ ঘটনায় অন্যরূপ সান্ত্বনা সৃষ্টি করিয়াছেন; সেখানে সেই পুরুষ কবি, এখানে —সাধারণ মানুষ; এজন্য একবিতার ভাববস্তু সার্ব্বজনীন, ইহার রস-সংবেদনা আরও বাস্তব। ঐ ঘটনা এবং উহার ঐ সান্ত্বনা দম্পতী-জীবনের একটি সার্ব্বভৌমিক সত্য হইলেও, আর কোন দেশের কবি উহাকে এতখানি মাধুরীমণ্ডিত করিতে পারিবেন না, তাহার কারণ, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহলক্ষ্মীর একটি বিশেষ স্নেহময়ী রূপ আছে, আর কোথাও তাহা এমন লক্ষ্য-গোচর হয় না। আরও দুইজন বাঙ্গালী-কবি গৃহলক্ষ্মীর ঐ রূপ দেখিয়াছেন, যথা—বিহারীলাল—

> প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার!
> সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার
> হয়ে বড় জ্বালাতন
> করি অন্ন আহরণ,
> ঘরে এলে উলে' যায় হৃদয়ের ভার।
>
> [সারদামঙ্গল

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—

এ সংসারে আশাভঙ্গ, অরির পীড়ন
খলের খলতা নাহি ভোগে কোন্ জন ?
সব দুখ ভুলি দেখে বদন তোমার।
বাঁচে মরে মম তরে—
আছে হেন ধরা' পরে,
এ হ'তে কি আছে আর ক্ষোভ-প্রতিকার ?
আছে হৃদি—নির্ভরিতে হৃদয় আমার।

[মহিলা-কাব্য

কিন্তু কবি-রবীন্দ্রের এই কবিতা কেবল ভাব ও অর্থের কবিতা নয়, সেই ভাববস্তুকে রঙে রূপে ও বীণার অমৃত ঝঙ্কারে কবি অপূর্ব্ব কাব্য করিয়া তুলিয়াছেন,—এই আর্টই বাংলা কাব্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

কবিতা পাঠ

প্রথম স্তবক। হেথায় প্রান্তরপারে নগরীর একধারে…বাসরের রাণী।
তুলনীয়—

এপারে নির্জ্জনতীরে
বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়ন-তলে,
সঞ্চাবিত ইন্দুমল্লী বল্লবী বিতানে,
ঘনছায়ে নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা।

['আবেদন'

ভাবের দিক দিয়া এই তুলনা বড় মুগ্ধকর। এখানে গৃহলক্ষ্মী, সেখানে বিশ্বলক্ষ্মী ; এখানে ঐ সামান্য রমণীও যেন সেই বিশ্বেশ্বরীর মানবী-সংস্করণ ; তফাৎ এই যে, 'আবেদন' বা 'প্রেমের অভিষেক'—কবিতা দুইটিতে তিনি কবির মানস-লক্ষ্মী, এখানে তিনিই হইয়াছেন গৃহীর গৃহলক্ষ্মী। বিহারীলালের সেই একটি বিশেষ কবি-ভাব যেন এই সকল কবিতায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি কাব্যলক্ষ্মীকে ও গৃহলক্ষ্মীকে তাঁহার সেই এক ইষ্টদেবতারূপে বন্দনা করিয়াছেন—

মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে,
যে যেমন তার ঘরে
তেমনি মুরতি ধরে।

[সাধের আসন

এ যে দুজনের দেশ·· নূতন ভুবন। তুলনীয়—

হেথা বেণুবতী তীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জ্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল-বিস্মৃত।

['বিদায়-অভিশাপ'

—ঐ 'অভিনব স্বর্গ-লোক', 'নূতন ভুবন'—উহাই "Love's rare Universe"। এই কবিতায় যুগল-প্রেমের 'নিখিল-বিস্মৃত' যে সুখের ধ্যান আছে, তাহা সম্ভবতঃ আর কোন জাতির কাব্যে এমন ভাষায় বর্ণিত হয় নাই ; এই যে নিছক ভাবময় অনুভূতি-কল্পনা, ইহাই রবীন্দ্র কবি-মানস তথা কবি-প্রতিভার অনন্যসাধারণ গৌরব ; আমি ঐ মানস-অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও তীব্রতার কথা, বহুপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—কবি জীবনের আরম্ভে, কবিশক্তি-উন্মেষেরও বহুপূর্ব্বে, রবীন্দ্র-কবি ঐ অনুভূতি ও তজ্জনিত ভাবুকতা সেই প্রথম বয়সের কাব্যগুলির প্রেরণা হইয়াছে। [প্রথম পর্ব্ব—'পর্ব্বশেষে' দেখ]

এই কবিতায় আরও লক্ষণীয় এই যে, এখানেও কবির সেই একান্ত-নির্জ্জন আত্মভাব-সাধনার জগৎ, ঐ প্রেমের মিলনসুখ-কল্পনায় একটি অপূর্ব্ব মহিমা লাভ করিয়াছে ; ঐ দম্পতী-জীবন বাস্তব সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত, তাহাতেও—

সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।

['প্রেমের অভিষেক'

ঐ 'নিখিলের সবশেষ' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাও নূতন নয়—ঐ ভাবটি কবির বড় ভাল লাগে, যথা—

থামিয়া গেল অধীর স্রোত, থামিল কলতান,
মৌন এক মিলন রাশি তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি ;
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

['অপেক্ষা'—মানসী

—উহাই 'নিখিলের সবশেষ'। সেখানেও যেমন—

'আঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে'

এখানেও তেমনি—

"চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি'
মায়ামন্ত্র-ঘের।"

তথাপি, এইবার, কবি যুগল-প্রেমকে দম্পতী-জীবনের মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাতেই এমন লিরিক মূর্চ্ছনা যুক্ত করিয়াছেন যে, ঐ বাস্তবও এমন স্বপ্নময় হইয়া উঠে।

তৃতীয় স্তবক। এই স্তবকে সেই 'অর্দ্ধনারীশ্বর'-তত্ত্বই যেন সম্ভোগের নানা উপায় কুশলতায় এমন প্রত্যক্ষ, হৃদয়গোচর হইয়া উঠিয়াছে।

একটি চুম্বন গড়ি, ইত্যাদি। কবির একাগ্র কল্পনা পর-পর কয়েকটি চিত্রযোজনাকালে হঠাৎ এমন একটি বস্তু আবিষ্কার করিয়াছে যাহাতে, সেই 'ভাগ' করার কাজও পূর্ণ একাত্মতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তথাপি, এই স্তবকে কবির কল্পনা বাস্তবকে বড় বেশী ছাড়াইয়া গিয়াছে,—সাধারণ গৃহস্থের গৃহিণীকে কবি 'কালিদাসের কালে' লইয়া গিয়াছেন, সে যেন একান্তই কাব্যজগতের রোমান্সের সেই "bride of ancient songs"; 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতায় ঠিক এইরূপ হইয়াছে, তবু সেখানে একটা রূপকথার কল্প-পরিবেশ আছে, এখানে তাহা নাই। যাহা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর—মৃৎকুটিরেও ঐ কনক-প্রদীপ জ্বলে বলিয়াই যাহা এমন মহিমময় কবি তাহার কথাই বলিতে গিয়া সৌন্দর্য্যের রসাবেশে এমন চিত্র আঁকিয়া বসেন, যাহা দরিদ্র, জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত অপমানাহত পুরুষের গৃহে স্বাভাবিক নয়। দরিদ্র কেরাণীর ঘরে এমন বিলাসবতী পত্নীর আবির্ভাব শুধুই অবাস্তব নয়—মূল ভাবটির পক্ষেও ক্ষতিকর। এমন অর্থও করা যাইতে পারে বটে যে, ঐ পুরুষ নিজে শত কষ্ট, শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও তাহার প্রাণসমা পত্নীকে যতদূর সাধ্য সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখে, যেমন—

আমারে পরাতে বাস সাজাতে সুন্দরী-সাজ
সে সহিত কতই লাঞ্ছনা। ...
পিরাণে বোতাম নাই পাদুকাটি অর্দ্ধ-ছিন্ন
মোর হস্তে পরাত বলয়।

[অশোক গুচ্ছ—দেবেন্দ্রনাথ

তথাপি এ কবিতার ঐরূপ বাস্তব-হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে কবির সৌন্দর্য্য-পিপাসা কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছে।

চতুর্থ স্তবক। রুদ্ধকণ্ঠ গীতহারা, ইত্যাদি। এই শেষ স্তবকটির সহিত তুলনীয়—

নিশি দু'পহরে পঁহুছিনু ঘর
দু'হাত রিক্ত করি,
তুমি আছ এক সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি'।
চোখে ঘুম নাই কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী সম এলে মোর বুকে,—
আছে আছে, বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি,
আমারো ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলি ফাঁকি।

['কৃতার্থ'— ক্ষণিকা

'ক্ষণিকা'র ঐ কবিতার সহিত 'চিত্রা'র এই কবিতার তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, দুই কবিতার ভাববস্তু এক, সেদিক দিয়া 'ক্ষণিকা'র কবিতাই আরও সার্থক হইয়াছে। 'চিত্রা'র কবি-মানসে

ভাবের 'পাক' বা 'রস-পক্কতা' অপেক্ষা কবির রসপিপাসাই প্রবল, অর্থাৎ বিষয়-নিষ্ঠা অপেক্ষা আত্মভাবনিষ্ঠাই অধিক। এজন্য এইকালের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতার মূল প্রেরণা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—যাহাকে Unity of Inspiration বা একটা 'Organic wholeness' বলে, তাহা প্রায়ই খণ্ডিত হয়; আমরা ঐ কেন্দ্রভ্রষ্ট-কল্পনার খণ্ড-খণ্ড ভাব ও মনোহর চিত্র-রচনায় মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু ভাবের রস-সমগ্রতার গভীরতর রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত হই।

পুরাতন ভৃত্য

কবিতা-প্রসঙ্গ

সেকালের দেশীয় সমাজে ও পরিবারে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর এবং প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতির মধ্যে যে সুগভীর আত্মীয়তা-বন্ধন ছিল, অনেক সময়ে আত্মীয় অপেক্ষা ঐরূপ সম্পর্কের মানুষ যে নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালবাসার পরিচয় দিত, এ কবিতায় কবি তাহারই একটি মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী উৎকৃষ্ট গাথার আকারে রচনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা করিবার কিছু নাই, করিলে তাহাতে কবিতাটির মর্য্যাদাহানি হইবে; তথাপি, এইরূপ রচনায় কবিশক্তির দুইএকটি লক্ষণ বিচারযোগ্য। প্রথমতঃ উহাতে ঐ বাস্তবের বর্ণানুলেপ, ('যেতে নাহি দিব' কবিতাটির আরম্ভ-অংশ স্মরণীয়); দ্বিতীয়তঃ সমাজ ও সংসারে সবচেয়ে ছোট বা নগণ্য যাহারা তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, সেই সুখ-দুঃখকে মানবতার মহিমায় মহিমান্বিত করার আশ্চর্য্য অনুভূতি-কল্পনা। এ বিষয়ে, কবি তাঁহার 'পঞ্চভূত' নামক গ্রন্থে 'মনুষ্য' শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণীয়। প্রথম-পর্য্যায় 'গল্পগুচ্ছে' কবির এই শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় ঐকালে কবি-জীবনে একটি বিশেষ লগ্ন আসিয়াছিল; এতবড় ভাববাদী, ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী কবিও একটি বিশিষ্ট আর্ট-প্রেরণার বশে, চতুর্দ্দিকের জীবনযাত্রায় নর-নারীর অতি-বাস্তব এবং প্রচ্ছন্ন-কাহিনীগুলিকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবিষ্কার করিয়াছিলেন! এইরূপ আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁহার একালের একটি কবিতায় আছে বটে, যথা—

> ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
> গল্প লিখি একেকটি ক'রে।...
> ছোটপ্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
> নিতান্তই সহজ সরল,—
> সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
> তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।...

['বর্ষাযাপন'—সোনার তরী

এই আকাঙ্ক্ষাই কবিজীবনের একটি লগ্নে—সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের কাব্যধারাকে মাটির উপরে প্রবাহিত করিয়া উপলমুখরিত করিয়াছে। একথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্রে

ধূলাও ধূলি হইয়া পুষ্পরেণু বা কুঙ্কুম-চূর্ণের রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু একালের এই রচনাগুলিতে আমরা সেই ধূলিকেই হৃদয়রাগের শ্যামলতায়—তাহার সেই প্রাকৃতিক বর্ণসুষমায় রঞ্জিত হইতে দেখি; সেই রং তাহারই রং, কবি কেবল তাহাতে তাঁহার অনুভূতির বারিসিঞ্চন করিয়া তাহাকে শ্যামলতর করিয়াছেন।

কবিতা-পাঠ

যত পায় বেত না পায় বেতন, ইত্যাদি। ঐ দুইটি গুণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কেষ্টা বাল্যকাল হইতেই ঐ সংসারে স্নেহের প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে—সে পাকা চাকর হইতে পারে নাই; ঐ 'বেতন' পাওয়া অপেক্ষা 'বেত', অর্থাৎ কটু তিরস্কার লাভ তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। পরে, নূতন গৃহিণীর আমলে সে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি, সে না পারে নিজেকে সংশোধন করিতে, না পারে সেই সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে। তার কারণ, ঐ গৃহ যে তাহারও গৃহ—ঐ বাবুকেও সে বাল্যকাল হইতে সেবা করিয়াছে, তাহার চেয়ে আপনার জন যে কেহ নাই। সেই কেষ্টার চেয়ে বড় আপনজন বাবুরও যে ছিল না—এই গল্পটির তাৎপর্য্য তাহাই।

কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, ইত্যাদি। এই দুই পংক্তির হাস্যরস বড়ই দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকেই ইংরাজীতে 'Irony' বলে। শেষের পংক্তির ঐ যমকটিও ('চিরবসন্ত—আমি বসন্তে') শুধু কাব্যালঙ্কার নয়—গল্পটিকে কেমন সুকৌশলে একটা আকস্মিক পরিণামে আনিয়া ফেলিয়াছে। ইহা একাধারে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং গল্প-রচনার শ্রেষ্ঠ আর্ট।

এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, ইত্যাদি। সমগ্র কবিতাটির মর্ম্ম এই একটি পংক্তিতে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

দুই বিঘা জমি

কবিতা-প্রসঙ্গ

বাংলার সাধারণ পল্লীবাসীর জীবনে একটি প্রায় চিরাচরিত অন্যায়ের নিরুপায়-বেদনাকে কবি এমন উচ্চসুরে বাঁধিয়াছেন যে, এই কবিতার ঐ বাস্তু ও জন্মপল্লীর কাহিনীই খাঁটি স্বদেশ-প্রেমের গাথা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী-জীবন ও বাঙালী-চরিত্রের দিক দিয়া ঐ বাস্তু-প্রেম অতিশয় সত্য—উহাই বাঙালীর একটি বিশেষ হৃদয়ধর্ম্ম, ঐ পল্লী, এবং ঐ পৈত্রিক 'সাতপুরুষের ভিটা'ই বাঙালীর জাতি, ধর্ম্ম ও দেশের মূলগ্রন্থি ছিল—ঐ মমতাই তাহার মনুষ্যত্বের একটা বড় উপাদান ছিল। এমনি করিয়া যাহা সহজ ও সুলভ, যাহা উচ্চ নয়, তুচ্ছ—যে কাহিনীতে রাজা ও রাজ্যের ইতিহাস-গৌরব নাই—সেই 'দুই বিঘা জমি'র শোক, কেবলমাত্র মানবহৃদয়-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া, দেশ-দেবতার পূজামন্দিরে এমন মহার্ঘ নৈবেদ্য হইয়া উঠে!

কবিতা-পাঠ

সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ, ইত্যাদি। 'কবিতা প্রসঙ্গ' দেখ। একালের আমরা—'নেশনধর্ম্মী' বাঙালীরা ইহা বুঝিতে পারিব না, একবিতাও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে, ইত্যাদি। আজ এই দিনে পূর্ব্ববঙ্গের বাস্তু-হারাদের প্রাণে ইহার মত সত্য আর কিছু নাই।

নমোনমো নম, সুন্দরী মম, ইত্যাদি। বাংলা কাব্যে এমন দেশপ্রেমের—বঙ্গজননীর বাস্তব অঙ্কটির, অর্থাৎ পল্লী-লক্ষ্মীর সর্ব্বাঙ্গশোভার স্তোত্রগান আর কোথাও নাই; এই প্রেম উচ্চ ভাব-কল্পনার, কবিত্বময় প্রেম নয়—একেবারে ধূলামাটির সহিত পরমাত্মীয়তার প্রেম; ইহা যেমন বাস্তব, তেমনই রক্তগত। প্রথম কয়পংক্তিতে পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লী-জীবন, এবং শেষের পংক্তিগুলিতে গ্রামের যে চিত্র আছে, তাহা এখনও বাস্তব হইতে মুছিয়া যায় নাই।

নিলাজ কুলটা ভুমি। ভাবাবেগের আতিশয্য থাকিলেও, পরে যে বর্ণনা আছে তাহাতে ঐরূপ অভিযোগ বড়ই যথার্থ হইয়াছে। 'ভূমি' এবং 'নারী' দুইই এককালে বীরভোগ্যা ছিল; আমাদের বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'যার লাঠি তার মাটি'। এখন সভ্যতার যুগে লাঠির বীরত্ব আবশ্যক হয় না—মিথ্যাচার ও শঠতাই—নারীর সম্পর্কেও সতীত্ব বা একনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে উচ্চ 'কলা' কৌশলই যথেষ্ট। এখানে ঐ উপমাটি কেমন যথার্থ হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের উপমা কখনো ব্যর্থ হয় না।

একে একে মনে উদিল স্মরণে, ইত্যাদি। 'এই বালককালের কথা' পল্লীবাসী বাঙালী মাত্রেরই—শুধু স্মৃতিকথা নয়, নিত্য অভিজ্ঞতাব কথা। শহরবাসী কবি শিলাইদহে অবস্থানকালে বাংলার পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লী-জীবনকে যেমন করিয়া দেখিযাছিলেন, তেমন দৃষ্টিতে কোন বাঙালী পূর্ব্বে তাহা দেখে নাই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবি-চক্ষু শহরের বাতায়ন হইতেই তাহা দেখিয়াছে; নহিলে নিত্য-অভিজ্ঞতার ফলে সকল বস্তুরই সৌন্দর্য্য বিশেষত্বহীন হইয়া পড়ে। আবার আর্টের পক্ষে, কল্পনার পক্ষে যতটুকু ব্যবধান থাকা প্রয়োজন—শহরবাসী বলিয়া তাহা ছিল, নতুবা বাংলাকাব্যে সেই প্রথম আমরা বাংলার এমন রূপ দেখিতে পাইতাম না; অর্থাৎ ঐ প্রতিভা এবং এই যোগাযোগ উভয়ই সেই সৌভাগ্যের কারণ। শুধু স্বভাব-বাঙালীত্ব নয়—বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর এই যে সজ্ঞান আত্ম-পরিচয়—দেশের জল-মাটি ও আকাশকে এমন করিয়া দেখা—ইহাই বাঙালীকে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দা·—কাব্যও বাঁচিয়া থাকিবে ইহারই কারণে। এই সকল চিত্রই অনাগত কালে—অশেষ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও—বাংলা দেশ অম্লান ও অমর করিয়া রাখিবে, অতএব—রবীন্দ্রকাব্যের এই আর্টই ধন্য—"Blessed be the art that can immortalise !"

বাবু কহে হেসে, ইত্যাদি। (বাবুর মুখের ঐ কথাটিতেই, এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত নাটকীয় রস এবং সুতীব্র শ্লেষ রহিয়াছে; যে নিজে এতবড় অধার্ম্মিক, সে-ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভিমান ত্যাগ করিতে পারে না; ঐ কথাটিতে 'Unconscious humour'-এর মতই, একটা 'Unconscious sarcasm' রহিয়াছে—না জানিয়া নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ

করিতেছে। এ চরিত্র ঐ অপরটির তুলনায় আরও বাস্তব হইয়াছে—ভাবদুর্ব্বলতার লেশ মাত্র উহাতে নাই। একজনের ব্যথা এবং অপরজনের ঐ হৃদয়হীনতা—দুইই সংসারের সত্য—মানব-স্বভাবের দিক দিয়া উহার সংশোধন বা প্রতিকার নাই।

[এ কবিতায় দুইই আছে—Idealismও আছে, Realismও আছে। তৎসত্ত্বেও কবিতাটি অতিশয় sentimental ইহাও সত্য; তার কারণ, এ কবি শুধুই ভাববাদী নহেন—অনুভূতিও অতিশয় প্রখর; তাই দৃষ্টির Realism যেমন, অনুভূতির Idealismও তেমনি সমান তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। ফলে Real-এর জবানীতেই Ideal আপনার মহিমা-প্রচার করে, তাহাতেই রচনা সেন্টিমেণ্টাল হইয়া পড়ে। ঐ Real ও Ideal-এর লুকাচুরী-খেলা রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে' (প্রথম পর্য্যায়) একটি অপূর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—Real-এর ছদ্মবেশে Ideal-এর সেই লীলা—Real ও Idealকে অভেদ করিয়া তুলিয়াছে। যাহারা রসদৃষ্টির Objectivityকেই শ্রেষ্ঠ কবিশক্তি বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহাদের বিচারে ঐ গল্পগুলি সেন্টিমেণ্টাল বলিয়া বিবেচিত হইবে। হউক, তথাপি, উহা এক বিচিত্র রস; রবীন্দ্র-প্রতিভার উহা একটি মৌলিক সৃষ্টি। বর্ত্তমান কবিতার প্রসঙ্গে এতকথা বলিবার কারণ এই যে, ঐ ক্ষুদ্র কবিতাটির পরিচয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার সেই বিশিষ্ট আর্ট-লক্ষণ রহিয়াছে।]

নগর-সঙ্গীত

কবিতা-প্রসঙ্গ

পল্লীর শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের পরিবর্ত্তে, অন্ধ ও উদ্দাম ভোগ-পিপাসার অগ্নিবেগময় নাগরিক জীবনের ছন্দটিকে কবি এই কবিতায় ধরিয়া দিয়াছেন; বস্তুতঃ ঐ ছন্দে, এবং ঐ মিলবিন্যাসে যে একটি ধ্বনিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই কবিতার ভাবকে যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছে—ভাব ও রূপ এক হইয়া গিয়াছে। ভাব এই যে—ঐ জীবনে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই; ধনোপার্জ্জন বা ধনোৎপাদনের বিকট নেশায় আধুনিক নগরবাসী মনুষ্যসমাজ একটা বিরাট ঘূর্ণাচক্রে যেন অবশ অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতেছে। কবি 'নগর-সঙ্গীত' নামে সেই অতিশয় অস্বাভাবিক, এবং একমাত্র ঐ লোভ ছাড়া সর্ব্ববৃত্তিবর্জ্জিত যে আধুনিক জীবন, তাহারই প্রমত্ততাকে ভয়াল করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা সেই 'madding crowds' ignoble strife'-এর একটি সবিস্তার শব্দচিত্র; অথবা, সেই 'ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্' দানবদশাগ্রস্ত মানুষের আত্ম-বিলাপ গাথা।

কিন্তু কবির কল্পনা শেষ পর্য্যন্ত নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া একরূপ মহানগর বা পৃথিবীব্যাপী দুরন্ত জন-সঙ্গীতে প্রসারিত হইয়াছে। বিংশ-শতাব্দীর এই মধ্যভাগে, ঐ ধনলোভ

ও তাহারই শক্তিমদমত্ততার ভ্রূক্ষেপহীন অভিযান সারা জগৎকে ত্রস্ত করিয়াছে—কবি যেন সেইকালেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই আসুরিক প্রবৃত্তির যে বর্ণনা ইহাতে আছে, তাহাতে মনে হয়, কবি এখানে যেন—কল্পনা নয়—একরূপ যোগদৃষ্টির দিব্য আবেশ লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কবিতা আরও আছে; এক হিসাবে এগুলি তাঁহার কবিশক্তির আরেক নিদর্শন—ইহাতে ভাবুকতা বা ভাবকল্পনার রসসৃষ্টি নাই; একটা অত্যুচ্চ এবং অতিবিশুদ্ধ নীতি-জ্ঞানের প্রবল প্রেরণায় ঐরূপ 'Prophetic Vision' বা আর্ষদৃষ্টির কাব্য জন্মলাভ করে।

কবিতা-পাঠ

এ কবিতার ছন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'কবিতাপ্রসঙ্গ' দেখ। শুধু ঘনঘন মিল নয়—মিলগুলি যুক্তাক্ষরান্ত; তাহাতেই উন্মাদ-জীবনের উত্তেজনা ছন্দেও প্রকাশ পাইয়াছে।

ঘূর্ণচক্র জনতাসংঘ, ইত্যাদি। ইহাকেই ইংরেজীতে বলে 'Crowd Psychology', ঐ 'জনতা-সংঘে'র সংঘ-চেতনাই মানুষকে ব্যক্তিধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করে; মনের কোন স্পষ্ট লক্ষ্য-জ্ঞান না থাকিলেও একটা অদ্ভুত সংহতি-বোধের তাড়নায় মানুষ যেন একমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট, ইত্যাদি। জীবন যেন একটি প্রকাণ্ড জুয়া-খেলা; সেই খেলায় সম্পূর্ণ অ-দৃষ্টের নিয়মে যে উত্থান-পতন, তাহার মত উন্মাদন মানুষের পক্ষে আর কি আছে।

অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব, ইত্যাদি। প্রাচীন রাজারা যেমন আপন রাজশক্তির অজেয়তা প্রমাণ করিবার জন্য, তাহার চিহ্নস্বরূপ একটা অশ্বকে সকল দেশে মুক্তভাবে বিচরণ করিতে পাঠাইতেন, এবং কেহ তাহাকে বন্ধন করিলে সেই দুঃসাহসীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ঐ অশ্বকে জয়ধ্বজার মত সগর্ব্বে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিয়া অশ্বমেধ-নামক যজ্ঞ করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের সেই কামনা যেন দিগ্বিজয় করিয়া মহাগৌরব লাভ করিত, তেমনই আমিও আমার কামনাকে সর্ব্বজয়ী করিয়া তুলিব। ঐরূপ ভোগ বাসনা, এবং ভিতরে ও বাহিরে সকল বাধাকে তুচ্ছ করিয়া—মমতা ও ন্যায়-অন্যায়বোধের সকল দুর্ব্বলতা জয় করিয়া, সেই বাসনাকে উত্তুঙ্গ করিয়া তোলাই পরম সুখ; ভোগ অপেক্ষা ভোগের ঐ দুর্জ্জয় বাসনাই—ঐ উন্মাদনাই—জীবনের সার বস্তু।

নব নব ক্ষুধা, ইত্যাদি। এখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত—ঐ কয় পংক্তিই এই কবিতার সারমর্ম্ম—যেমন আবেগ-তীব্র, তেমনই চিন্তা-গভীর হইয়াছে। 'জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা' হইতে 'কালনদীধার অধীরা'—ঐ যে বাক্যগুলি, উহাই ভোগবাদী নাস্তিকদের শয়তানী কৈফিয়ৎ।

চিত্রা

কবিতা-পাঠ

এই কবিতায় কবি তাঁহার কবিতার সাধনমন্ত্রটি নিখিল কবি-কর্ম্মের দিক দিয়া যাচাই করিয়াছেন, অথবা এমনও বলা যাইতে পারে যে, কবি গীতি-কবিতাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া জানেন। সেই কাব্যের সর্ব্ববিধ প্রেরণা তাঁহার খাঁটি কবিমানস-ধর্ম্মকে এই কবিতায় অতিসংক্ষেপে ও ভাবগূঢ় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে দেবতার আরতি করিয়াছেন—সে দেবতা তাঁহারই 'জীবন-দেবতা' নহে, তাহাকে সকল কবি, শিল্পী ও সুন্দরের উপাসক নিজ-নিজ পন্থায় স্ব-কর্ম্মের দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করে। তিনি ইহাতে সেই ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর বন্দনা করিতেছেন—ইংরাজ কবি শেলী যাহাকে সর্ব্ববস্তুর দিব্যপ্রভারূপিণী "Spirit of Beauty" বলিয়াছেন; কবি কীট্‌স্ যাহাকে সর্ব্বঘটে বিরাজমান একমাত্র সৎবস্তু (Beauty is Truth) বলিয়া জানিয়াছেন; কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাহাকে "Joy in widest commonalty spread" বলিয়া ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়াছেন; আমাদের বিহারীলাল যাহাকে 'কান্তি' নাম দিয়াছেন এবং তাহাকেই 'বিশ্বরূপিণী' ও 'বিশ্ববিকাশিনী'—একাধারে দুই বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আরও একটু তাহাতে যোগ দিয়াছেন; তিনি আর্ট বা সুন্দর-শিল্পের যে বিচিত্ররূপাবলী—তাহার উপরেই বেশি জোর দিয়াছেন; আর্টের যাহা মূল-প্রেরণা সেই বৈচিত্র্যকেই সৌন্দর্য্যের তথা সুন্দর-প্রেরণার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলিয়াছেন, তাই সেই-দাবীকে 'বিচিত্ররূপিণী' বলিয়াই প্রথমে সম্বোধন কবিয়াছেন—কবিতার নাম দিয়াছেন 'চিত্রা' বা বিচিত্রা। তিনি কাব্যকেও বিশেষভাবে অপর সকল কলার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া—সকল কবিকর্ম্মকে আর্টের সমধর্ম্মী বলিয়া সুগভীর তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কবিতাটির প্রথম স্তবকে তিনি আপন কবিকর্ম্মের সেই আদর্শই ঘোষণা করিয়াছেন—উহা আর্টেরই প্রশস্তি। এই কারণে, এই কবিতাটির একটি গভীরতর অর্থ আছে—ইহার একটি বিশেস মূল্য আছে; এক হিসাবে, কবির নিজস্ব কবিধর্ম্মের এমন সুস্পষ্ট ও নিঃসংশয়—প্রমাণ আর নাই।

দ্বিতীয় স্তবকে, কবি কাব্যকে—এই আর্টকর্ম্মকেও গৌণ করিয়া—কবি-ব্যক্তির অতিশয় স্বতন্ত্র, আত্মগত রস-সাধনার সেই মিষ্টিক ধ্যান-পন্থাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। ঐ সাধনা সম্পূর্ণ আত্মমুখী—সেখানে জগৎ নাই, কোন বাহিরের রূপ-প্রদর্শনী নাই; তাহাতে সেই সৌন্দর্য্য-দেবতার সহিত কবি-সাধকের যে অপরোক্ষ-মিলন ঘটে, তাহাতে ঐরূপ আর্টকর্ম্মের প্রেরণা—বা প্রাণের কোন কামনা আর থাকে না, তাই সেখানে কবি আছে, কাব্য নাই। ইহা উচ্চতর অবস্থা। অতএব একদিকে যেমন ঐ কাব্য, অর্থাৎ আর্টকর্ম্ম, তেমনই, অপরদিকে তারও চেয়ে বড় ঐ কবি; একদিকে রসের বিচিত্র রূপ-নির্ম্মাণ, অপরদিকে সর্ব্বরূপ-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ রস; একদিকে সেই রসকে বহির্বিশ্বে অনন্ত বৈচিত্র্য-যোগে পান করা, অপর দিকে তাহাকে নিজের মধ্যে, বহু নয়,—এক-রূপে আস্বাদন করা। একদিকে শিল্পী আর একদিকে যোগী—দুই-ই সৌন্দর্য্য-সাধনার দুইদিক; একই সাধনার সোপান-ভেদ মাত্র। প্রথম স্তবকে কবি রূপের বন্দনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়টিতে রূপকে ছাড়িয়া রসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই দ্বিতীয় স্তবকটিতে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের অভিজ্ঞতাও আছে বলিয়া মনে হয়। তিনি নিজে একজন খাঁটি আর্টিষ্ট বা রূপ-শিল্পী কবি হইলেও, প্রথম জীবনে অপর সাধনায় অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই সাধনার সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহার কবিমানসে তাহার প্রতি একটা আকর্ষণ চিরদিনই ছিল—শেষ জীবনে কবি নিজে মিষ্টিক না হইয়াও, সেই মিষ্টিক ভাবরাজীকে তাঁহার আর্টের সাহায্যে রূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। পরে তাহা দেখিব। এই মন্ত্র বিহারীলালের; রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সেই কবি-প্রকৃতিকে যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন বোধ হয়, আর কেহ বুঝে নাই। পরে তিনি আপন অন্তরবাসী কবিপুরুষটিকে আপন কবিকর্ম্মের প্রমাণে যতই চিনিতে লাগিলেন, ততই এ কবিতার ঐ প্রথম স্তবকের তত্ত্বটিকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু এতবড় রূপ-শিল্পী হইয়াও—রস-সাধনাই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা তাহা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই নিজে মিষ্টিক না হইলেও, ঐকান্তিক রস-বিভোরতার—রসের যোগ-সমাধির ঐ 'মিষ্টিসিজম'কে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন—সে শ্রদ্ধা কেমন, এই দ্বিতীয় স্তবকে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই পংক্তিগুলিতে তিনি বিহারীলালের 'সারদা'-মন্ত্রকেই স্মরণ করিয়াছেন, ঐ ভাবাবস্থা বিহারীলালের—

"একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চির-যামিনী"

—ইহা মিষ্টিকমাত্রেরই ভাষা বটে; তথাপি উহাতে বিহারীলালের কণ্ঠধ্বনি শোনা যাইতেছে।

কবিতা-পাঠ

ভাষার সঙ্গীত-লালিত্য লক্ষণীয়—ছন্দ সঙ্গীত কি অপূর্ব্ব! পংক্তিগুলিতে শুধু অন্ত্যমিল নয়, প্রায় প্রতিপদে মিল ও অনুপ্রাস, এবং যুক্তাক্ষরের ঐ নৃত্য-চপলতা অতি নিবিড় রসাবেগের সাক্ষ্য দিতেছে। শেষের দিকে ভাষা ও ছন্দের কারিগরি সমান আছে, কিন্তু এখন রসোচ্ছলতা নাই, তার কারণ, সেখানে আত্মনিমগ্নতাই অধিক।

জগতের মাঝে, ইত্যাদি। এই জগৎ—মানব-সংসার নহে; উহা সৌন্দর্য্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতি। একদিকে ঐ বিশ্বব্যাপ্ত—দ্যুলোক-ভূলোক-সঞ্চারী লাবণ্যস্রোত, অপরদিকে কবি ও শিল্পীগণের অন্তহীন রূপচর্য্যা।

কত-না বর্ণে কত-না স্বর্ণে, ইত্যাদি। যতপ্রকার শিল্প বা আর্টকর্ম্মে ঐ বহুরূপাকে ধরিবার কি বিরামহীন প্রয়াস!

অন্তর-মাঝে···একা একাকী। 'একা একাকী' অর্থাৎ "বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য", কোন বিশেষ রূপ বা বৈচিত্র্য আর নাই। দার্শনিক ভাষায় ঐ 'একাকী'র অর্থ 'কেবল'; উহা একরূপ মিষ্টিক উপলব্ধি—অতীন্দ্রিয়। সকল পার্থিব সৌন্দর্য্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—সে সৌন্দর্য্য কোন বিষয় বা বস্তুর মারফতে অনুভূতিগোচর হয়; 'কেবল'-সৌন্দর্য্যকে আমরা মনন-ক্রিয়ার দ্বারা পৃথক করি বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে বা আত্মগোচর করিতে পারি না। কিন্তু সাধক-কবির ভাবাবস্থায় ঐ 'একা-একাকী'র দর্শন লাভ ঘটে—তাহাই মিষ্টিক বা যোগীর অবস্থা।

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে, ইত্যাদি। এই উপমাগুলির দ্বারা কবি সেই অনির্ব্বচনীয়কে কতকটা বচনীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—উহার অর্থ নয়—ভাবটা ধরিতে হইবে। ঐ উপমাগুলির সাহায্যে যোগে-যাগে পাঠককে সেই অবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে।

একটি চন্দ্র···চারিদিকে চির-যামিনী। তুলনীয় বিহারীলাল—

প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরিছে আসি,
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার!

* * *

বিচিত্র এ মত্ত দশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান,
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে!

[সারদামঙ্গল, তৃতীয় সর্গ

[তবু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বিহারীলালের নামোচ্চারণ করাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। রবীন্দ্র-জীবনীকারের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বিহারীলালকে কবি বলিয়াই গণ্য করেন না, বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তাঁহাকে বড় বলায়, কাদম্বরী দেবী ও বিহারীলাল উভয়েই সমান শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন [প্রথম খণ্ড, 'প্রথম পর্ব্ব' দেখ]। আমি যে ঐ কালের অপর কবিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি (যেমন, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে), তাহাতে রবীন্দ্রনাথের একজন মহাবীর-ভক্ত এবং মহাপণ্ডিত অধ্যাপক আমার দুরভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়াছেন আমি নাকি তদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে ছোট করিতে চাই! কথাটা অবজ্ঞার যোগ্য হইলেও, আমি এখানে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিলাম যে কারণে তাহা বলিতেছি। ইঁহারা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ শিষ্য—কবিতীর্থের অধিবাসী। তাহাতে যদি এমন সন্দেহ হয় যে, ঐরূপ মনোভাব প্রশ্রয় পাওয়ার হয়তো বিশেষ কারণ আছে, তবে তাহা অতিশয় লজ্জা ও দুঃখের কথা বটে। আমরা কেবল এই দুইটি কথা জানি; শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং বিহারীলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কথা কোথাও উচ্চারণ করেন নাই। একদা রবীন্দ্র-পূজার প্রধান পুরোহিত, বাংলা-ভাষার নব-রূপকার ও শ্রেষ্ঠ রসবেত্তা স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মাত্র দুই পুরুষের; প্রথম বা আদি পুরুষ—রবীন্দ্রনাথ এবং চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ তৎপূর্ব্বে আর কোন 'পুরুষ' ছিল না। এ সমাজে সাহিত্যের ইতিহাস ও কাব্য-সমালোচনা দুই-ই অপূর্ব্ব হইবার কথা।]

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি। ঐ অবস্থায় কোন পিপাসা আর থাকে না—সৌন্দর্য্যকে রূপে-রেখায়, বর্ণে-ছন্দে ধরিবার সেই মানস-উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হয়। তখন

'ভাবৈকরস' একটি তন্ময়তার অবস্থা—সমগ্র অন্তরব্যাপী একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্যচেতনা কবিকে পূর্ণপরিতৃপ্তির পরমানন্দ ও পরমাশান্তির অধিকারী করে। স্মরণীয়—বিহারীলাল—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে।......
থাক, হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভ'রে রাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে।...
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।...

[সারদামঙ্গল, প্রথম সর্গ

একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি, ইত্যাদি। সেখানে দেবতা ও ভক্ত ছাড়া আর কেহ নাই; ওই দুই-ও এক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সাযুজ্যলাভ হইলে, দেশ-কাল থাকে না, অতএব সাক্ষী ও সাক্ষ্যের দ্বৈতও থাকে না। এই দৃষ্টির যত কিছু রূপ সকলই দেশে ও কালে—শেষ পর্য্যন্ত, কালেই প্রকাশমান থাকে। ঐ সমাধি-অবস্থায় সেই দেশকালের জ্ঞান আর থাকে না। 'অনিমেষ মুরতি' ও 'অচপল দামিনী' এই দুইটি বাক্যের অভিপ্রায় একই; কাল স্তব্ধ হইয়াছে, তাই কোন গতি নাই, পরিবর্ত্তন নাই, রূপের উন্মেষ-বৈচিত্র্যও নাই।

ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা, ইত্যাদি। পংক্তিগুলির উদাত্ত ধ্বনি লক্ষণীয়। কবি ঐ যে একটা রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কিন্তু আসলে অরূপ, বা abstract; ঐ বিশেষণগুলির ব্যঞ্জনাটুকু মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, উহা দ্বারা সেই অন্তরের অনুভূতিকে অনুভূত করাইবার প্রয়াস আছে।

উষালোকসম অসীমা। তুলনীয়—

"উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা"

['উর্ব্বশী'

—পূর্ব্বাকাশে উষার আলো যখন ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহাতে পূর্ণপ্রকাশ (অকুণ্ঠিত) বা অসীম ব্যাপ্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ইংরেজী কবিতায় উষার ঐ 'অসীমা' বিশেষণ আছে, যথা—

And out of the infinite morning
Intrepid you hear us cry!

[*Ode*—O'shaughnessy

—এখানে অর্থ, 'ঐ হাসি ছাড়া কোন দিকে আর কিছু নাই'।

আবেদন

কবিতা-প্রসঙ্গ

'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতায় কবি সাধারণ মানব-সংসারের ঊর্দ্ধে নিজের যে স্থান ও যে দুর্লভ সৌভাগ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখানে একটি সরল সহজ রূপকের ভাষায়, অতিশয় বিনয় সহকারে নিজের তথা সকল সমধর্ম্মী কবির কবিকর্ম্মের সেই বিশেষ গৌরব দাবি করিয়াছেন। সেই দাবি এই। মহাশক্তিরূপিণী বিশ্বেশ্বরী যিনি, তাঁহার জগৎ-সংসার পরিচালনার জন্য, তিনি নিজের শক্তি ও প্রভুত্বের, ঐশ্বর্য্য ও রাজকীয় গৌরবের অংশ নানা কর্ম্মী ও পুরুষবীরের মধ্যে বাঁটিয়া দিয়াছেন, তাহারা দায়িত্ব ও সম্মানের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে; সংসারে তাহারাই খ্যাতিমান ও কীর্ত্তিমান হইয়া থাকে। কিন্তু কবির তেমন কোন কাজ নাই—পদমর্য্যাদাও নাই—সেই রাজকর্ম্ম-পরিচালনার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এইজন্য কবির কোন সম্মান নাই—সকলে তাহাকে অলস, নিষ্কর্ম্মা এবং সংসারের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া মনে করে; গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্র হইতে কবিকে বাদ দিয়াছেন। এই কবিতায় কবি যেমন স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ সকল বৈষয়িক গুরু-দায়িত্ব বহন করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, তেমনই তিনি অপর একটি এমন কাজের ভার লইবেন, যাহাতে ঐরূপ শক্তি ও কর্ম্মবুদ্ধির ঘন-ঘটা নাই বটে, কিন্তু তাহাও কম প্রয়োজনীয় নহে। সে-কাজ ঐ মহাশক্তির—জগৎ সংসারের ঐ পালয়িত্রীর ও শাসয়িত্রীর সর্ব্ব কর্ম্ম-ক্লান্তি অপনোদনের কাজ, তাঁহার সেই শক্তির মূলে আনন্দ-রস সিঞ্চন করা। কারণ, কেবল প্রয়োজনই যদি বিশ্বের একমাত্র কর্ম্মপ্রেরণা হইত, তবে জগৎ একটা বিরাট প্রাণহীন যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে; তাহার ঐ প্রাণধারা, যাহা নব নব উৎসমুখে উৎসারিত হইয়া সৃষ্টিকে চির-নবীন রাখিয়াছে, তাহা শুকাইয়া যাইত। সেজন্য কবিকে—সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কারুশিল্পীকেও চাই; সে প্রয়োজন বাহিরের নয়—অন্তরের, তাই তাহা রাজ্যের দপ্তরখানার হিসাবে ধরা পড়ে না। সকল কর্ম্মের একটা বিশ্রাম-কাল চাই, সেই বিশ্রামেরও আয়োজন-উপকরণ আছে। সেই বিশ্বেশ্বরী যখন সর্ব্বকর্ম্মের অবসরে তাঁহার নিভৃত অন্তঃপুর-মন্দিরে বিশ্রাম করেন, যখন তিনি সকল ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া আপনাতে আপনি ফিরিয়া যান, তখন কবি তাঁহার শ্রীঅঙ্গের প্রসাধন ও চিত্ত বিনোদন করিয়া যে রসধারায় তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন, তাহাতেই বিশ্বের কর্ম্মপ্রবাহ নিত্য সঞ্জীবিত হয়। ঐ যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আনন্দ, উহার মূলে কোন পদ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি বা ঐশ্বর্য্যলাভের বাসনা থাকে না; থাকিলে উহা সম্ভব হইত না; সেই আনন্দই কবির পুরস্কার, কবি কেবল সেই কাজটি করিতে পারিলেই ধন্য হইবেন; এবং রাণীর সেই নিভৃত অন্তঃপুরে তাঁহার অন্তরঙ্গ অনুচররূপে যে একটি দুর্লভ সম্মান ও প্রসাদ লাভ করিবেন, তাহাতেই অপর বড় বড় যশস্বী ও কীর্ত্তিমান ভৃত্যগণ অপেক্ষা নিজেকে বহুগুণে পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবান মনে করিবেন।

কবিতাটির এই রূপক অর্থ যতই যথার্থ ও সুকল্পিত হউক, ইহার রচনায় বাণীশিল্পের চাতুর্য্যই সমধিক লক্ষনীয়। বিশ্বলক্ষ্মীর রূপলাবণ্য যে বর্ণে, যে তালিকায় চিত্রিত হইয়াছে,

তাহাতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-রসের মাদকতা প্রায় চরমে উঠিয়াছে। ছবিখানিতে শক্তির মহিমা অপেক্ষা রূপ-রসের গৌরব ঘোষণা আছে—সেই রসের আনন্দ-লালসে শিরা-উপশিরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সে যেন—

রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্ত হরষে...
মুগ্ধ তনু মরি' যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে !

['মানস-সুন্দরী'

বস্তুতঃ ঐ রূপক অর্থ যেমনই হোক, এ কবিতা সেই 'মানস সুন্দরী'রই আরেক সংস্করণ। কেবল এখানে ভাব অপেক্ষা রূপের দিকটা—অনঙ্গ অপেক্ষা অঙ্গের মাধুরী আরও উন্মাদক হইয়াছে। ইহার ভাষা, সেই রূপরস পিপাসার অসহ্য উচ্ছ্বাসে পূর্ণপক্ক দ্রাক্ষারাশির মত—"মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে।"। 'চিত্রা'র আরেকটি কবিতার ভাষা এমনই রূপ-রসোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে, সে কবিতা—"বিজয়িনী"।

কবিতা-পাঠ

সকলের সর্ব-অবশেষটুকু। যাহা আর কেহ প্রার্থনা করে না—নিতান্তই তুচ্ছ অকীর্ত্তিকর মনে করে—আমি তাহাই ভিক্ষা করিতেছি। ব্যঙ্গার্থ এই যে,—আমি কবি, আমিই জানি—সে কি পরম সৌভাগ্য! নির্ব্বোধ হইয়াই আমি সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

মালঞ্চের হব মালাকর। উদ্যান বাটিকার শোভা সম্পাদন করিব—আনন্দের নন্দন রচনা করিব। এই মালাকর অর্থাৎ 'মালী'র কাজ শুধুই মাল্য রচনা নয়; পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, নারীদেহের প্রসাধন—তাহার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের যতকিছু কলাকর্ম্ম, সকলই তাহার অধিকারভুক্ত;—অতএব, যেমন, একটা উপাধি আছে—'নরসুন্দর', তেমনই এই মালাকরকে 'নারীসুন্দর' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। এখানে রূপক-অর্থে,—নারী-সৌন্দর্য্য সকল সৌন্দর্য্যের সার,—কবি সেই সার সৌন্দর্য্যেরও আর্টিষ্ট বা রূপকার।

অবসর লব কাজে। তুলনীয়—

চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া,
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগ-সুধা

*   *   *

বারেকের তরে ভুলাও জননী
কে বড়. কে ছোট, কে দীন, কে ধনী,
কেবা আগে, কেবা পিছে।

[পুরস্কার—সোনার তরী

পরপারে। অর্থাৎ বহির্জগতে—জগৎ কর্ম্মশালায়। কবি পরে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

দিগন্তেরে করিছে দংশন। 'করিছে দংশন', বাক্য রচনার অব্যর্থতা লক্ষণীয়।

এখানে 'দংশন করা'র অর্থ—(১) দিগন্তের আকাশ পটে উহাদের নতোন্নত শিখরগুলা একটা দীর্ঘ দন্তুর-রেখা অঙ্কিত করিয়াছে; ঐ চিত্রাঙ্কণই মুখ্য অভিপ্রায়। (২) 'দংশন করে' অর্থাৎ উচ্চতায় আকাশকে অবজ্ঞা করে; এই একটি পংক্তিতে নগরীর বিশালতা ও হর্ম্ম্যসম্পদ বর্ণিত হইয়াছে। আবার এমন অর্থও হইতে পারে—ঐ সৌধশিখর বিকট দন্তরাশির মত দিগন্তকে বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রাকৃতিক শোভা হরণ করিয়াছে।

তোমার প্রাসাদসৌধ। উদ্যান-বাটিকাবেষ্টিত সেই প্রাসাদ—কবি-কল্পনার সকল উপকরণ দ্বারা নির্ম্মিত ও সজ্জিত, এ প্রাসাদ কাব্যলক্ষ্মীর উপযুক্ত নিবাস বটে—রোমান্সের সকল সামগ্রী উহাতে আছে, যথা—'চন্দ্রকান্ত মণি', 'ইন্দুমল্লী বল্লরী বিতান', ('ইন্দুমল্লী' যদি চন্দ্রমল্লিকা হয়, তবে তাহা 'বল্লরী' নহে, কল্পনার পুষ্পতরু), 'স্ফটিক প্রাঙ্গণ' 'ভবনশিখী', 'রাজহংস' এবং 'পাটলা হরিণী'—সংস্কৃত কাব্যের কবি-সম্পদ। তুলনীয়—

> My love dwelt in a northern Land,
> A grey tower in a forest green
> Was hers ...
> And herds of strange deer lily white
> Stole forth among the branches grey

[*Romance* : Andrew Lang

অকাজের কাজ যত ..আনন্দের আয়োজন। 'অকাজ' অর্থাৎ অপ্রয়োজনের কাজ; সকল সৌন্দর্য্যের মূলে আছে—"Pleasure without interest"; প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা তাহাই আনন্দ-হেতু। 'আলস্য' অর্থে, ইং "Leisure", কিন্তু উহা বাহিরে আলস্য বলিয়া নিন্দিত হইলেও, শিল্পীর মন অলস থাকে না, বরং গভীর ধ্যান-কল্পনায় ব্যাপৃত থাকে।

শ্লথ অঙ্গ হতে স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> 'গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখাব মত রাখি'

[অপেক্ষা—মানসী

পুষ্পাক্ষরে লিখা তব চরণের স্তুতি। এইখান হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত, নারীদেহের পেলব সৌন্দর্য্য মানসে উপভোগ করার যে কল্পনাবিলাস আছে, তাহা রবীন্দ্র-কাব্যের সূক্ষ্ম রূপরস-প্রেরণার (Sensuousness) একটি উৎকৃষ্ট কারুকর্ম্ম; 'কড়ি ও কোমলে' আমরা যাহার প্রথম উন্মেষ দেখিয়াছি, এখানে তাহার পূর্ণবিকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ 'চিত্রা'য় (ও 'চিত্রাঙ্গদা'য়) এই কবিমানসের এই রূপরসপিপাসার কাব্যকলা ভাষার শক্তিকে যেন নিঃশেষ করিয়াছে।

সন্ধ্যাকালে যে মঞ্জু মালিকাখানি, ইত্যাদি। কবি-মালাকর শুধুই পুষ্পোদ্যানের যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া এবং ফুল যোগাইয়াই ক্ষান্ত হইবে না, সে রাণীর শ্রীঅঙ্গের সর্ব্ববিধ প্রসাধনে তাঁহার সহচরী সেবিকার কাজও করিবে। নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বিস্রস্ত বেশবাস ও উন্মুক্ত কেশ-পাশে রাণীর বেণী-বন্ধনও দেখিবে, তাঁহার শয্যাশিরোদেশে যে প্রদীপ জ্বলে তাহাও নিজে হস্তে জ্বালাইয়া দিবে! তার কারণ, এ মালাকর তো সাধারণ

মালাকর নয়—কবি মালাকর। বস্তুতঃ ঐ রূপকটিকে অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই অর্থও যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া কবি এই কবিতায় তাঁহার রূপরসপিপাসাকে অকাতরে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। 'সান্ধ্য যূথীগুচ্ছ'—শব্দযোজনা কি সুন্দর! তুলনীয়-'বৈকালী যূথিকা' (দেবেন্দ্রনাথ); "ঘন কেশপাশ তিমিরনির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ কুটিল"—চিত্রবৎ প্রেক্ষণীয় হইয়াছে 'কনক মুকুর' অর্থে—অতিমার্জ্জিত কাঞ্চন ফলক, তাহাই মুকুরের কাজ করে।

কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন। পাতার ফাঁক দিয়া চন্দ্ররশ্মি দেহের নানা স্থানে পতিত হইয়া গোলাকার আলোক খণ্ডের মত শোভা পায়, ইংরেজীতে উহাকে 'gules' বলে। তুলনীয়—

সপ্তপর্ণ শাখা হ'তে
ফুল্ল মালতীর লতা টুপ্‌টাপ্ করি'
মোর গৌরতনু 'পরে পাঠাইতেছিল
শত নিঃশব্দ চুম্বন;

['চিত্রাঙ্গদা'

সুরনরস্বপ্নাতীত নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ-পানে, ইত্যাদি। 'Sleeping Beauty' বা 'নিদ্রিতা সুন্দরী'র রূপ সুরনর স্বপ্নাতীতই বটে! বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের একস্থানে এইরূপ 'নিদ্রিতা সুন্দরী'র রূপবর্ণনা আছে। পূর্ব্বে 'নিদ্রিতা'-কবিতা ('সোনার তরী') দেখ।

কি লইবে পুরস্কার। ইহার উত্তরে মালাকর যাহা চাহিয়াছে তাহা রূপস্বপ্নাতুর কবির উপযুক্ত বটে। 'পুরস্কার' কবিতায় কবি রাজকণ্ঠের মালাখানি পাইয়াই ধন্য হইয়াছিলেন—প্রিয়াকে পরাইবার আশায়। এখানে তারও বেশি চাই—ঐ রাণীর করকমল ও পদতল স্পর্শ করিবার অধিকারও চাই; তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এই রাণীই যে সেই কবি-প্রিয়া, তাহাতে সন্দেহ কি?

চুম্বিয়া মুছিয়া লব। রূপপিপাসা ইহার উপরে উঠিতে পারে না, ইহাই সীমা।

তুই থাক্…খ্যাতিহীন, কর্ম্মহীন। তুলনীয়—

তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা।

['পুরস্কার'

কবির ঐ আবেদন মঞ্জুর হইল। কিন্তু কবি এখানে যাঁহার সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, অন্যত্র তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

তুমি মোরে করেছ সম্রাট

['প্রেমের অভিষেক'

—দুই-ই সমান সত্য, প্রেমে ঐ দুই দিকই আছে।

বিজয়িনী

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটিতে, যে সৌন্দর্য্য অতিশয় বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ কবি তাহারই এক মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন; যতকিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য আছে—যাহা এই বিশ্বে ব্যাপ্ত, তাহাই ঐ নারী মূর্ত্তিতে যেন সাকার হইয়া উঠিয়াছে; আকাশ, বনভূমি, জীব, জলস্থল ও আলোছায়া সকলই যেন এক ছন্দে ছন্দোবদ্ধ হইয়া ঐ মূর্ত্তির মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্গতি লাভ করিয়াছে। 'উর্ব্বশী'তে কবি যে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও বন্দনা করিয়াছেন—ইহা সেই কামনাদিগ্ধ সৌন্দর্য্য নয়, সর্ব্ব মানস-উৎকণ্ঠাবর্জ্জিত পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। শব্দ, অর্থ ও ছন্দ এই তিনের সাহায্যে কবি ইহাতে, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা—একাধারে দুই-এর কাজ করিয়াছেন—ইহাতে ভাস্কর্য্যের ক্ল্যাসিক্যাল শান্ত ও সংযত রূপশ্রীর সহিত চিত্রকলার রোমান্টিক sensuousness-এর বর্ণ বিন্যাস মিলিয়াছে, তারপর, সৌন্দর্য্য-প্রেমের অতি বিশুদ্ধ প্রেরণার বশে ঐ আলেখ্যখানিকে কবি সকল কামনা বা হৃদয়-বৃত্তির ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন; ঐ নারী উর্ব্বশীর মত প্রেয়সী নহে—মাতা, কন্যা, বধূ তো নহেই, সর্ব্ব কামনার নিবারণ হয় যে সৌন্দর্য্যধ্যানে—উহা সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একটি অবয়বী প্রতিমা।

কিন্তু আমাদের কবি তো সেইরূপ aestheticism লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, একটা তত্ত্ব-চিন্তা ও নীতিজ্ঞানের শাসন না মানিয়া পারেন না, তাই এমন একটি খাঁটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুন্দর প্রতিমা গড়িতেও তাহাতে প্রেমের তপস্যা ও কাম-জয়ের মহিমা যুক্ত করিয়াছেন। ঐ সুন্দরী শুধুই মদন-মোহিনী নয়, উহার ঐ সৌন্দর্য্য শুধুই সর্ব্বকামনার নির্ব্বাণ-তীর্থ নয়—ঐ নারী সেই তাপসিনী মহাশ্বেতা—যে যুগযুগান্তরব্যাপী বিরহ-দুঃখ বহন করিয়া তাহার প্রেমকে শুচি-শুদ্ধ করিয়াছে; কামকে জয় করার সেই ইতিহাসও ঐ সৌন্দর্য্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। অর্থাৎ, মদন বা কাম কেবলমাত্র সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দ্বারাই পরাজিত হয় নাই, মহাশ্বেতার হৃদয়বাসী সেই তপস্বী প্রেমই তাহাকে জয় করিয়াছিল। কবিতার ঘটনাবস্তু ও সাক্ষাৎ বর্ণনায় মদন কিন্তু সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের নিকটেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে—বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক দিয়া তাহাই যথার্থ হইয়াছে, কারণ সেই সৌন্দর্য্যের সহিত জ্ঞানবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি কোনটারই সম্পর্ক নাই। কিন্তু তপস্বিনী মহাশ্বেতার সেই নৈতিক বা আধ্যাত্মিকবলও যদি সে সৌন্দর্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে তবে কবিতার মূল ভাববস্তুর মধ্যে একটা দ্বৈধ আসিয়া পড়ে—রবীন্দ্র-নাথের অধিকাংশ বড় কবিতায় তাহা হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এখানে তাহা হইয়াও হয় নাই, কারণ, আরম্ভে ঐ একটিবার মাত্র 'অচ্ছোদসরসী'র উল্লেখ থাকিলেও কবিতা পাঠকালে আমরা 'কাদম্বরী'র কাহিনী আদৌ স্মরণ করি না; অতএব, মদনের ঐ পরাজয়—সৌন্দর্য্যের নিকটেই ভোগবাসনার পরাজয় বলিয়া মনে করিতে কিছুমাত্র বাধে না।

কবিতা-পাঠ

অচ্ছোদ-সরসী নীরে। ঐ একটিমাত্র নাম, ঐ 'অচ্ছোদ সরসী' হইতে কাদম্বরীর সেই মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক কাহিনী স্মরণ করিতে হয়। গন্ধর্ব্বরাজ-কন্যা মহাশ্বেতা তখনও

ঋষিকুমার পুণ্ডরীককে দেখে নাই, ঐ দিনই প্রেম তাহার হৃদয়দুয়ারে পুণ্ডরীক-রূপে হানা দিল। পরে পুণ্ডরীকের মৃত্যু হইলে, সে পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে দেবমন্দিরে প্রেমের তপশ্চর্য্যায় অতিদীর্ঘ বিরহকাল যাপন করিল; পরে পুণ্ডরীক জন্মান্তর শেষে পুনরায় নরদেহ ধারণ করিয়া ও জাতিস্মরতার দ্বারা তাহার সেই প্রথম-প্রেমের দুঃসহ কামনাকে সকল মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া, মহাশ্বেতার সহিত পবিত্র পরিণয়সূত্রে মিলিত হইল। এ কবিতায় কবি মহাশ্বেতার সেই আলোকসম্ভব রূপলাবণ্য ও তাহার প্রেমে উন্মাদনার পরিবর্ত্তে আত্মস্থতা—এই দুইয়ের উপরে 'বিজয়িনী'র মূল ভাববস্তুটি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ একটি নামের দ্বারা তিনি কবিতায় যে একটি কাহিনীসূত্র, ও সেই রোমান্স-রসের সুযোগ লইয়াছেন—কাব্যকৌশল হিসাবে তাহা অনিন্দনীয় হইলেও, ঐ কাহিনী এই কবিতার অভিপ্রায় সমর্থন করে না। কারণ, সৌন্দর্য্য ও কাম এই দুইয়ের বিরোধে যে সৌন্দর্য্য জয়ী হইল, তাহাতে কাম বা প্রেম কিছুরই প্রভাব আর থাকিবে না (কবিতাপ্রসঙ্গ দেখ); ঐ সৌন্দর্য্যের আর কোন সার্থকতা নাই—উহাতেই উহার শেষ। তাহা হইলে মহাশ্বেতা কেবল সেই সৌন্দর্য্যের নিখুঁত প্রতিমা-রূপে বন্দনীয় হইয়াছে—তাহার প্রেমের কি হইল? অথচ মূল কাহিনীতে তাহার প্রেমটাই বড়—পৃথক সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তাহাতে নাই; অর্থাৎ পুণ্ডরীকের সহিত তাঁহার সেই পুনর্মিলনে ইহাই প্রমাণিত হইল যে—

> The Gods approve the depth and
> not the tumult of the soul"

[*Laodamia.* : Wordsworth

এ কবিতার অভিপ্রায় অনুরূপ।

বসন্ত নবীন, ইত্যাদি। এই প্রথম পংক্তিগুলিতে ছবির পটভূমিকা প্রস্তুত হইয়াছে, পরে তাহার পুরোভাগে একখানি নারী প্রতিমার অধিষ্ঠান হইবে।

শ্বেত শিলাতলে, ইত্যাদি। এইবার রীতিমত চিত্রাঙ্কন—শব্দের সাহায্যেই রং, রেখা ও রূপের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ। এই একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ-কবি কীট্‌সের কাব্য-কলাকে, আপনার মত করিয়া, বাংলা ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছেন; তার কারণ, এই ধরণের চিত্র-রচনার প্রয়োজন আর কোথাও হয় নাই। ঐ সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গোচর—শুধু দর্শন নয়, স্পর্শনও আছে।

শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ। তুলনীয়—

> Of all her wreathed pearls her hair she frees,
> Unclaps her warmed jewels one by one.
> Loosens her fragrant bodice, by degiees
> Her rich attire creeps rustling to her knees.

[*Eve of St. Agnes.*

—'warmed jewels' ঐ 'warmed' বিশেষণটির দ্বারাই সবটুকু বলিয়া লইয়াছেন। 'উত্তপ্ত সৌরভ' বলিলে অবশ্য একই কালে আরেক ইন্দ্রিয়ের সেবা করাও হয়; কীট্‌স্ সেই 'সৌরভ' বসনে যুক্ত করিয়াছেন ("fragrant bodice") কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঘ্রাণেন্দ্রিয়

আরও তীক্ষ্ণ, তিনি অলংকারেও দেহ-গন্ধ থাকা কিছুমাত্র অত্যুক্তি মনে করেন না। এই প্রসঙ্গে কবির ঐ ঘ্রাণশক্তির প্রমাণস্বরূপ কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যথা (একই কবিতায়)—

পক্কশস্যগন্ধহর মধ্যাহ্নের বায়ে,
* * *
পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি···
* * *
ঘনগুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে।···
* * *
ছিল পড়ি একভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশিকৃত করি'
তারি' পরে মুখ রাখি' রহিল সে পড়ি'
সুকুমার দেহগন্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি' অতৃপ্ত আবেশে।

['পরিশোধ'—কথা

কূলে কূলে প্রসারিত · আলিঙ্গন রাশি। নদীতে বা সরোবরে অবগাহনকালে জলরাশির সেই সর্ব্বাঙ্গ-বেষ্টন সুমধুর স্পর্শের কি বর্ণনা। ভাষার ঐ ইংরেজী রীতিই এমন অনুভূতি প্রকাশের সহায় হইয়াছে।

সরসীর প্রান্তদেশে···পরশবিভোল। রমণী-রূপলাবণ্যের এই চিত্রখানির সহিত তুলনীয়—

নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া,
উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদুহাসি'
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিল কেশপাশ, মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হ'য়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
আনন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা।···

['চিত্রাঙ্গদা'

কম্পমান ছায়াখানি প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে। ইহা বর্ণনা নয়—চিত্ররচনা, তুলনীয়—

The swan on still St. Mary's Lake
Float double, swan and shadow !

[Wordsworth

বাহুপাশে ঘিরে সুকোমল ডানা ছুটি, ইত্যাদি। এই বর্ণনায় সুকোমল স্পর্শ-সুখকে আমাদেরও ইন্দ্রিয়গোচর করা হইয়াছে; রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ—এ সকলকেই শব্দের সাহায্যে এমন অনুভূত করাইবার শক্তি কবি কীট্‌সের যেমন ছিল, এমন আর কাহারও নহে। এখানে আমাদের কবি, "হংসপৃষ্ঠে ঐ কোমল কপোলের স্পর্শ"—শুধু বর্ণনা নয়—আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী। এখান হইতে রবীন্দ্র-কবি আপন কবি-প্রকৃতির পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছেন। দিবা-দ্বিপ্রহরের এই বনভূমি-চিত্র কবি রবীন্দ্রের অধিকারভুক্তই বটে, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এমন চিত্র বিরল। তথাপি ইহাও লক্ষণীয় যে, ঐ চিত্রের মূল উপাদান—সঙ্গীত। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আলোক, শব্দ, জল, বায়ু, এমন কি গন্ধ পর্য্যন্ত গতিশীল; নীরবতার মধ্যেও গতি আছে; সেই গতি সঙ্গীত; এমন কি—

যেন আকাশ-বীণার
রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল, মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।

তাই "চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী জলেস্থলে, নভস্তলে"; ইহাই বনভূমির 'সুন্দর কাহিনী', বা উপভোগ্য রসরূপ। ঐ যে বিভিন্ন রূপগুলি, যথা—বিবশ বকুল, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, সারসের দীর্ঘগ্রীবা, আকাশ-বলাকা—এ সকলই যেন সেই সঙ্গীতের আবেশে কবি-চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই আদি ও গূঢ়তম প্রেরণার কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ ও সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী·· কল্লোলে মিশিতেছিল। সমগ্র কবিতাটির ভাষাও ঐ নির্ঝরিণীর মত—'কলনৃত্যে বাজাইয়া মানিক্য-কিঙ্কিনী'—আমাদের চিত্তসরোবর-প্রান্তে কল্লোলে মিশিয়া যাইতেছে।

বহু বনগন্ধ ব'হে। ঐ 'গন্ধ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে দেখ।

মদন বসন্তসখা, ইত্যাদি। এই 'মদন বসন্তসখা'র সর্ব্বোত্তম কবি-কাহিনী কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে আছে; সেখানে সে রতিকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। এই মদনই ইন্দ্রের নিকটে নিজশক্তির গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—

তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি
সহায়মেকং মধুমেব লব্ধা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণেঃ
ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে। [৩ ১০।

[অর্থাৎ, "একমাত্র পুষ্পবাণই আমার সম্বল বটে, তথাপি সখা বসন্তকে মাত্র সহায় করিয়া আমি স্বয়ং পিনাকপাণি মহাদেবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারি—অন্যে-পরে কা কথা!"]

হেলায় হেলিয়া তরুপরে, ইত্যাদি। আবার চিত্ররচনা; বেশভূষা, আসন, ও দেহভঙ্গিমা সকলই রঙে রেখায় চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছে।

অধীর চঞ্চল… নিজ অবসর। 'কুমারে'র তৃতীয় সর্গের স্পষ্ট প্রভাব আছে। এখানে ধ্যানমগ্ন মহাদেব নয়—স্নানলীলারত তরুণী, তাই সে পুষ্পশর-নিক্ষেপের পূর্ব্বে কৌতুকবোধ করিতেছে, তাহার পক্ষে উহা খেলাই বটে। তুলনীয়—

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি' করিত মিনতি।…
কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরী
রহিত চাহি আকুল নয়নে।

["মদনভস্মের পূর্ব্বে"—কল্পনা

'কুমারে'ও মদন ধনুতে শরযোজনা করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল—বারবার শরাসন-জ্যা স্পর্শ করিতেছিল, যথা—

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ
শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ॥ [৩৷৬৪

এখানে মদন 'বহ্নিবিবিক্ষু' না হইলেও, পরে তাহার সকল দর্প চূর্ণ হইয়াছে।

গুঞ্জরি' ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর, ইত্যাদি। স্পষ্ট 'কুমারে'র শ্লোকগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়; এতএব, এ কবিতায় কীট্‌সও যেমন, কালিদাসও তেমনই, কবির রস-প্রেরণার সহায় হইয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনায় আছে—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ [৩৷৩৬

[একই কুসুম-পাত্রে ভ্রমর তাহার প্রিয়াকে মধুপান করাইয়া পরে নিজে পান করিতে লাগিল, আর, কৃষ্ণসার হরিণ প্রেমভরে তাহার শৃঙ্গের দ্বারা হরিণীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল—তাহাতে হরিণীর নেত্র দুইটি নিমীলিত হইতেছে।]

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন, ইত্যাদি। শেষের এই কয়পংক্তিতে নারীর নগ্ন দেহকান্তির বর্ণনা আছে—তাহা গ্রীকজাতি-সুলভ সৌন্দর্য্যপূজার নিদর্শন বটে; কবি প্রাক্সিটেলিসের ভিনাস-মূর্ত্তিকে রোমান্টিক রস-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়াছেন। স্নানাবসানে বিবসনা নারীর দেহতটে, ঐ যে মধ্যাহ্নরৌদ্র সর্ব্বাঙ্গের আরতি করিতেছে, 'ঘিরি' তারে নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ যেন একঠাঁই এসে সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার'—উহাতে সমস্ত প্রকৃতি সেই নারীপূজার পূজারিণী হইয়াছে। আতপ্ত বাতাস সিক্ত তনুখানি সেবকের মত মুছাইয়া দিল, এবং ছায়াখানি পদতলে মধ্যাহ্নদিবায় প্রণামের মত পড়িয়া রহিল। কবির অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, এই যে সৌন্দর্য্য, ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ হইয়াই সেই দেহকে সৌন্দর্য্যের দেব বিগ্রহ

করিয়া তুলিয়াছে—যাহা ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, অতএব কামনা-উদ্দীপক তাহাই এমন একটি পরিপূর্ণতায় সমাহিত হইয়াছে যে, তাহাতে আর কোন দ্বন্দ্ব, কোন বিক্ষোভ উৎপন্ন হয় না। কবি 'উর্ব্বশী' কবিতার সম্পর্কে, তাঁহার সেই পত্রে (পূর্ব্বে দেখ), এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে তাহা সত্য হইয়া উঠে নাই—কবির মনেই ছিল, কবিতায় তাহা নাই, যথা—

"উর্ব্বশীতে দেহ-সৌন্দর্য্য ঐকান্তিক হয়েছে—অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে" [অর্থাৎ তাহা এতই পরিপূর্ণ (perfect) যে, তাহা দেবতাদের ভোগ্য—যে দেবতার দেহ নাই, ইন্দ্রিয়-সংস্কার নাই ; আনন্দ আছে—সুখ-দুঃখ নাই]।··· "সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তাহা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্ব্বচনীয়।"—বেশ বুঝিতে পারা যায় কবির সেই আদর্শ এই কবিতাটিতেই রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে, সে দিক দিয়া 'উর্ব্বশী' নয়—'বিজয়িনী'ই তাঁহার সার্থক রচনা। ঐ নগ্ন নারীদেহের সৌন্দর্য্যে সকল পিপাসার পূর্ণ-নিবৃত্তি হয় বলিয়াই মনের কোন চাঞ্চল্য থাকে না ; এইজন্য ইহার সাধনাকে "artistic monasticism" বা 'রসের ব্রহ্মচর্য্যা' বলে।

সুন্দরীর ঐ চিত্রখানি যেন ক্রমে ক্রমে রেখায়-রেখায়, রঙে-রঙে ফুটিয়া উঠিয়াছে—একেবারে সবখানি চোখের উপরে উদ্ভাসিত হয় না। প্রথমে কেবল স্রস্ত কেশভার, তারপর উর্দ্ধ হইতে অধোদেহ পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের ঝলক, তারপরে 'পদতলে ছায়াখানি রহিল পড়িয়া'। বর্ণচিত্রের তুলনায় শব্দচিত্রের যেমন একটি ঐরূপ অক্ষমতা আছে, তেমনই ঐ পারম্পর্য্য—বর্ণনার ঐ কালক্রম—কাব্যের পক্ষে একটা বড় লাভ ; উহার জন্যই, শুধু নেত্রপথে নয়—শোত্রপথেও চিত্রের সহিত সঙ্গীত-রস আস্বাদন করা সম্ভব হয়। এই বাণীখণ্ডটিতে আমরা যে একখানি ছবি নেত্রগোচর করিতেছি তাহা যেন সঙ্গীতেরই সুর-স্রোতে স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে—বনভূমি ও চিত্রের অপর আসবাবগুলিও তেমনই সঙ্গীতের সুরে ভাসিয়া উঠিয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই এ কবিতা একাধারে 'ছবি ও গান'। ইংরেজ-কবির সেই সুন্দর উপমা ও পাশ্চাত্য কবি-প্রসিদ্ধিটি রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য।—

I will speak, and build up all
My sorrow with my song, as yonder walls
Rose slowly to a music slowly breathed,
A cloud that gathered form.

[*Œnone*

এবং—

Anon out of the earth a fabric huge
Rose like an exhalation with the sound
Of dulcet symphonies and voice sweet.

[*Milton*

—এইরূপ কবিপ্রসিদ্ধির মূলে যে তত্ত্ব আছে—রবীন্দ্র-কাব্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; এ কাব্যের রসসৃষ্টিতেও যেমন, রূপসৃষ্টিতেও তেমনই সঙ্গীতই প্রধান উপাদান। ['প্রথম পর্ব্ব' দ্রষ্টব্য]

ছায়াখানি রক্তপদতলে, ইত্যাদি। এই বর্ণনা কিরূপ 'Pictorial' বা চিত্রধর্ম্মী, তাহা লক্ষণীয়। মধ্যাহ্নকাল বলিয়া ছায়া এমন স্বল্পায়তন হইয়াছে, সেইজন্যই তাহা পদতলে

চ্যুতবসনের মত দেখাইতেছে। দেহচ্ছায়াব এইরূপ চিত্র আর এক স্থানে আছে তাহাও কম প্রেক্ষণীয় হয় নাই, যথা—

পূর্ব্বাচল হ'তে
ধীরে ধীরে স'রে এসে পশ্চিমে হেলিয়ে
দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া স্খলিত-বসন মোব
অম্লান নূতন শুভ্র সৌন্দর্য্যের পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ বনতল, ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া, সুপ্ত বায়ু,......
স্তম্ভিত অটবী। সেইমতো চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী—ছায়া সহচর।

[চিত্রাঙ্গদা

—এখানে ছায়া দীর্ঘতব, তাই তাহাকে 'দেহের সহচর' বলিয়া মনে হইতেছে; এই বর্ণনাও চিত্রধর্ম্মী—'Pictorial'।

পরক্ষণে ভূমিপরে···তূণশূন্য করি। এই অনুত্তম সৌন্দর্য্যের সম্মুখে মদন অর্থাৎ প্রণয়-লালসা, ভোগ-পিপাসা পবাজিত, নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমাদেব বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণকে অর্থাৎ 'পরমসুন্দব'কে 'মদনমোহন' বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে মদন শুধুই মূর্চ্ছিত নয়—সেই কামই প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এখানে তাহা হইবাব প্রয়োজন নাই, কাবণ সেই সৌন্দর্য্য আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ,—ইহাব গৌবব বৃদ্ধিব জন্য প্রেম বা কোনরূপ হৃদয়বৃত্তিকে প্রয়োজন নাই। কবি অন্যত্র এই সৌন্দর্য্যেব স্তুতি কবিয়াছেন, সেখানেও পুরুষের সকল তৃষ্ণা, জীবনের সর্ব্ববিধ অভাব-বোধ লুপ্ত হইয়া, একটি পবমা-নির্বৃতির উদ্রেক হয়; যথা—

পুরুষের পৌরুষ-গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ চরণতলে।

[চিত্রাঙ্গদা

—এখানে সেই 'পূর্ণ সৌন্দর্য্য', এখানে অবশ্য পৌরুষের পরাজয়—পুরুষের পুরুষ-সুলভ সর্ব্ব-কামনার অবসান; মদনের পবাজয় তার চেয়ে বড পরাজয়, কারণ উহা সেই কাম বা কামনাব পবাজয়—যাহা সর্ব্ব জীবপ্রবৃত্তিব মূলে দুর্জ্জয় হইয়া আছে। ইহার পরে সেই পুরুষ-বীব বলিতেছে—

আজ মোর
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা-অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।

[ঐ

তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ঐখানে ঐ সৌন্দর্য্যের স্তুতি কামহীন নয়, উহাতে হৃদয়ের একটা প্রবল আবেগ যুক্ত হইয়া আছে—তাই ঐ সৌন্দর্য্য শুধুই পূর্ণ নহে, উহা সেই এক নারী, যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—"ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্"। 'চিত্রাঙ্গদা'য় অর্জ্জুন শেষে সৌন্দর্য্যকে ধিক্কার দিয়া, নারীর নিছক নারী-মহিমাকেই বরণীয় করিয়াছে; অতএব সেখানে ঐ সৌন্দর্য্যপূজা এতখানি হইবার প্রয়োজন ছিল না। তথাপি রবীন্দ্র-কবির কবি-মানসে ঐ 'Aestheticism'-এর একটা স্থায়ী সংস্কার কোথাও তত্ত্ব-রসে, কোথাও বা রস-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে এই সকল কবিতার একটি বিশেষ মূল্য আছে।

নিরস্ত্র মদন পানে···প্রসন্ন বয়ানে। অর্থাৎ, সেই মুহূর্ত্তে অনিন্দ্যসুন্দরী মহাশ্বেতা তাহার হৃদয়ের উন্মুখ ও উদ্দাম কামনাকে বশীভূত করিয়া প্রেমেও একটি অপূর্ব্ব আত্মস্থতা লাভ করিল। 'কাদম্বরী'র কাহিনী ও এই কবিতার ভাববস্তু এক নহে; কবি ঐ কাহিনীতে প্রেমেরই একটি অতিশয় আত্মদৃঢ় শুচিশুদ্ধ আদর্শকে মদন-বিজয়ীরূপে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু এই কবিতায় ঐ নীতি-সংস্কারের উপরে—কবি-রবীন্দ্রের আত্মগত, আরও গভীর আরও দৃঢ়মূল ঐ Aestheticismই জয়ী হইয়াছে।

কবি-জীবনের এই পূর্ব্বার্দ্ধে—ঐ দুইয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রহিয়াছে, নীতিজ্ঞানই সর্ব্বত্র প্রবল; কিন্তু পরে তাহা ছিল না। কবি জীবনকেও আর্টের তত্ত্বে শোধন করিয়া—একটি নূতন জীবন-বেদ প্রচার করিয়াছিলেন—উপনিষদের মন্ত্রগুলা খাঁটি Aesthetic-এর ধর্ম্মমন্ত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সর্ব্বশেষে বেদ-মন্ত্রের বাগ্‌দেবীকে মূর্ত্তিমতী করা হইয়াছে—নৃত্যপরা যুবতীর চরণপাত ও বাহুবল্লরীর লীলায়িত ভঙ্গিতে। কবিমানসের এই বিকাশধারা বড় বিচিত্র হইলেও—আদৌ দুর্ব্বোধ্য নয়; পরে যথাস্থানে আমি সে আলোচনা করিব। কাব্য পাঠকালে মাঝে মাঝে, এই প্রসঙ্গবিশেষের প্রয়োজন আছে, তাহাতে পরে কবিকে সমগ্রভাবে বুঝিবার সুবিধা হইবে। নতুবা কবিতার রসাস্বাদনকালে এইরূপ তত্ত্ববিচার নিতান্ত বেরসিকের কাজ, তাহা আমি জানি।

জীবন-দেবতা

কবিতা-প্রসঙ্গ

('জীবন-দেবতা' একটি কাব্যবস্তু নয়—তত্ত্ব-বস্তু, কবির অধ্যাত্ম-জীবনঘটিত একটা তত্ত্ব; সেই তত্ত্বটিকে তিনি কাব্যরস-মণ্ডিত করিয়া কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; আমাদের নিকট কবিতাগুলিই মূল্যবান, সেই তত্ত্বের সহিত কাব্যের কোন সাক্ষাৎ রস-সম্পর্ক নাই। এই কবিতাগুলিতেও একটি রস আছে, তাহাকে একরূপ বৈষ্ণব-ভক্তিরস বলা যাইতে পারে—যদিও উহা ঠিক সেই বস্তু নহে, পরে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। তথাপি, আমরা যে আদি হইতে রবীন্দ্র-কাব্যে একটি স্ব-তন্ত্র কবি-মানসের অনুসরণ করিতেছি, এবং তাহার

প্রায় সমস্ত লক্ষণই ইতিমধ্যে নিরূপণ করিয়াছি, তাহারই একটা পৃথক বা অন্যবিধ প্রমাণ হিসাবে, (এই 'জীবন-দেবতা' সম্পর্কে কবির নিজেরই আত্ম-কথা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত ও আলোচনা করিব—কবির জবানীতেই ঐ 'জীবন-দেবতা'র পরিচয় করাইব। কবি যেকালে ঐ 'জীবন-দেবতা'-নাম এবং তৎসম্পর্কিত একটা গভীর প্রত্যয় অন্তর মধ্যে লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই লিখিয়াছিলেন—

"শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া লেখনী চালনা করিতেছেন? তাহা নহে। সেই-সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটা অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।"

—অর্থাৎ, কবির মধ্যে যে একটি অতিরিক্ত শক্তির বিকাশ হয়—যাহাকে আমরা দৈবীশক্তি বলি, তাহা এ কবির পক্ষে একটা নৈমিত্তিক কিছু নয়—তাহাই তাঁহার সারাজীবন —ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের—নিত্য-উদ্বোধনী শক্তি; তাঁহার কবি-জীবন ও ব্যক্তিজীবন অভিন্ন। আবার, সেই কারণেই, ঐ কবিতার ভিতর দিয়াই একটা গোটা-জীবনের ক্রমোন্মেষ হইতেছে,—তাই কবিতাগুলির কোন পৃথক খণ্ড-অর্থ নাই, সেগুলি একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যে গড়িয়া উঠিতেছে।

"এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভাল-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া, আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি।...আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে বর্ত্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন।...নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে, যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে, প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে মহাকাল-নদীর ঘাটে-ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে জীবন-দেবতার কথা বলিলাম।"/

—প্রশ্ন এই যে, কবির 'জীবন-দেবতা'র আবির্ভাব, অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে বহন করিয়া লওয়া ঐ প্রেম, এবং ঐ প্রাণ—এ সকল কি আর কোন মানুষের, বা মানব-সাধারণের পক্ষেও সত্য? না, উহা ঐ কবি-ব্যক্তির জীবনেই একটি unique বা অ-সাধারণ আবির্ভাব। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ তত্ত্ব মানব-জীবনের তত্ত্বও যেমন নয়, তেমনই ঐ তত্ত্বের যে কাব্য তাহাও মানবীয় কাব্যরস-সংস্কারে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।)

এখানে একটা বিষয়ে আমি রবীন্দ্র-কাব্যের রসপিপাসু পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঐ যে "মহাকাল-নদীর ঘাটে-ঘাটে" এবং "অতীতের মধ্য হইতে অনাগতে"র মধ্যে নিরন্তর বাহিত হওয়া—উহার কাব্যপ্রেরণা আমরা 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় দেখিয়াছি; 'অতীত হইতে অনাগতে'র মধ্যে—নিরন্তর উত্তরণের যে অসীম আনন্দ তাহা রবীন্দ্রীয় জীবন-বাদের তথা জগৎ-ব্রহ্মবাদেরই কথা, রবীন্দ্রনাথ ঐ 'বিশ্বে'র ঐ সৃষ্টিস্রোতের অনাদ্যন্ত ধারায় যিনি জীবন-তরণীর কর্ণধার, তাঁহাকেই তাঁহার ইষ্টদেবতারূপে, কত ছন্দে, কত সুরে, কত রসে আরতি করিয়াছেন! তাঁহার মতে, ঐ জড়-সৃষ্টিই ব্রহ্ম—তাহার প্রত্যক্ষ কারণ এই যে, ঐ

অনন্ত প্রকৃতিরূপিণীর সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, রসৈকপ্রাণ কবি উহার বাহিরে বা উর্দ্ধে আর কিছুকেই মানিতে প্রস্তুত নহেন। 'দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়া'—সেই মায়াকে তিনি উত্তীর্ণ হইতে চান না; তিনিই ব্রহ্মময়ী, তাঁহাকেই রবীন্দ্র-কবি তাঁহার জীবনে একটি নূতন তত্ত্বের প্রকাশরূপে অনুভব করিয়া সারাজীবন বড় আনন্দে ও আশ্বাসে তাঁহার স্বর্ণতন্ত্রী বীণায় অসংখ্য সুর বাজাইয়াছেন। তত্ত্বহিসাবে, ঐ জগৎ-ব্রহ্ম, এবং কবিরও ঐ ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সম্পর্কটি ছিদ্রহীন নহে; ঐ 'বিশ্বে'র সঙ্গেও 'ব্যক্তির' নিত্যলীলায়—বিশ্বও যেমন নিত্য, ব্যক্তিও তেমনই নিত্য—সেই 'জীবন-দেবতা'র আবির্ভাব ঐ ব্যক্তির জীবনেই চিরন্তন হইয়া আছে ও থাকিবে—এই তত্ত্ব আদৌ বিচারসহ নয়; কিন্তু কবি তাঁহার অতিউগ্র আত্মভাব-নিষ্ঠার বশে, সেই সংশয়কে কখনো মনে স্থান দেন নাই।

"আমার মধ্যে আমার অন্তর-দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে।···এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যে নিয়ত এই প্রেমের লীলা।"

—এই কথাগুলি কবির কথা—রবীন্দ্র-কাব্য ও কবি-মানস বুঝিবার পক্ষে কথাগুলি বড়ই মূল্যবান। আগে আমরা 'জীবন-দেবতা' ও 'বিশ্ব-শক্তি' বা 'জগৎ-ব্রহ্মে'র রবীন্দ্রীয় 'দর্শন' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছি—আমি কবি-মানসের ভাব-বীজ ও তাহার বিকাশে এই তত্ত্বের বহুল আলোচনা বারে বারে করিয়াছি। একটু আগেও বলিয়াছি—ঐ 'অন্তর-দেবতা' রূপে কবি যে বিশ্ব-শক্তির আবির্ভাব তাঁহার জীবনে দেখিয়াছেন, তাহার সহিত সম্পর্কটা রসের সম্পর্ক, অর্থাৎ—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনন্তপ্রবাহিনী রূপরসধারাই কবিকে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। সেই রূপরস আস্বাদনের আনন্দই জগৎরূপী ব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন। সেই আনন্দই প্রেমের আনন্দ, অর্থাৎ ঐ রূপ-রসের অনুভূতিই প্রেমের অনুভূতি। আবার ঐ যে 'রূপ-রসের' নব-নব লীলা—তাহার 'অর্থ কিছু বুঝি না'—অর্থ বুঝিতে গেলে আনন্দও অন্তর্হিত হয়; অর্থ একটা বন্ধন—তাহাতে সমাজ-জীবনের, সংসার-জীবনের দায়িত্ব, জীবন-সত্যের বাধা আছে। ঐ যে 'লীলা', এবং 'অর্থ কিছুই বুঝি না'—কবি রবীন্দ্রের কাব্য-সাধনায় উহা একটা বড় তত্ত্ব; উহাই খাঁটি আর্টবাদ—জীবন-বাদের বিরোধী।

আরও লক্ষণীয়, 'ঐ আমার মধ্যে আমার অন্তরদেবতা' কথাটি। উহাই সেই পাশ্চাত্য রোমাণ্টিক কবিদের 'আমি' বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা; সেই self, সেই Individual ভারতীয় ভাব-সংস্কারে আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কথাটির মধ্যে একটা মিষ্টিক অনুভূতির আভাস থাকিলেও—ঐ ভাষা (প্রকাশের আনন্দ) উপনিষদের প্রতিধ্বনি হইলেও, ঐ আনন্দ সেই 'আত্মন'-এর প্রকাশেই যে আনন্দ সেই আনন্দ নহে; সে প্রকাশ ও তাহার আনন্দ কোন ব্যক্তিতে নয়, বিশ্বে; এখানে ব্যক্তিই বড়, 'বিশ্ব' সেই ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। "এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না"—ইহার আরও অর্থ এই যে, আমার কবি-জীবন তথা কাব্যসৃষ্টির কর্ম্মে আমি সেই একজনের হাতের যন্ত্রমাত্র—তাহাতে কখন কি সুর বাজে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত, আমার কোন দায়িত্ব তাহাতে নাই। ইহাও খাঁটি আর্টবাদ—ঐ লীলাবাদই আর্টবাদ; কবি এখানে আপনার কবি-ধর্ম্মের গুহ্যতম মন্ত্রটি ব্যক্ত করিয়াছেন; অর্থ-ই অনর্থ—বুঝিতে গেলে বহু দায়িত্ব মনকে অষ্টপাশে বদ্ধ করে; জীবনকে ভোগ করিতে হইলে—নিজ

মানবীয় সত্তাকে পূর্ণ মুক্তি দিতে হইলে—ঐ লীলা, অর্থাৎ সর্ব্ব দ্বন্দ্ব বিরোধহীন রস-সম্ভোগের অবস্থা চাই,—কারণ,—

"Complete life comes when conflict between morality and sense disappears in artistic feeling. Only as man plays is he truly man." —*Schiller.*

রবীন্দ্রনাথের এই কবিধর্ম্মের চূড়ান্ত বিকাশ হইয়াছে তাঁহার শেষ বয়সের রচনাগুলিতে—বিশেষ করিয়া 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', প্রভৃতি নাট্যকাব্যগুলিতে। অতএব, 'জীবন-দেবতা' সম্পর্কে তাঁহার একালের কথাগুলির একটা গভীরতর মূল্য আছে।

"মনের ভিতরে ভিতবে যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্টি হ'য়ে উঠ্‌ছে,—বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মত নয়,—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়।··শাস্ত্রে যা লেখে·· আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত: আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সকল জীবন দিয়ে যা' গড়ে তুলতে পারবো তাই আমার পরম সত্য।"

—এই উক্তি অতিশয় নির্দ্দোষ—কবি কেন, যে কোন মানুষ তাহাব ইষ্টের সাধনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে করিবে—হিন্দুর সাধন-তত্ত্ব ইহাই। কিন্তু যেহেতু সমাজও আছে, মানব-সাধারণের সঙ্গে একটা সর্ব্ব-জীবনের দায়িত্ব পালন করিতে হইবে, না করিলে ব্যক্তির সেই অতি-স্বতন্ত্র ইষ্টসাধনাও প্রেমহীন হইয়া পড়ে, ঐরূপ আত্মসাধনায় যে-বিশ্বের সহিত আত্মীয়তার অভিমানে ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই বিশ্ব নিতান্তই মনোগত—সে-ই সেই বিরাট 'আত্মা' নয়, তাহা প্রেমহীন আত্ম-প্রতিবিম্ব মাত্র। তেমন মানুষের সেই 'পরম সত্য' নিতান্ত তাহারই সত্য, সে সত্যের সাক্ষ্য তাহার নিজের সেই 'বিশ্বে'র বাহিরে আর কোথাও নাই। আসল কথা, উপরের ঐ উক্তিটি ঘোব Egoist-এর উক্তি, ঐ যে নূতন অন্তরিন্দ্রিয়, উহা মানব-বিশ্বের পরিবর্ত্তে সর্ব্বভূতে "অবিভক্তং বিভক্তেষু" সেই বিশ্ব-আত্মার পরিবর্ত্তে —নিজ ব্যক্তি-সত্যকে একমাত্র সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার একটি অতিউদ্ধত চেতনা। শাস্ত্র-অর্থে যে নিয়ম বা নীতিগুলি সর্ব্বমানবের পালনীয়, দেহ ধারণ করিলে তেমন কতকগুলি নীতি পালন করিতেই হয়—নিজ ইষ্টসাধনা যেমনই হোক। কবি এখানে বড় উগ্রভাবেই আত্মঘোষণা করিয়াছেন। কবির ঐ সকল কথা যদি শিরোধার্য্য করিতে হইত, তবে নিশ্চয় তাঁহার কাব্য-পাঠ আমাদের পক্ষে একটা ঝকমারি হইত। আমরা তাঁহার 'জীবন-দেবতা'কে দেখিলাম, তিনি তাঁহার কে তাহাও বুঝিলাম; সে কেবল, ঐ 'জীবনদেবতা'-বিষয়ক কবিতা-গুলির খাতিরে। নতুবা, কাব্যবিচারে ঐ তত্ত্ব স্বীকার বা তাহা অনুসরণ করিবার যে কোন প্রয়োজন নাই, তাহা আশা করি, আমি বুঝাইতে পারিয়াছি। সকল কবির সকল কবিতার মতই তাঁহার কবিতাগুলিও এক-এক লগ্নে কোন এক বিশেষ কাব্য-প্রেরণার বশে, এক একটি সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি বলিতে হইবে। তাহাতে কবিমানসের বিভিন্ন কালের বিকাশ-লক্ষণ যেমনই থাকুক না কেন, (আমরা তাহাও দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতেছি), সেই কবিতার রসাস্বাদে কোন বিঘ্নও ঘটে না। তাঁহার কবিতা সেকালের বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অতিশয় নূতন, তাহাতে আধুনিক ব্যক্তি-স্বতন্ত্র লিরিক-কবির ভাবনা-প্রেরণা আছে; সেইজন্য

তাহা যদি দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে, তবে তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ, ঐরূপ একটা 'জীবনদেবতা' ও তাহার তত্ত্ব উপস্থাপিত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; কবিতাকে একরূপ অস্বীকার করিয়া কবিকে দেখিতে বলিবার—কবিতার উপরে কবিকে স্থান দিবার, ঐরূপ আত্মঘোষণা বড়ই অশোভন হইয়াছে। আমরা জানি, কবির ঐরূপ অতি উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাঁহার কবিজীবনে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই স্বাতন্ত্র্যই যে কল্পনা ও যে রস-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই কবির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—সেই কীর্ত্তির চেয়ে কবি কখনই মহৎ হইতে পারে না—কোন কবিই তাহা হন নাই। তিনি নিজেই তাঁহার একটি এই জীবন-দেবতা সংক্রান্ত কবিতায় বলিয়াছেন—আমি প্রথমেই তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—

এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল,
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যতদিন থাকে ততদিন থাক,
যশ-অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক
ধূলার মাঝে
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ
বিবিধ সাজে।

["সাধনা"

—ইহাই সত্য। তারপর তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সাধনা—সেই 'জীবনদেবতা' ও তাঁহার জীবনে তাহার অখণ্ড প্রকাশ ও অখণ্ড তাৎপর্য্য—এ সকলের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, না থাকার জন্য যে আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, তার প্রমাণ, আমরা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বপ্রকার রস—ভাল-মন্দ—সবই কতরূপে আস্বাদন করিতেছি; ঐ কবিতার ভিতরেই কবিকে দেখিতেছি, সেই দেখাই প্রকৃত কবি-দর্শন। সেই দেখাতেই 'অনুকূল ও প্রতিকূল', 'যোগবিয়োগ' সকল উপকরণই আপন পৃথক তাৎপর্য্যে সত্য হইয়া উঠি[illegible]—বরং অখণ্ড প্রকাশের অখণ্ড তাৎপর্য্যই তাহাতে বাধা দিবে।

ঐ 'জীবন-দেবতা'-তত্ত্বের সহিত কাব্যরসের কোন নিগূঢ় সম্পর্ক নাই; ঐ বিষয়ক যত কবিতা আছে তাহার যেটুকু পৃথক কাব্যরস কাব্যবিচারে তাহাই গণনীয় ও উপভোগ্য; এবং তাহাও ভাবে-ভঙ্গিতে উপমায়-ব্যঞ্জনায় সেই এক রবীন্দ্রকাব্যই বটে।

কবিতা-পাঠ

প্রথম স্তবক। নিঠুর পীড়নে……দলিত দ্রাক্ষাসম।—ইহা কবিমানসের 'Luxury of pain'—দেহের যাতনা নয়; অন্তরের একটা সুগভীর অভাব-বোধের যে

যাতনা, এবং তাহাতে সান্ত্বনালাভের জন্য মনকে অতি উচ্চে স্থাপন করার যে প্রয়াস, কবি সম্ভবতঃ তাহার কথাই বলিতেছেন। সে যেন সেই 'জীবন-দেবতার'ই কামনা-পূরণের জন্য। এখনও ঐ অন্তর-দেবতা কবির ব্যক্তি-দেহে যেন একটু পৃথক হইয়া আছে—একটা ব্যবধান এখনও আছে; কিন্তু পরে দুই এক হইয়া গিয়াছে, তখন আর 'নিঠুর পীড়ন' নাই—কবির সেই ব্যক্তি-দেহে ঐ দেবতা ধরা দিয়াছেন, তাই তখন সমস্ত দেহে রসাস্বাদের আনন্দ আর ধরে না, যথা—

'পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা'

[গীতাঞ্জলি

কিম্বা—

তার অন্ত নেই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু পরমাণু পে'ল কত আলোর সঙ্গ।...
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন '

['দেহ'—গীতিমাল্য।

সেখানে 'জীবন-দেবতা'র কোন পৃথক সত্তা নাই।

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা, ইত্যাদি। 'বাসনার সোনা' অর্থাৎ হৃদয়ের যে সকল কামনা অতিবিশুদ্ধ—গভীর মর্ম্মতল হইতে আহৃত, যাহাতে আর মৃত্তিকার স্পর্শ নাই—খাদ বা বাস্তবের সংকীর্ণতা নাই।

তোমার ক্ষণিক খেলনার লাগি,' ইত্যাদি। অর্থাৎ, কবি যে নিত্য নূতন বাণী-বিগ্রহ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন দৃঢ় মত বা ভাবমন্ত্রের বাঁধন নাই, সেই জীবন-দেবতার যখন যেমন রুচি, তিনি সেই অনুসারে নব-নব রস-রূপের কবিতা রচনা করিয়া চলিয়াছেন। এখানে আমরা কবির কবিকর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ পাইতেছি, তাহাতে আমার সেই মূল কথাটির সমর্থন রহিয়াছে। এ কবির কবি-প্রেরণা মুখ্যতঃ আর্টধর্ম্মী—এইজন্য তাহা এমন বহুরূপা। ঐ জীবন-দেবতা 'সুন্দরের' দেবতা, রসের দেবতা—উহা সেই 'Principle of Beauty in all things'—কবি কীট্‌স্ (Keats) যাহার কথা বলিয়াছেন; পরে, ঐ শতাব্দীর শেষে এই আর্টবাদ চরমে উঠিয়াছিল Oscar Wilde-প্রমুখ কবি ও লেখকদের রচনায়। তাঁহাদের মতে, সৌন্দর্য্যের উপাসক যাহারা অর্থাৎ নিছক রসের সাধক যাহারা, তাহারা এক-একটি ক্ষণে সেই সুন্দরের এক একটি রস-রূপে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবে—পূর্ব্ব বা পশ্চাতের চিন্তা করিবে না, তবেই সেই রূপটিকে মূর্ত্তি দিতে পারিবে।—Art is a passion, and, in matters of art, thought is inevitably coloured by emotion, and so is fluid rather than fixed, and·· cannot be narrowed into the rigidity of a scientific formula, or a theological dogma · we must surrender ourselves to the work in question, whatever it may be, if we wish to gain its secrets, for the time, we must think of nothing else, can think of nothing else indeed."

[*The Critic as Artist*

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবিতার তাৎপর্য্য নিজে অবগত নহেন—সবগুলির মধ্য দিয়া কোন একটা যে অর্থ বহিয়া চলিয়াছে তাহার সজ্ঞানতা সম্ভবও নয়, কারণ তাহা তো ক্রম-প্রকাশমান (কবিতা-প্রসঙ্গ দেখ)। উপরের উদ্ধৃত ঐ কথাগুলিরই একটি ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যাইতেছে; ঐ যে 'ক্ষণিক খেলনা,' উহার সহজ অর্থ, তাহা পূর্ব্বের জেরও নয়, পরেও তাহারই অনুবৃত্তি থাকিবে না; কোন formula বা dogma-র শাসন তাহাতে নাই, আর্টিষ্টের যখন যেমন mood বা ভাবাবস্থা, কবিতাও সেই রসকে রূপায়িত করিবে; "We must surrender ourselves to the work in question…for the time we must think of nothing else, can think of nothing else indeed." রবীন্দ্রনাথ এতখানি 'ক্ষণ'-ধর্ম্মী নহেন; তাঁহার কাব্যে ঐ 'ক্ষণ'গুলি আরও দীর্ঘ, সে যেন এক-একটা পর্ব্ব, এক-একটি পর্ব্বে তাঁহার আর্টধর্ম্মী কবি-প্রেরণা 'খেলনা'র রূপ-রং পরিবর্ত্তন করে। এই ভাবটি পরে একটি কবিতায় কবি বড় সুন্দর ভঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।
প্রতি নিমিষের কাহিনী
আজি বসে' বসে' গাঁথিসনে আর, বাঁধিস্ নে স্মৃতি-বাহিনী।

['উদ্বোধন'—ক্ষণিকা

এই ভাব বা তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিমানস ও কাব্য—উভয়ের পক্ষে সত্য। তাঁহার কবিতা সর্ব্ববিধ ভাব ও ভাবনা-ভঙ্গিকে রূপ-রসে মণ্ডিত করিয়াছে—কোন মত বা তত্ত্বের বাঁধনে ধরা দেন নাই বলিয়া, তিনি উপনিষৎ হইতে বাউল-বৈষ্ণব, এবং বাউল-বৈষ্ণব হইতে অতি-আধুনিক বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব মতবাদ—সকলই তাঁহার কবিতার আর্টের উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সকলই তাঁহার সেই 'আমি'র (এখানে যিনি 'জীবন-দেবতা') রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে; শেষে তাহা যে ধর্ম্মমন্ত্রকে (Creed) বরণ করিয়াছিল, তাহাও ঐ 'রস'—একরূপ সহজ আনন্দবাদ, তাহাতে কবি বাস্তবের সকল দায়িত্ব মোচন করিয়াছিলেন, অথবা বাস্তবকে সেই রসের রসায়নে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ['রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাট্যকাব্য দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় স্তবক। লেগেছে কি ভালো, ইত্যাদি। ঐ প্রশ্নের উত্তর ঐ প্রশ্নের মধ্যেই আছে; **অর্থ:** আমার সেই সকল 'নর্ম্ম' ও 'কর্ম্ম' তোমার তৃপ্তি-বিধান করিয়াছে। তুলনীয়—

সুখসিক্ত নেত্রমম
শিশিরিত পুষ্পসম
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম
মাধুরী মন্থর।
মোর পুলকিত হিয়া
সর্ব্বদেহে বিলসিয়া,
বক্ষে উঠে বিকশিয়া
পরম সুন্দর,
নব অমৃত-নির্ঝর।

ওগো কে-তুমি আমার মাঝে নূতন-নবীন
সদা আছ নিশিদিন
তুমি কি বসেছ আজি
নব বর-বেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমরাজি
অঙ্কে লয়ে বীণ ?

[উৎসব—চিত্রা

এখানে সেই 'জীবন-দেবতা'র উৎসববেশ কল্পিত হইয়াছে। এ কবিতাগুলির একটু ভিতরে দৃষ্টি করিলে, এবং রূপকের ঐ ছদ্মবেশ খুলিয়া লইলে মনে হয় না কি যে, কবি যেন আপনারই প্রেমে আপনি বিভোর হইয়াছেন ? ভিতরে যাহাকে তিনি দেখিতেছেন—সে তো তিনি নিজেই ; উপরের উদ্ধৃত ঐ কবিতাটিতে কবি ঐ যে 'ওগো কে তুমি' সম্বোধন করিয়াছেন —সেই 'তুমি' কবির মানস-পটে প্রক্ষিপ্ত 'আমি' ছাড়া আর কেহ নয় ; অতএব উহাই Narcis-ism বা আত্মপ্রেমবিভোরতা।

তৃতীয় স্তবক। এই স্তবকে কবি যে বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মানব-সুলভ দুর্ব্বলতা মাত্র ; কারণ, কবি জীবনের যতকিছু ভাল-মন্দ, শক্তি ও অশক্তি, ভুল-ভ্রান্তি--সকলই সেই 'জীবন-দেবতা'র রসলীলার অন্তর্ভূত, তাই এইরূপ কাতরতা বা অপরাধ-স্বীকার মূল ভাবটির পক্ষে স্ববিরোধী ; ইহাতে প্রমাণ হয়, কবি এখনও তাঁহার পৃথক ব্যক্তি-চেতনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ঐরূপ সেন্টিমেণ্ট বৈষ্ণব ভাব-সাধকের উপযুক্ত বটে, কিন্তু জীবন-দেবতার উপাসক কবির উপযুক্ত নয়। অন্যত্র কবি ঠিক উল্টা কথাই বলিয়াছেন, যথা,—

অন্তরমাঝে বসি' অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা' বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীত-স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে !

এবং

বাধ কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।
আমি কিগো বীণাযন্ত্র তোমার ?
ব্যথিয়া পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে।
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ অপার বাসনা
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে ?

['অন্তর্যামী'—চিত্রা

চতুর্থ স্তবক। ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা, ইত্যাদি। মনে হয়, এ পর্য্যন্ত যাহা সম্বল ছিল তাহা ফুরাইয়াছে—পুরাতন হইয়া গিয়াছে; তুমি নিত্য নব-রূপের পিপাসু (পূর্ব্বে দেখ), আমাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া লও। কবি রবীন্দ্র তাঁহার কবি-জীবনে ও কাব্য-সাধনায় আরেক সোপান অতিক্রম করিতে অধীর হইয়াছেন, তাঁহার আর্টিষ্ট-মন কিছুতেই কোন একটি রসের ভঙ্গি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; ভাবেরও যে নূতনতা তাহা ঐ নবনব রসরূপ-সৃষ্টির জন্য।

রাত্রে ও প্রভাতে

কবিতা-প্রসঙ্গ

নারীর দুইরূপ—প্রেয়সী, ভোগসহচরী—এবং পূজারিণী—দেবীমূর্ত্তি। সেই একই নারীর মধ্যে ঐ দুই মূর্ত্তি আছে—এমন চিন্তা নূতন নয়, ঐ নারীই তো একই কালে সন্তানের জননী ও পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী; অতএব ঐ রহস্যটা আর রহস্য বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু এ কবিতায় কবি সেই অতি পুরাতনকে একটা নূতন দিক দিয়া বিস্ময়ের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে। আরও কথা এই যে, নারী-প্রকৃতির সেই রহস্য-সমাধান করিতে কোন দার্শনিক-তত্ত্বের প্রয়োজন নাই—কারণ কাব্যরসের পক্ষে ঐ রহস্যের বিস্ময়টাই বড়, আমরা তাহাই উপভোগ করিব। কবি বিহারীলাল যথার্থ-ই বলিয়াছেন—

> রহস্যই মনোলোভা
> বিশ্বের সৌন্দর্য্য-শোভা···
> রহস্য স্বপন-বালা
> খেলা করে মাথার ভিতরে,
> চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
> কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে;
> যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

[সাধের আসন

আমাদের কবিও 'নেশার নয়নে' ঐ নারীর মধ্যে সেই রহস্যকে দেখিয়াছেন; সে-নেশা যে কেমন, তাহা এই কবিতার মদিরা-সুরভি ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া বুঝিবার আছে। নারীর ঐ দুই রূপই এক; দুই-ই তাহার দেবী-রূপ বা মহাশক্তি-রূপ; একটিতে আমরা যে বিশেষ দেবী-রূপ দেখি এবং তাহাকেই পবিত্র ও পূজনীয় মনে করি, সে আমাদেরই মনের ক্ষুদ্র নীতিসংস্কার বা দুর্ব্বলতার জন্য; ঐ পূজারিণী-রূপেও আমরাই তাহাকে সাজাইয়াছি; সত্যকার নারী-পূজায় নারীই দেবতা—সে দেবতা আমাদের সর্ব্ববিধ কামনাই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—পূর্ণ করিয়া থাকেন। ঐ যে রতি-

সম্ভোগ-কামনা, উহাও দেবীর মতই সে পূর্ণ করিয়া থাকে, কবি অন্যত্র তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন, যথা—

"রাণীর মতন বসিব রতন-আসনে,
বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়-শাসনে,
দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা—"

['মার্জ্জনা'—কল্পনা

কবিতা-পাঠ

কবিতার প্রথমার্দ্ধে রতি-সম্ভোগের যে উজ্জ্বল বর্ণনা আছে, তেমনটি,—এক 'চিত্রাঙ্গদা'র স্থানবিশেষে ছাড়া—আর কোথাও নাই, সংস্কৃত কবিতার আদিরসও ইহার নিকটে নিতান্তই নিরুদ্বেল। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির এইরূপ বর্ণনার সহিত তুলনীয়—

Here he caught up her lips with his…
And strained her to him till all her faint breath sank
And her bright light limbs palpitated and shrank,
And rose and fluctuated as flowers in rain
That binds them and they tremble and rise again
And heave and straighten and quiver all through with bliss
And turn afresh their mouths up for a kiss,
Amorous, athirst of that sweet influent love.

[*Tirstam of Lyonesse* · Swinburne

কবিতারও এই অংশের কবি-ভাষা অধরপ্রান্তের সুরার বুদ্বুদের মত, স্থানে স্থানে আবরণ অতি স্বচ্ছ, যথা—

"ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে"

অথবা,

'সকল সোহাগ সয়েছিলে সখি হাসিমুকুলিত মুখে'

ঐ শেষের পংক্তিটির 'সয়েছিলে' কথাটিতে ব্যঞ্জনার চূড়ান্ত হইয়াছে।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি, ইত্যাদি। এই চারিটি পংক্তিই কবিতাটির মূল ভাববস্তু; ইহার ব্যাখ্যা—'কবিতা-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

১৪০০ সাল

কবিতা-প্রসঙ্গ

কল্পনাটি অতিশয় মৌলিক ও চমকপ্রদ। কবি একশত বৎসর দূরে বাংলার ভবিষ্যৎ কবি ও সমাজের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহার কবিতা নিশ্চয়ই ততদিন বাঁচিয়া থাকিবে, এবং সেদিনের কাব্যরস ও কবি যেমনই হোক, বসন্তের উন্মাদনা এমনই থাকিবে, তাহাতে কোন

সন্দেহ আছে কি? তিনি সেই শতবর্ষ পরের বসন্ত-উৎসবে সেকালের কবিকে তাঁহার অভিবাদন জানাইতেছেন, ভাব এই যে, তাহারা একালের এই কাব্য-রস আস্বাদন করিয়া হৃদয়ে একালের সহিত একটা যোগ অনুভব না করিয়া পারিবে না।

কিন্তু বিধাতার এমনই পরিহাস যে, পঞ্চাশ বৎসর গত না হইতেই, কবির সে আশা নির্মূল হইতে চলিয়াছে; ইহারই মধ্যে জীবন ও জগৎ যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, এবং কাব্য বলিতে গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া যে পিপাসা ও যে সংস্কার ছিল,—আর পঞ্চাশ বৎসরে, অর্থাৎ ঐ একশত বৎসর পরে যে তাহা আর থাকিবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। অতএব, কবির এই আশা অন্য অনেক আশার মতই "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে" এবং করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

কবিতা-পাঠ

কোন্ স্বর্গ হ'তে ভাসি'—রাঙায়ে দিয়েছে ধরা, ইত্যাদি। বর্ণনাটি কালিদাসীয়—'কুমারে'র তৃতীয় সর্গের সুর ইহাতে লাগিয়াছে।

কত কথা পুষ্প প্রায়, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> পুষ্পের মতন সঙ্গীতগুলি
> ফুটাই আকাশতলে।

['পুরস্কার'—সোনার তরী

সিন্ধুপারে

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতাটিতে কবি-কল্পনার অরুদ্ধ লীলাই একটি বিশিষ্ট রস সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও শেষে একটি তত্ত্বের বাঁধন আছে। আসলে উহা একটি রূপক কবিতা; তাহাতেই রোমান্টিক কাব্যকল্পনার সেই bizarre বা ভীতি-বিস্ময়-মিশ্র অথচ সুন্দর একটি ভাব—রহস্য-রস মণ্ডিত হইয়াছে। ঐ রসের এমন কবিতা রবীন্দ্রকাব্যেও আর নাই। ঐ প্রেরণা সম্পূর্ণ নূতন, বা বিদেশী। প্রাচীন কাব্যে—আখ্যান-আখ্যায়িকায় যে সকল ঘটনা বা বর্ণনাগত বিস্ময়-রস-সৃষ্টি আছে—কল্পনার সেইরূপ আতিশয্যই নয়,—ইহা মনকে শুধুই চমকিত করে না; বিলাতী রোমান্টিক কবিগণের—(যেমন, কোলরিজ)—সেই Supernatural-কে বাস্তব-অনুভূতির সমান করার কবি-কর্ম্মও ইহাতে আছে, যদিও প্রথম হইতেই একটা রূপকের ইঙ্গিত থাকায় আমাদের মন একটু সতর্ক ও সজাগ থাকে। তৎসত্ত্বেও ঐ bizarre বা রোমহর্ষক অদ্ভুত বর্ণনা আমাদিগকে অভিভূত করে। কবিতার রূপক-অর্থ এই বলিয়া মনে হয় যে, সহসা একজনের স্বপ্ন-চেতনায় মৃত্যুর আহ্বান আসিল, স্বপ্নের ঘোরে সেই মৃত্যু দূতীর অনুসরণ করিয়া সে এই পরিচিত জগৎ ছাড়াইয়া, দূরদূরান্তরের অপরিচিত দেশে কোন্ বিস্মৃত অতীতের মায়াময় রাজ্যে উপনীত হইল; সেখানে রূপকথা ও প্রাচীন কাহিনী-বর্ণিত এক বিপুল-বিরাট

প্রাসাদে সেই দূতী তাহাকে লইয়া গেল। পরে সেই প্রাসাদের এক কক্ষে তাহার সহিত সেই অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী দূতীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এখন দেখা গেল, তিনিই সেই রাজ্যের অধিশ্বরী, এবং মৃত্যু অর্থে সেই মহারহস্যময়ীর সহিত ঐ বিবাহ-বন্ধন। এই পর্য্যন্ত একটা রহস্য-রসই ঘনাইয়া উঠে, বরং ইহাই মনে হয় যে, মৃত্যুকে যতই ভয়ঙ্কর দুর্জ্জেয় মনে হউক না কেন, তাহা মানবাত্মার একটা গৌরবময় adventure বা নূতনতর ও মহত্তর অভিজ্ঞতা; তাহাকে দেখিয়া এত যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ঐ যাত্রাপথের সঙ্গ-কাল পর্য্যন্ত, পরে 'সিন্ধুপারে', অর্থাৎ জীবনের শেষে, সেই অপর রাজ্যে প্রবেশ করিলে, সেই ভয় সেই দুর্জ্জেয়তাই এক অপূর্ব্ব বিস্ময়রসে পরিণত হয়—তখন মৃত্যুও এক রহস্যসুন্দর অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ও অনুরাগ-মাধুরীতে হৃদয়কে জয় করিয়া লয়। কবিতাটিতে সেই ভয়ের ভীষণ রূপটিও যেমন, তেমনই লোকান্তরে তাহার সেই অপরিচয়ের গুণ্ঠন-মোচন ও সৌন্দর্য্যের এক নবরূপ-উদ্ঘাটন বর্ণিত হইয়াছে,—যে রহস্য চিরদুর্জ্জেয় তাহাই ঘনীভূত হইয়া—অসীম অতীতে প্রসারিত ও সর্ব্বকালের কবিকল্পনায় ভূষিত হইয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী বধূরূপে সেই লোকান্তরপ্রাপ্ত পুরুষকে বরণ করিল। মানবাত্মার সেই যে অভিজ্ঞতা, তাহা অপরোক্ষ না হইয়া পারে না। অতএব ইহার পরেই যবনিকা-পাত হইলে রসপ্রেরণা অক্ষুণ্ণ থাকিত। কিন্তু কবি শেষে সেই রহস্য বা রূপক-কল্পনাটির একটি ব্যাখ্যা যুক্ত করিয়াছেন, তিনি জীবন ও মৃত্যুকে একই দেবতার দুই রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা একটি তত্ত্বমাত্র, সেই তত্ত্ব কবির নিজেরই মানস-বাসী, তাহাকে কবিতার ঐ চিত্রপটে চাক্ষুষ করা যায় না; অর্থাৎ তাহা রসের মতই পাঠকচিত্তে সাক্ষাৎভাবে সংক্রামিত হয় না, বরং সেই রহস্য-রসাবেশ ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ তত্ত্বও বড়-জোর একটা মন্ত্রের মত,—একটা আন্তর উপলব্ধি, কবিতায় যে একটি রূপজগৎ সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা সেই মন্ত্রেরই রূপক-রূপ নহে; অর্থাৎ কবি ঐরূপ বলিয়া না দিলে, আমরা আপনা হইতে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতাম না, শেষ পর্য্যন্ত উহার ঐ রহস্যরসই আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। শেষের ঐ আবিষ্কার, একটা চমক সৃষ্টি করে বটে—যেমন কোন গল্পের শেষে যখন আমরা শুনি যে তাহা একটা স্বপ্নমাত্র। আসল কথা, কবিতাটির রূপক-অর্থ যেমনই হোক, উহাতে যে একটি অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই উহার গৌরব।

কবিতা-পাঠ

নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে, ইত্যাদি। 'নিদ্রা টুটিয়া' স্বপ্ন আরম্ভ হইল; স্বপ্নাবস্থাই জাগর-অবস্থা বলিয়া মনে হইল।

দেখিনু দুয়ারে রমণীমুরতি, ইত্যাদি। এই কয় পংক্তিতে যে একটি অতি-প্রাকৃত অত্যদ্ভুত রমণীমূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে—তাহাই মৃত্যুর শরীরী-রূপ (Personification)। তাহা 'অবগুণ্ঠনে ঢাকা' অর্থাৎ রহস্যময়; তাহার বাহন ঐ ধূম্রাবরণ কৃষ্ণ অশ্ব—শ্মশান-ধূমে গঠিত, অর্থাৎ লোকান্তর-প্রয়াণের রূপক। তারপর লোকান্তরে ঐ যে মৃত্যুর সমভিব্যাহারে যাত্রা ও যাত্রাপথের বর্ণনা, উহা জীবিতকালের ইন্দ্রিয়জগৎ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার কথা।

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল, ইত্যাদি। রাত্রিশেষের লগ্ন; কিন্তু উষা বা প্রভাতের সূচনা মাত্র; দিবালোকের দেখা নাই।

আঁধারব্যাদান গুহার মাঝারে, ইত্যাদি। লোকালয় হইতে দূরে যে অতি প্রাচীন জনহীন কারুকর্ম্মময় পর্ব্বতগুহা দেখিতে পাওয়া যায়—কবিকল্পনা সেই অতীতের বিরাট ও বিস্ময়কর অথচ জীবনহীন একটি যাদুঘরে মৃত্যুর বিলাসপুরী রচনা করিয়াছে। এখন হইতে শ্মশানধূম ও কৃষ্ণঅশ্বের পরিবর্ত্তে একটি অপরূপ ও অপরিচিত সৌন্দর্য্য মৃত্যুর প্রকৃত-রূপের সূচনা করিতেছে। 'ভিতরে খোদিত' ঐ প্রাসাদে ভাস্কর্য্য ও চিত্র-কলার যে প্রাচীন-ভঙ্গিমা লক্ষণীয় হইয়াছে—তাহাই এক অর্থে খাঁটি রোমান্টিক,—উহাই রোমান্স-রসের পরাকাষ্ঠা। এই প্রাসাদ-অভ্যন্তরের বর্ণনায় কবি ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের প্রাচ্য (Oriental) রূপরস-প্রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। 'কনকশিকলে সোনার প্রদীপ' 'ভিত্তির গায়ে পাষাণমূর্ত্তি', 'ধূপাধার' এ সকল তো আছেই; তাহার উপর "সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা"—আমাদের 'দুর্গা প্রতিমা' নয়—মিশরের 'Sphinx'-এর মূর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়।

তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি। সামান্যতম শব্দ চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়; উৎকৃষ্ট কবি-ভাষা।

দ্বিগুণ আভায়......মধুর উচ্চ হাসি। ঐ অদ্ভুত রোমাঞ্চকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঘোমটার ভিতরে রমণীর উচ্চহাস্য—সর্ব্বশরীর হিম করিয়া দিবার মতই বটে। Rider Haggard প্রণীত বিখ্যাত উপন্যাস 'She' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অমনি রমণী কনকদণ্ড···রাশি রাশি ধূপধূমে। কল্পনায় আরব্য-উপন্যাসের ছায়া আছে।

কিরাতনারীর দল। 'কাদম্বরী'র কবিত্ব-সৌরভ, বা অংশবিশেষের ভাব-মণ্ডল জাগিয়া উঠে।

বৃদ্ধ আসনে বসি···গৃহতলে খড়ি কষি। ঐ বৃদ্ধ বিপ্র কালের (Time) প্রতিরূপ; 'লগ্নকাল'-অর্থে জীবনের অবসান-কাল; এতক্ষণে মৃত্যুপথযাত্রীর পূর্ণমৃত্যু ঘটিবে।

কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, ইত্যাদি। সমস্ত ব্যাপারটা দুর্ব্বোধ্য রহস্যময়; মন্ত্রের যেমন অর্থ বুঝা যায় না, তাহার যাদুশক্তিই দৃষ্টিগোচর হয়, এখানেও তেমনই মন্ত্র না বুঝিলেও তাহার ক্রিয়া তখনই দেখা গেল।

শুধু এক সখা দেখাইল পথ, ইত্যাদি। বিবাহের পর বাসর-শয্যার নিভৃত কক্ষ। বিবাহের আনুষ্ঠানিক যত কিছু নিয়ম সকলই পালন করার অর্থ, মৃত্যুর সহিত ঐ মিলন অতিশয় বৈধ বা বিধিসঙ্গত, উহাই নিয়তি; উহার কোথাও পাত্র বা পাত্রীর এতটুকু স্বাধীনতা নাই—ঐ বিবাহ হিন্দু-বিবাহের মত দুশ্ছেদ্য।

নানা বরণের আলোক সেথায়, ইত্যাদি। ঐ বিবাহ-অনুষ্ঠানের পর ক্রমে সকলই পূর্ব্ব-সংস্কারের অনুযায়ী সহজ ও ভয়শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল—সেই কৃষ্ণ অশ্বারূঢ় সর্ব্বাভরণভূষিতা নববধূর রূপ ধারণ করিল, অর্থাৎ মৃত্যুও পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। এইবার

গুণ্ঠন খুলিলেই বধূর অপরূপ রূপ বরকে বিমোহিত করিবে—মৃত্যু একটা অভিশাপ না হইয়া জীবনেরই শুভ পরিণামস্বরূপে দেখা দিবে, তাহার সেই অসীম সৌন্দর্য্যই যে মোহের আবরণে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। কবিতাটির এইরূপ একটি ভাবসমাপ্তি হইতে পারিত, যেমন,—

Who could have thought such darkness lay concealed
Within thy beams, O Sun! Or who could find,
Whilst flower and leaf and insect stood revealed,
That to such countless orbs thou mad'st us blind!
Why do we then shun Death with anxious strife?
If Light can thus deceive, wherefore not Life?

[Blanco White

কিন্তু কবি মৃত্যুর গুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া যেরূপ দেখাইলেন, তাহাতে সকল রহস্য ও বিস্ময়-রস মৃত্যুতে তিরোহিত হইল—অপর এক বিস্ময় সেই পূর্ব্ব-বিস্ময়ের স্থান অধিকার করিল, কিন্তু এই নূতন আবিষ্কারটির সহিত মূল কবিতার ভাবসঙ্গতি নাই; [কবিতা-প্রসঙ্গ দেখ]।

"এখানেও তুমি, জীবনদেবতা!" এই কথায় আমাদেরও তেমনই চমক লাগে। কবিতাটিতে যে কল্পনার যে রসসৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনীন অর্থাৎ সকল হৃদয়সংবেদ্য, কিন্তু ঐ তত্ত্বটি কবির একান্ত ব্যক্তিগত, উহা কবির নিজ মানসের এমন একটি প্রত্যয় যাহা ঐরূপ একটি কাব্যকল্পনার দ্বারা ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করা যায় না। পরের পংক্তিগুলিতে তিনি সেই জীবন-দেবতার যে লীলা ও তাহার সহিত তাঁহার জীবনের যে অন্তরতর যোগের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই কবিতার ঐ প্রসঙ্গে যেন জোর করিয়া আনা হইয়াছে। কবিতাটির রস অন্যরূপ।

সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি ··সেই পরিচিত মুখে। এই 'জীবন-দেবতা'র নানা রূপ আমরা কবি-রবীন্দ্রের কবি-জীবনের আরম্ভ হইতেই দেখিয়াছি, এই 'চিত্রা' কাব্যে তাহাই কবিমানসে আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, ঐ 'জীবন-দেবতা' নামটিও কবি একটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। 'চিত্রা'র সেই কবিতাগুলির প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা আছে।

চৈতালী

উৎসর্গ

কবিতা-প্রসঙ্গ

এই কবিতাটিতে ভক্তের সর্ব্ব-সমর্পণের ভাবটি খাঁটি বৈষ্ণবীয় রসে উচ্ছল হইয়াছে। ফলভরে অবনত দ্রাক্ষাকুঞ্জ সম্ভবতঃ কবি কোনকালে দেখিয়াছিলেন—এখানে তাহার উপমা কবিতাটির উপযুক্ত রূপক-রূপ হইয়াছে। এই কবিতাটির সহিত 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতাটি তুলনীয়—দুইয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তাহাতেই পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। সেখানে কবির রস-চেতনা এমন পূর্ণ ও নিবিড় নয়। সেখানে তিনি সেই ফসলের ভার হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন—একটা উৎকণ্ঠা-নিবৃত্তির ভাব আছে। এখানে ঐ 'উৎসর্গ'-ক্রিয়াটিতে বৈষ্ণব-প্রেমরসে তাঁহার চিত্ত টলমল করিতেছে—পরম দয়িতের ভোগ্য করিতে পারিলেই তাঁহার ঐ ফলগুলি সার্থক হইবে। এখানে কোন উৎকণ্ঠা নাই, তার কারণ,—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিতে পরিণত হইয়াছে। 'সোনার তরী'তে দাস্যভাব, এখানে মধুর ভাব।

কবিতা-পাঠ

কবিতাটির পদবন্ধ (Stanza) একটি অভিনব ছন্দোবন্ধে বড়ই শ্রুতিহর হইয়াছে। ইহার ঐ পংক্তিগুলির মাত্রা সংক্ষেপ এবং মিল-বিন্যাসের একটি সুপরীক্ষিত কৌশল—এই দুয়ের যোগে কবিতাটির ছন্দসঙ্গীত যেন অলক্ষিতে আমাদের চিত্তহরণ করে। রবীন্দ্র-কাব্যে পদবন্ধ-রচনার ছাঁদ প্রায় একইরূপ—শেষের দিকে কিছু বৈচিত্র্য আছে বটে, তথাপি ঠিক এইরূপ মিল-বিন্যাস ও পংক্তিগুলির সমান মাত্রা-যতি এই একটিমাত্র কবিতায় আছে—তাই, এই কবিতার একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ স্বরূপতা আছে। উহার মিল-বিন্যাস লক্ষণীয়, তাহা এইরূপ —ক খ গ গ ঘ খ ঘ খ। প্রথম পংক্তিটি মিলহীন; খ-চিহ্নিত মিলটি প্রথমে একক, এবং পরে দূরবর্ত্তীভাবে বিশেষ করিয়া ঐ সর্ব্বশেষ পংক্তিতে, যে কৌশলে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই সমগ্র পদবন্ধটির 'Stanzaic music, এবং একটি প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে,—ইহাই মিল-বিন্যাসের সূক্ষ্ম কৌশল।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল। 'সোনার তরী'তে আছে—

> "রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হ'ল সারা।"

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল, ইত্যাদি। তুলনীয়—'সোনার তরী'—

> "...যারে খুশি তারে দাও
> শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে" ইত্যাদি।

—ইহাতে দীনতার দাস্যভাব আছে। এখানে সর্ব্বসমর্পণের আনন্দ-গর্ব্ব আছে।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত; ইত্যাদি। ইহা একটি পৃথক স্তবক এবং চিত্রহিসাবে উপভোগ্য; কবিতার অঙ্গ হইলেও কবি ইহাতে একটি সম্পূর্ণ চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন;

'চৈতালী'তে এমন কাব্যরস-সৃষ্টি আর কোথাও নাই! [পুরুষ বা নারীর ভোজন কর্মের এমন চারুতা বাংলা কাব্যে আব কোথাও বর্ণিত হয় নাই।] **'শুক্তিবক্ত'**—ইংরেজী Shell-pink, ঝিনুকের ভিতবটা যেমন আরক্তিম—তেমনই।

গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল। অর্থাৎ, ফলগুলি যে পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছে, বনের কাজ ফুরাইয়াছে, ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনিই তাহার প্রমাণ, অতএব, আব বিলম্ব কবিও না। কবির পক্ষে—তাঁহাব কবিতার একটি ফসল শেষ হইয়াছে, ঐ কবিতাব রস-পবিণতির সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, ঐ ফসলের শেষ ঐখানেই।

বৈরাগ্য

কবিতা-প্রসঙ্গ

'চৈতালী'ব এই ধবণেব কবিতাগুলিতে, কাব্যরস অপেক্ষা ভাবুকতাব একটি অভিনব ভঙ্গি ও চমক আছে। ভাব সেই একই—ভগবানেব জন্য সংসাব ত্যাগ করিবাব প্রয়োজন নাই—'যাব নাম ভালবাসা তাবি নাম পূজা'। ঐ মর্ত্যপ্রীতি ও মানব-জীবনেব গৌববেবোধই—মধ্যযুগীয় সন্ন্যাস-বৈবাগ্যেব আধুনিক প্রতিবাদ।

কবিতা-পাঠ

সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে, ইত্যাদি। সমগ্র চিত্রটি বুদ্ধেব গৃহত্যাগ স্মবণ করাইয়া দেয়।

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি, ইত্যাদি। এ দেবতা জগৎ ও জীবনেব উর্দ্ধে কোন সুদূর বৈকুণ্ঠলোকে বাস কবেন না, মানুষেব গৃহেই বাস কবিয়া তাহাব স্নেহপ্রেমের নিত্যসেবা গ্রহণ কবেন।

মধ্যাহ্ন

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবি তখন উত্তর বঙ্গেব একটি গহন পল্লীভূমে, একটি ক্ষুদ্র খালের মত নদীতে নির্জ্জনে নৌকা-বসবাস করিতেছিলেন। সেই স্থানেব যে পল্লীদৃশ্য এই কবিতায় চিত্রবৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে একরূপ ফোটোগ্রাফ বলা যাইতে পারে, কিন্তু ফোটোগ্রাফ হইলেও তাহা রঙীন, সেই রঙ্ কবিচক্ষু হইতে চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-কাব্যে প্রকৃতি-চিত্রের সূক্ষ্মতা ও অজস্রতা বাংলাভাষাব অতুলনীয় সম্পদ্ হইলেও, এই কবিতায় ঐ মধ্যাহ্ন-বর্ণনা এবং তৎসহ ঐ পল্লীদৃশ্য কবি-চিত্রশালার একটি অনর্ঘ চিত্র। শেষের কয়পংক্তিতে যে ভাবের প্রকাশ

আছে, তাহা ঐ চিত্র হইতে ভিন্ন, তাহাতে শুধুই সৌন্দর্য্য-বিভোরতা নয়, কবির একটি নিজস্ব অনুভূতি ও মানস-সংস্কার যুক্ত হইয়াছে।

কবিতা-পাঠ

কভু দূর শূন্য-'পরে চিলের সুতীব্র ধ্বনি। মধ্যাহ্ন-আকাশে ঐ চিলের ধ্বনি, সমগ্র বর্ণনাটিকে কিরূপ বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে! রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তাঁহার ছোটগল্পে—মধ্যাহ্নে ঐ চিলের ধ্বনির উল্লেখ করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নের অব্যক্ত করুণ এক তান। ইহাও একরূপ অনাহত ধ্বনি;—গভীর নিশীথ রাত্রে চরাচরব্যাপী নীরবতার ঐরূপ একটি ধ্বনি আছে, তাহা কানে নয়, যেন আর কোন ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়া অনুভব করা যায়। আমরা যে বলি—"দুপুর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে" তাহাতেও একটি ধ্বনির ইঙ্গিত আছে। ঐ 'করুণ তান'—আরেক কবিতায় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে—

"সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্ব-'পরে—
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
—অশ্বত্থছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে॥"

['বৈশাখ'—কল্পনা

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে, ইত্যাদি। 'মানসী'র 'অহল্যা', 'সোনার তরী'র 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি', এবং 'উৎসর্গে'র 'প্রবাসী'-কবিতা এই সঙ্গে পঠনীয়। 'পর্ব্ব শেষে' দেখ।

দুর্লভ জন্ম

কবিতা-প্রসঙ্গ

একটি যে বচন আছে 'নরত্বং দুর্লভং লোকে'—কবি সেই নরজন্মের দুর্লভতা আরেক দিক দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। মনুষ্য-জীবন—কোন পারলৌকিক কল্যাণ বা মুক্তি-সাধনার সাধনোপায় বলিয়াই দুর্লভ নয়; 'এ জীবন এত ক্ষণিক বা নশ্বর বলিয়াই বড় মূল্যবান, যত তুচ্ছই হোক্, তাহাকে যে একদিন হারাইব, আর পাইব না, এই চিন্তাই জীবনের সর্ব্ববস্তুকে দুর্লভতার মহিমা দান করে।' ইহাও মর্ত্ত্যপ্রীতির একটি কারণ।

কবিতা-পাঠ

যা পাইনি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও। একটু হেঁয়ালীর মত হইয়াছে; অর্থ বোধ হয় এই যে,—যাহা পাইয়াছি তাহা হারাইব বলিয়া যেমন দুর্লভ, তেমনি যাহা পাই

নাই—তাহারও মূল্য কম নহে ; কারণ, প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত দুই-ই তো এই ধরণীর বস্তু ; ঐ না-পাওয়ার বেদনাও যে মধুর ! 'তাও থাক্' অর্থে, 'আমার অন্তরে তাহা প্রাপ্তির মধ্যেই থাক্।'

তুচ্ছ বলে যা' চাইনি, ইত্যাদি। ইহাই সত্যকার মর্ত্ত্যপ্রীতি। যাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করি, তাহাও যদি এমন দুর্লভ হয়—অর্থাৎ একদিন তাহাও চাহিলে আর পাইব না, তবে তাহাকে অনাদর করিব কেমন করিয়া ? এখানে তুচ্ছের মূল্য ঐরূপ দুর্লভতার জন্যই ; তুচ্ছের আরেক মূল্যও আছে, যথা—

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

—Wordsworth.

—কিন্তু দুই-এরই কারণ এক, ঐ সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা।

খেয়া

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতাটি আজিকার দিনে আদৌ রুচিসম্মত হইবে না। কবি ইহাতে যে অখ্যাত, অচল এবং অশিক্ষিত শান্তিময় জীবনের জয়গান করিয়াছেন, তাহার মূলে আছে জীবনের সুমহান্ যজ্ঞক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া, কর্ম্মের পরিবর্ত্তে একরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যের, প্রগতির পরিবর্ত্তে অগতির শান্তিসুখ-কামনা। ইহাকেই আধুনিকের অভিধানে 'Escapism' বলে। কবি ঐ যে খেয়া পারের দৃশ্যটি হইতে দুই গ্রামের পরম শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার কল্পনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার প্রেরণা অন্যরূপ ; আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনের যাহা ইষ্ট—সেই civilization-কে স্মরণ করিয়াই, কবি তাহার তুলনায় ঐ প্রকৃতিতান্ত্রিক অর্থাৎ স্বভাব-অনুগামী জীবনই বরণীয় করিয়াছেন। ইংরাজ-কবি Wordsworth এই জীবনকে শ্রেয়ঃ, শুচি ও সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া 'চৈতালী'তে কবির একটি বিশেষ ভাবাবস্থার (mood) পরিচয় আছে, তাহারই অনুসরণে এই কবিতাগুলি পাঠ করিতে হইবে। ইহাও সর্ব্বদা স্মরণীয় যে, কবির নিকটে আমরা কোন তত্ত্বের বিচার বা প্রচার আশা করিব না, বরং তাহার বিপরীত যাহা, সেই অনুভূতিলব্ধ ভাবরাজিই কবিদের বিশিষ্ট দান। এইজন্য তত্ত্বকথা বা তত্ত্বপ্রচার সকল কাব্যেরই গৌরবহানি করে।

কবিতা-পাঠ

পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি। আজ তাহা আরও সত্য, আরও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে।

উঠে কত হলাহল সুধা। ভাবার্থ এই যে,—তাহাতে দুঃখ এবং সুখ দুইয়ের মাত্রা সমান তীব্র। সেই দু'য়ের কোনটাই চাই না।

এই খেয়া চিরদিন, ইত্যাদি। বাক্যটির অন্তরালে একটি গভীরতর ব্যঞ্জনা আছে 'কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে'—ঐ দৈনন্দিন জীবনে সমগ্র জীবনের ধারাটিও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—সেই জন্ম ও মৃত্যুর ধারা।

ঋতুসংহার

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতাটিতে কবির একটি সহজ ও অনায়াস কাব্যরসগ্রাহিতার পরিচয় আছে; কালিদাসের 'ঋতুসংহার' (ষড়ঋতুর বর্ণনামূলক বিখ্যাত কাব্য) পাঠ করিয়া আমাদের কবি কালিদাসের সেই আদর্শ কবি-জীবন—যাহাতে কোন ভাবনা বা সংসার চিন্তা নাই—সেই প্রেম ও সৌন্দর্য্যের স্বপ্নময় কবি-জীবন কল্পনা করিয়া নিজেও রসাবিষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য ঐ কাব্যে কবি-কালিদাসের বাস্তব জীবনের কোন সংবাদ আছে, কবি সে কথা বলিতেছেন না,—সেই বাস্তবের উপরেও কবিরা যে একটি কাব্যজগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন, সেই জগৎ ও জীবনের কথাই বলিতেছেন। কালিদাস যে নারীর প্রেম, এবং প্রকৃতির মনোহর রূপ—বিশেষ করিয়া দুই-এর কবি, 'ঋতুসংহার'-কাব্যে—কবির সেই কবি-যৌবনের সমস্ত আবেগ ও রসোচ্ছলতা উপছিয়া উঠিয়াছে। এই সনেটটিতে আমাদের কবিও কাব্যের অন্তর্গত সেই কবি-পরিচয়টিকে রসসিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া কাব্যের মধ্যে কবিকে আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন প্রাচীন কবি-রসিকদের ছিল না। এ কবিতার সহিত মানসীর 'মেঘদূত' কবিতা তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—ইহাতে কোন গুরুতর কাব্যপ্রয়াস নাই, এ যেন কবির সহিত কবির সাক্ষাৎ ভাব-বিনিময়।

কবিতা-পাঠ

যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন-'পরে। রবীন্দ্রনাথের মতে ঐ কাব্য কালিদাসের যৌবনকালের রচনা। ইহার আরও অর্থ আছে—পরবর্তী সনেট (মেঘদূত) পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মরকত পাদপীঠ···স্বর্ণরাজছত্র। 'মরকত'—কারণ, সবুজ তরু-লতা ও তৃণময়; 'স্বর্ণ'—'সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ-প্লাবিত'। পৃথিবী—পাদপীঠ, এবং আকাশ—ছত্র; এমন রাজাসন যাহার, সেই কবিই বলিতে পারে—

> "আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
> হোক্ গে এ বসুমতী
> যার খুশি তার।"

ছয় সেবাদাসী···তৃষিত যৌবনে। একথা কবি-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য, কেবল ঐ শেষের পংক্তিগুলিতে রসসম্ভোগের যে সংসার-বিস্মৃতি আছে, কবি তাহার

পক্ষপাতী নহেন; ঐরূপ সৌন্দর্য্য ও প্রেমসুখসম্ভোগ যে মানবাত্মার পক্ষে ক্ষতিকর, কবি তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা'-কাব্যে, এবং 'সোনার তরী'র 'ঝুলন', 'দেউল' প্রভৃতি কবিতায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সনেটেও, ঐরূপ প্রমত্ততার শাস্তি যে অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। এই কঠিন নীতিজ্ঞান বা আত্ম-শাসনের শুচিতা-সম্মান-বোধ রবীন্দ্রনাথের রস-সাধনাকে সর্ব্বদা সংযত রাখিয়াছে—পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। যৌবনের ঐ ক্ষুধা এবং সেই প্রেমের প্রমত্ততাকেই পরম গৌরব দান করিয়া কবি সুইনবার্ণ (Swinburne) যাহা গাহিয়াছেন আমি অন্যত্র তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি ['রাত্রে ও প্রভাতে'—চিত্রা কবিতা-পাঠ দ্রষ্টব্য]। ইহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কবির উত্তর-জীবনে—একপ্রকার সূক্ষ্ম ভোগবাদ বা আনন্দবাদ—আত্মার স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অন্তরায় বলিয়া সকল নীতি-নিয়মের শাসন—সর্ব্বপ্রকার তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনাকে তিরস্কৃত করিয়াছে।

মেঘদূত

কবিতা-প্রসঙ্গ

পূর্ব্বের সনেট ও এই সনেটটি একই ভাবসূত্রে যুক্ত বলিয়া—দুইটি মিলিয়া একটি "Sonnet Sequence" হইয়াছে। কবি ঐ দুইখানি কাব্যে একই কাহিনীর আরম্ভ ও পরিণাম দর্শন করিয়াছেন—'ঋতুসংহারে' যৌবনের ভ্রূক্ষেপহীন ভোগোন্মাদ, এবং 'মেঘদূতে' তাহার সেই আতিশয্যের প্রতিক্রিয়া; সেই প্রেমান্ধ-মিলনসুখ-ভোগের শাস্তি হইল যক্ষরূপী কবির রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসন। তাহাতেই 'খর রৌদ্র-করে মায়াকুহেলিকা'র অন্তে, 'আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন' দেখা দিল—বিশ্বসভামাঝে কবি কালিদাসের বিরহ-বীণা বাজিতে লাগিল। আমাদের কবিও তাহাতে পুলকিত হইলেন, কারণ মিলনটা তাঁহার নিজের কবিধর্ম্মে কখনই উপাদেয় নহে—তাহা প্রেমকে, তথা নব-নারীর স্বাতন্ত্র্য-মহিমাকে খর্ব্ব করে; বিরহ-ই স্বাধীন আত্মার অমৃত-রস।

কবিতা-পাঠ

ঊর্দ্ধ হ'তে··দেবতার শাপ। কালিদাসের যক্ষ ছিল "স্বাধিকার-প্রমত্তঃ" অর্থাৎ সে ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়াছিল, তাই 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' অর্থাৎ নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পূর্ব্ব-গৌরব হারাইয়াছিল। কবি এখানে একটি ভিন্ন অর্থ করিয়া, 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূতে'র মধ্যে একটা সাক্ষাৎ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছেন।

মিলনের মরীচিকা···মত্ত অহমিকা। মিলনের সুখ একটা মরীচিকা—প্রেমের একটা ব্যামোহ। যৌবনের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাই উহার কারণ,—প্রেয়সীকেও যেমন, তেমনি তৎসহ সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সর্ব্বসুখের নিঃশেষে 'ভোগ-দখল' করিতে চায়। এখানে ঐ পংক্তি

—'যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা'—একটি উৎকৃষ্ট কবি-বচনের মত হইয়াছে, কারণ, পৃথক ও ব্যাপক অর্থে উহা বড় গভীর এবং সত্য।

এই দুই কবিতার কবি-ভাষা ও রস-প্রেরণা 'চৈতালী'র অপর কবিতা হইতে ভিন্ন, আরও দুই চারিটা এমন কবিতা এ কাব্যে আছে। এখানে 'চৈতালী'র মূল সুর—মুক্ত প্রকৃতির সহিত সহজ সরল হৃদয়ে যে সাক্ষাৎ পরিচয়ের আনন্দ তাহার পরিবর্ত্তে রঙীন কাব্য-রস ও সামাজিক জীবনের জটিলতর ভাবনা-কামনা অনুরূপ ছন্দে ও ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।

দেখা দিল চারিদিকে, ইত্যাদি। 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা দ্রষ্টব্য।

দিদি

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতাটিতে যেন একটি আদিম (Primitive) অথচ নিত্যকার স্নেহতত্ত্ব কেমন সারল্যে ও বাস্তবতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটির যে মাতৃত্ব কবি এমন নিঃসংশয়-রূপে প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছেন, তাহা নিত্যই আমাদের জীবনের; খাঁটি বাঙালী-জীবনে—পল্লী-গৃহস্থের জীবনযাত্রার একটি নিত্য দৃশ্য; কিন্তু সেই নিত্য ও অতি-বাস্তবকে ঐ যে দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি, তাহা বাংলার আর কোন কবিতে এতখানি প্রস্ফুরিত হয় নাই; বস্তুতঃ রবীন্দ্র-কাব্যের বহু কবিত্ব-লক্ষণের মধ্যে ঐ যে তুচ্ছ ও সামান্যের মধ্যে এমন ভাব-গভীর মাধুর্য্যের অনুভূতি, উহাই একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' নামক ছোট-গল্পগুলিতে এই শক্তির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়।

কবিতা-পাঠ

দিদির আদেশে স্থিরধৈর্য্যভরে। ভাইটির ঐ আচরণ সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর; উহাতে দিদির শাসন-মহিমাও যেমন আছে, তেমনি স্নেহের বশ্যতাও কম প্রেক্ষণীয় নয়।

ধরি শিশুকর। পর পর তিনটি চিত্র বা দৃশ্য-বিকাশ আছে। প্রথম, কর্ম্মভারে অবনত ছোট মেয়েটি; দ্বিতীয়, ঐ স্থিরধৈর্য্যভরে উপবিষ্ট বালক; তৃতীয়, 'ধরি শিশুকর' ছোট দিদির ঐরূপ গৃহগমন-দৃশ্য। এই শেষ দৃশ্যটিতে সমগ্র চিত্র যেন একটি শেষ-তুলিকাপাতে চরম রস-রূপ লাভ করিয়াছে; বস্তুতঃ, কত সামান্য ও সুলভ উপকরণে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা নির্ম্মিত হইয়াছে! এই দিক দিয়া উহার ঐ সনেট-আয়তন ভাবের যথার্থ রূপ-সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।

পরিচয়

কবিতা-প্রসঙ্গ

'চৈতালী'তে কবির যে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে (চৈ, পাঠান্তে দেখ),— জড ও জীব, মানুষ ও পশুর মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তার সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি, তাহাই এই কবিতায় এবং আর কয়েকটিতে ('খেয়া', 'সামান্য লোক', 'হৃদয় ধর্ম্ম', 'তুই বন্ধু', 'সঙ্গী') ফুটিয়া উঠিয়াছে; 'পরিচয়' তাহারই একটি উৎকৃষ্ট চিত্র। এই রূপ-কল্পনায় একটি নিগূঢ় ভারতীয় সংস্কারের প্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়; বোধ হয়, আর কোন দেশের কবি ঐ দৃশ্যটির মধ্যে এমন অপূর্ব্ব রস সঞ্চার করিতে পারিতেন না।

কবিতা-পাঠ

সহসা সে কাছে আসি ইত্যাদি। অপর একটি কবিতায় ইহারই আরেক চিত্র আছে—

> মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্ব্বাক হৃদয়
> তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়…
> মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে,—
> মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।

['তুই বন্ধু'

[কিন্তু 'চৈতালী'-কাব্যের ঐ 'ছোট মেয়েটি'র একটি পৃথক্ অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব আছে; কবি তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কবিতায় একটি ক্ষুদ্র কাহিনীর সূত্রও ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা একটি বিশেষ চরিত্র, এবং উহার জীবনেও সেই সামান্যতা, সেই নিত্য দিনের অতি পরিচিত, অভ্যস্ত, বৈচিত্র্যহীন ঘটনাগুলিরও এমন একটি কাহিনী-রস আছে, যাহার মাহাত্ম্য বা কল্পনা-গৌরব কোন বৃহত্তর কাব্য হইতে ন্যূন নহে।

> ……Some more humble lay,
> Familiar matters of to-day?
> Some natural sorrow, loss, or pain,
> That has been and may be again.

[*The Reaper*: Wordsworth

কবি এইরূপ চরিত্র ও চিত্র বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া পরে, তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে তাহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ঐ একটি মেয়ে কবি ও কবিকল্পনাকে যে একটু গভীরভাবে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহার প্রমাণ চৈতালীর এই সনেটটি—

> বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন
> ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন,
> গম্ভীর কর্ত্তব্যরত,—তৎপর-চরণে
> আসে যায় নিত্যকাজে, অশ্রুভরা মনে
> ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।

আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে ;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম্ম অবসানে
আপন স্বদেশে ; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানিনে ওরে ; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি'।
কোন অজানিত গ্রামে কোন দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায় !

['অনন্ত পথে'

অতি অল্পকালের জন্য হইলেও, একদা ঐ যে একটু "touch of Nature" কবিচিত্তে লাগিয়াছিল, তাহার ফল, কবিতা অপেক্ষা 'গল্পগুচ্ছে' প্রচুরতর পরিমাণে ফলিয়াছে ; রবীন্দ্র-কাব্যের মূল ধারা হইতে ঐ ভিন্নতর শাখাটির উৎক্রমণ বুঝিবার জন্য আমি আমার অধিকারের একটু বাহিরে পদক্ষেপ করিলাম।]

ক্ষণ-মিলন

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতাটিতে একটি দার্শনিক ভাবানুভূতি আছে। ক্ষণিকের মধ্যে অনন্তের, ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাটের, ব্যক্তির জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডিতে অসীমের অনুভূতি জাগে ; মানুষের সঙ্গে মানুষের যে পরিচয় বা মিলন তাহার ক্ষণিকতাও যেমন অসম্পূর্ণতাও তেমনই লজ্জাকর। এই তত্ত্বটি ইতিপূর্ব্বে কবির বহু কবিতায় উঁকি দিয়াছে—'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' 'সোনার তরী'র 'দুর্ব্বোধ', 'চিত্রা'র 'মৃত্যুর পরে' প্রভৃতি কবিতায় এই ভাববীজ কাব্যরসে মণ্ডিত হইয়াছে। এখানে তাহাতে একটি নূতন ভাবের রং লাগিয়াছে ; সেই 'ক্ষণিকমিলনে'ও অনন্তের সহিত মিলন ঘটে—কবি তাহা বিস্ময়ের সহিত স্বীকার করিতেছেন। 'চৈতালী'তে, আত্মভাবের বন্ধন হইতে কবিমানসের যে একটি মুক্তির আভাস আছে, এ কবিতাও তাহার অন্যতম নিদর্শন। কোন মানুষই, সেই আত্মার বা ব্যক্তি-স্বরূপের দিক দিয়া অপর কাহাকেও চিনে না, জানে না, ইহা সত্য, এই জীবনে যে মিলন ঘটে তাহাও ক্ষণস্থায়ী ; তথাপি, প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তাহা হইলে সেইরূপ জ্ঞানের জানা, বা আত্মার সহিত আত্মার পরিচয়-সাধনের প্রশ্নই উঠে না, সেই প্রেম জ্ঞানের চেয়ে বড় ; যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহিত মিলনে সেই ক্ষুদ্র ও অসমাপ্ত পরিচয়ই অনন্তের অনুভূতিতে পর্য্যবসিত হয় ; সেই মিলন দেশকাল ও পাত্রের সীমায় ক্ষণিক বা খণ্ডিত হইলেও, তাহা কালাতীত ও দেশাতীত একটি পরম অবস্থায় অনন্ত হইয়া

উঠে। আমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় ঐ ক্ষুদ্র ও ক্ষণিককেই—সীমাবদ্ধ রূপকে, জ্ঞান বিচারের বিরোধী সাকারকে সম্বোধন করিয়া বলে—

এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর!

শুধুই 'সুন্দর' নয়—'অন্তরতম চিরপরিচিতসম' বলিয়া আশ্বস্ত হয়। 'জ্ঞান' যাহাকে 'জানি না' বলে, বা কতটুকু জানি বলিয়া—একদিকে অভিমান, অপরদিকে হতাশা জ্ঞাপন করে—'প্রেম' তাহাকে সেইরূপ 'জানা'র অধিক করিয়া জানে, এবং সকল মিলনকে 'ক্ষণ মিলন' বলিয়া বাহির হইতে ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করে না।

সঙ্গী

কবিতা-প্রসঙ্গ

পূর্ব্বের 'পরিচয়' কবিতা দেখ। কবি সেই একই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানেও পাইতেছেন। সেই—

কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পদচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
যেন দুই ছদ্ম বেশে দু'বন্ধুর মেলা—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা।

['দুই বন্ধু'

কিন্তু তত্ত্ব যেমনই হোক, তাহার ঐ রূপময় জীবন্ত প্রকাশই—ঐরূপ দৃশ্য ও তাহার রস—এমন কবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

করুণা

কবিতা-প্রসঙ্গ

শহরের একটি ঘটনা। পরের ছেলে—তবু সে তখনো বালক বলিয়া—সকল মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহভাগী। এইজন্য ঐ নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া নিকটের এক বারান্দায় দণ্ডায়মানা পতিতা নারী কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। কবিতাটির ভাবার্থ এই যে, ঐ 'বারাঙ্গনা'ও নারী, বিশেষ করিয়া সে নিঃসন্তানা বলিয়া, তাহার অন্তরের রুদ্ধ বাৎসল্য-পিপাসা ঐ ঘটনায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে। কবি এখানে নারীমাত্রেরই অন্তরবাসিনী সেই নারী মূর্ত্তিকে সর্ব্ব পাপ-পুণ্য, শুচি-

অশুচি সংস্কারের উর্দ্ধে স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিয়াছেন। পরে আরেকটি কবিতায় কবি নারীর সেই অন্তর্নিহিত নারীত্বের মহিমাকে আরেক প্রকার ঘটনা সংযোগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেখানে সেই নারীর মুখেই এইরূপ কথা উচ্চারিত হইয়াছে—

নাহিক করম, লজ্জা সরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা' ব'লে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা !

['পতিতা'—কাহিনী

কিন্তু এ কবিতার ঐ নাম যথার্থ হয় না—ইহা 'করুণা' নয়, নারীহৃদয়ের একটি বিশেষ বেদনা, 'করুণা'—মনুষ্য সাধারণের হৃদয়ধর্ম্ম।

স্নেহগ্রাস

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতাটিতে কবি একটি বিশেষ প্রসঙ্গে রূপকের ছলে ঐ যে 'স্নেহগ্রাস', তথা মাতৃভূমির জবানীতে মায়ের সহিত সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই কারণে অনুধাবনযোগ্য যে, ইহাতেও কবি-রবীন্দ্রের সেই কবি-ধর্ম্ম ও কবি-মানসের একটি সুদৃঢ় সংস্কার উঁকি দিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, কবি কিছুতেই তাঁহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করিবেন না; পূর্ব্বে প্রেমের কবিতাগুলিতেও সেই ঘনিষ্ঠ মিলনের বন্ধন-ভীরুতা, প্রেমের যুগল-জীবনের মধ্যেও একটা অন্যোন্য-স্বাধীন আত্মভাব-সাধনার দাবী আমরা দেখিয়াছি; ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য, সেই সর্ব্ব-সঙ্গ মুক্তির অধিকার আর সকলের উপরে। এখানেও, প্রসঙ্গটা যেমনই হৌক,—তাহাকে ভাবাবেগে মণ্ডিত করিতে গিয়া ঐ যে মাতৃ-স্নেহ ও সন্তানের অধিকার সম্বন্ধীয় চিন্তাগুলি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ঐ অবকাশে কবি তাঁহার মনের একটি গূঢ় ও দৃঢ় ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা এই যে,—মানুষের আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে কোন স্নেহ—এমন কি মাতৃ-স্নেহও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। মা যদি কোথাও তাঁহার স্নেহের দাবীতে সন্তানকে এতটুকু বাঁধিতে চান—সন্তানের সেই ব্যক্তি-অধিকার এতটুকু ত্যাগ করিতে বলেন তবে তাহার উত্তরে সে বলিবে—

সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?...
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

সত্য বটে, যে প্রসঙ্গে কবি ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহার সেই বিশেষ ভাব-সূত্রে ঐরূপ উক্তির একটা যুক্তিযুক্ততা আছে; কিন্তু কবির কণ্ঠে একটা উগ্রতর আত্ম-অধিকার-ঘোষণাও এই বিশেষ প্রসঙ্গে শোনা যাইতেছে।

"নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার"—মাকে সম্বোধন করিয়া এমন কথা বোধ হয়

শঙ্করাচার্য্যও বলিতে পারেন নাই—বা পারিতেন না। আসল কথা এই যে এপুরুষ কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ-বন্ধন স্বীকার করে না—সে একান্তভাবে নিজের—অর্থাৎ, বিশ্বের বা বিশ্বদেবতাব। নব-নারীর প্রেমকেও এই কবি যেমন আত্ম-রতির মানস-সম্ভোগে রূপান্তরিত করিয়াছেন, তেমনই, যে জননী মানবের জীবনারম্ভের প্রথম বন্ধু—তাঁহাকেও ঐরূপ রূঢ় কথা বলিতে তাঁহাব বাধে না; যে মাতৃস্নেহকে—'বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসাবে'—বলিয়া আমাদেব যে কবি আত্মভাবমুক্ত নাটকীয় কাব্যকল্পনায় রস-সঙ্গতি দান করিয়া মহামহিমায় গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সেই কবিই আবার আত্মস্বরূপে অবস্থানকালে তাহাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এ কবিতায় যে কথাটি যে প্রসঙ্গে বলিতে চাহিয়াছেন—সেই দেশ ও জাতিব দুর্ব্বলতা ও মূর্খতাব কথাও—কবিব ঐরূপ আত্মভাবপ্রচাবেব উগ্রতায়—বসাভাস-দুষ্ট ও সুযুক্তিহীন হইয়াছে।

কবিতা-পাঠ

জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে। তুলনীয়—

"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ

'লালনেব রস' অর্থে ঐ স্নেহও জননীব নিজেবই একটি ভোগ্যবস্তু। কথাটাব মধ্যে যে একটি সত্য আছে, কবি এখানে তাহার কু-অর্থ কবিয়াছেন—

মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা, ইত্যাদি। এ কবিতায় কবিব মূল ভাব-প্রেবণা ঐ 'মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা' ঐ মনুষ্যত্ব কি বস্তু, এবং তাহার স্বাধীনতাই বা কেমন, পববর্ত্তী কবিতায় (বঙ্গমাতা) কবি তাহা বিশদ কবিয়া বলিয়াছেন।

দীর্ঘ গর্ভবাস হতে, ইত্যাদি। পবেব কবিতাটিতে আব এক ভঙ্গিতে এই কথাবই পুনবাবৃত্তি আছে, যথা—

" তব গৃহক্রোড়ে
চিবশিশু কবে আর বাখিও না ধবে।"

সেকি শুধু অংশ তব নহে আর কিছু? অর্থাৎ, সে কি তোমারই একটা অঙ্গের মত, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই? কথাটাব মধ্যে সত্যাভাস আছে, সত্য নাই। জীবনে শত বন্ধন, এবং বহুতর ঋণ আছে, মায়ের নিকটেও মাতৃঋণ আছে—সেই অর্থে, সন্তান একেবারে মাতৃদায়মুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু পুরুষ তৎসত্ত্বেও স্বাধীন, ঐ মাতৃঋণ বা মায়ের সহিত একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকার করিলে সেই স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা হয় না, বরং শক্তিমান, বীর্য্যবান এবং মহদাশয় পুরুষ সেই ঋণ-মোচনের চেষ্টায় নিজ আত্মার মহত্ত্বই প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐরূপ মহত্ত্ব হইতে পৃথক যে 'স্বাধীনতা'—তাহাই ক্ষুদ্রতা, অর্থাৎ আত্মত্যাগের অক্ষমতা।

নিজের সে, বিশ্বের সে, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা বিশ্বপ্রেমেব বাণী কবি পরে আরও স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, যথা—

" ..মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডিগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারিনে। স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি করে' নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না।"...

[পত্রধারা

বস্তুতঃ এই যে ব্যক্তিধর্ম্ম, ইহাই রবীন্দ্র-কবিমানসকে তথা কাব্য-কল্পনাকে চিরদিন প্রভাবিত করিয়াছে; কবিতার মধ্যেও এই যে চিন্তা বা বিচার-বুদ্ধি, ইহা Subjectivity নয়—সত্যকার স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা। এখানে এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কবি রবীন্দ্র তাঁহার কাব্যে কবি-কল্পনা ও কাব্য-প্রেরণার বশে বঙ্গভূমি ও বাঙালী জীবনের যতই কেননা সৌন্দর্য্য-উদ্ঘাটন করুন, তাহা আর্টিষ্টের রসসাধনার সামগ্রীরূপে; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশকে কখনও সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, যাহাকে সত্যকার প্রেমিকের দৃষ্টি বলে—তিনি প্রকৃতি ও মর্ত্ত্য-জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারিয়াছেন, যথা—

ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো—

—নিজের দেশ বা জাতি সম্বন্ধে তাহা বলিতে পারেন নাই—এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বা বিবেকানন্দের তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণে, তাঁহার বহু কবিতায় ঐ রসের রূপসৃষ্টি উপভোগ্য হইলেও, তাঁহাকে স্বাজাত্যবাদ বা Nationalism-এর কবি বলা ভুল হইবে; প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তিনি জার্ম্মান মহাকবি গেটের মত একটা অতি সূক্ষ্ম, বর্ণহীন, শুভ্র মানস-উৎকর্ষের (Culture) কবি, এবং সকল হৃদয়-বৃত্তিকে স্থূল, এবং আত্মার নিগূঢ় পিপাসাকেও কুসংস্কার বলিয়া আধুনিক সভ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে যে মানস-ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছে—রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত সেই আধুনিকতার একজন বড় ঋষি।

বঙ্গমাতা

কবিতা-প্রসঙ্গ

পূর্ব্ব কবিতার জের। সেখানে 'বঙ্গমাতা'র কথা ভাবিতে গিয়া কবি গর্ভধারিণী জননীর কথাই ভাবিয়াছেন—এখানে জননীর সহিত উপমিত করিয়া স্বদেশ বঙ্গভূমিকে সম্বোধন করিয়াছেন। এ ভূমির আর্দ্রতা বড়ই দুর্ব্বলতাজনক, তাহাতে বাঙালী জাতির যে 'মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা' নষ্ট হইয়াছে, কবি তাহার জন্য নিরতিশয় ক্ষোভ এবং উচ্চাভিমানসুলভ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ মাটি ও জলবায়ু যে দেশের তাহাকে অনুযোগ করার ছলে কবি পরোক্ষে বাঙালী জাতির চরিত্র-সমালোচনা করিয়াছেন।

এ কবিতার ভাবনামূলে যে উচ্চ আদর্শের অভিমান আছে, তাহার নাম—'মানুষ'। বাঙালী 'মানুষ' হইতে পারে নাই—সেই 'মানুষ' হওয়া কেমন, তাহাও অতি সংক্ষেপে এই কবিতায় বিবৃত হইয়াছে। সেই বিবৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এখানেও কবি, সেই বিশ্ব ও বিশ্ব-দেবতার স্বপ্নই দেখিয়াছেন—দেশ বা জাতি হিসাবে কোন বিশেষ ধর্ম্ম, স্বভাব বা সংস্কৃতির মূল্য তিনি স্বীকার করেন না। তাই সর্ব্বশেষে এমন একটি চমকপ্রদ কথা, ততোধিক চমকপ্রদ ভঙ্গিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।"

কবিতা-পাঠ

দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান। সহজ অর্থ এই—বাঙালী যে বাংলাদেশেই বাস করিবে, এমন কোন কথা নাই ; তাহা হইলে সে 'মানুষ' হইতে পারিবে না, কারণ, 'মানুষ' অর্থে 'নিখিল মানব', বা 'বিশ্বমানব' [পূর্ব্ব কবিতায় আছে, "নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব-দেবতার"।] সেই বিশ্বের যেখানে তাহার ডাক পড়িবে সেইখানেই সে একটা মহত্তর কর্ত্তব্য-ভার বহন করিবে।

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে, ইত্যাদি। কবি এখানে বাঙালী-চরিত্রের নিরীহতা, এবং দুর্ব্বল বলিয়া যে শিষ্টতা তাহার প্রশংসা না করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। একটা প্রবাদ আছে যে, বাঙালীর মত এমন ঘরমুখো জাত আর নাই, তাহার—"ঘর হ'তে আঙিনা বিদেশ" ; শান্তিপ্রিয় বলিয়া ইহারা অলস, এবং দেশ ও ভিটা ছাড়িতে চায় না বলিয়া কূপমণ্ডূক হইয়া আছে। পূর্ব্বকালের কথা জানা নাই, কিন্তু কবির নিজের কালের সত্য ইহা নহে ; ঐ সময় হইতে বাঙালী যেরূপ দেশ ছাড়িয়া পৃথিবীর দূরদূরান্তরে গিয়াছে—এমন কি তথায় বাস করিয়াছে, ভারতের আর কোন জাতি (বাণিজ্য-ব্যপদেশে ছাড়া)—তেমন করে নাই। মনে হয়, কবি তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি পাশ্চাত্য জাতিসকলের সেই রাজসিক জীবনাবেগ, অশান্তি ও অস্থিরতা—পৃথিবীর দূর-দুর্গম দেশে বসতি-স্থাপন ও রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি দেখিয়া স্বজাতিকে শক্তিহীন ও ক্ষুদ্রাশয় বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। তিনি এই সহস্র বৎসরের সুপ্রতিষ্ঠিত শান্তিপ্রিয় ও স্বল্পে সন্তুষ্ট সমাজকে "গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া" হইয়া সেই 'বিশ্ববাসীত্বে'র গৌরব লাভে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কবির এই বাসনা, ঐ কাল হইতে পূর্ণ হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। বাঙালী প্রথমে বাংলাদেশ হইতে ভারতে তাহার চিত্ত প্রসারিত করিয়াছিল, এবং পুরাতন জন্ম-জলাশয় ত্যাগ করিয়া শহর নামক ক্ষুদ্র বিশ্বের আবহাওয়ায় পুষ্ট হইয়া, মুক্ত জীবনযাপনের উদ্দাম চেষ্টা করিয়াছিল, তারপর জল হইতে ডাঙায় উঠিয়া বাঙালী সেই 'শীর্ণ শান্ত সাধু' জীবনের অপবাদ মোচন করিবার জন্য ঐ পাশ্চাত্য রাজসিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'মানুষ' উপাধিলাভের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার ফলে, সে আজ সত্যই 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' হইয়াছে—কবির ঐ কামনা এক অর্থে পূর্ণ হইয়াছে। আজ তাহাকে 'বিশ্ববাসী' হইতেই হইবে—'বঙ্গমাতা'র নামও ভুলিতে হইবে।

ইহাও সত্য যে, বিশ্বের ধ্যান করিলে—একালে ঐ পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্ম ও আদর্শকে অন্তরে বরণ করিতেই হইবে—'বিশ্ব' তাহাই, যাহা আমার দেশ ও জাতির গণ্ডিকে ছাড়াইয়া যায় ; কেবল ঐটুকু হইলেই বিশ্বপ্রেমের পিপাসা নিবৃত্ত হয়। তার উপর, আধুনিক য়ুরোপ ও আমেরিকা সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ বিশ্ব-ক্ষুধার পরিচয় দিতেছে, তাহার নিকটে বাঙালীর ঐরূপ জীবন কত হেয়, কত তুচ্ছ,—কবি অবশ্য ঐ বাস্তবের দিকটা দেখেন নাই—তাহা হইতে একটা অতি উচ্চ আদর্শ ও বিশুদ্ধ ভাব-সত্যের উদ্ভাবনাই করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শ যতই উচ্চ হউক, ভাব যতই সত্য হউক—ব্যক্তি বা জাতির জীবনে, সেই জন্যই তাহা কল্যাণকর হয় না। প্রাণ-ধর্ম্মই সকলের উপরে, সেই প্রাণধর্ম্মের সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রেরণায় প্রত্যেক জাতি সত্যকে আপন

জীবনে আপনার মত করিয়া উপলব্ধি করে। সেই প্রাণধর্ম্ম ক্ষীণ হইলেই সর্ব্ববিধ দুর্গতি দেখা দেয় ; তাহারও মূলে আছে—সেই আত্মিক বল—যাহার নাম প্রেম।

সাত কোটি সন্তানেরে, ইত্যাদি। এই পংক্তি দুইটি এক্ষণে একটি প্রবচন হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের মনোগত একটি উচ্চ আদর্শ বা ধর্ম্মমন্ত্রের উদ্দীপনায়—বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই 'মানুষ'-দেবতার প্রতি ভক্তির বশে—এই যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা কবি-হৃদয়ের একটি গভীর ও পবিত্র ভাবের দ্যোতক বটে। তথাপি, এই উক্তি সম্বন্ধে দুইটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ঐ বাক্য অতিশয় রূঢ় হইয়াছে—মেকলে সাহেব বাঙালীকে যে গালি দিয়াছিলেন, উহা তদপেক্ষাও কঠিন ও ঘৃণাব্যঞ্জক। দ্বিতীয়তঃ, কবি নিজে বাঙালী বলিয়া, ঐরূপ গালিতে একটা গভীর দুঃখ বা আত্মগ্লানির পরিচয় আছে, সাধারণ পাঠকের মনে তাহাই মনে হইতে পারে বটে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় আমরা করিতেছি, তাহাতে ঐ উক্তিতেও যেমন, তেমনই উহার কণ্ঠস্বর-ভঙ্গিতেও একটা যে অতি উচ্চ স্বাতন্ত্র্যবোধ বা জাতিসাধারণ হইতে পৃথক একটা আত্ম-ধর্ম্ম ও তাহার গৌরববোধ আছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাহাতেও কোন দোষ নাই, আমরা কবিকেই দেখিব—ব্যক্তিকে দেখিতেছি না—কবির প্রত্যেক ভাবাবস্থাই (mood)—অনুভূতির তীব্রতা ও ভাবের মৌলিকতায় মূল্যবান। কিন্তু যেহেতু ইহাতে নিছক ভাবাবস্থা ছাড়াও একটা সজ্ঞান বিচার-বুদ্ধি আছে এবং তাহারই দ্বারা একটা সমগ্র জাতির উপরে বিচারকের রায় প্রকাশ করা হইয়াছে—এক কথায় উহা শুধু কবিতাই নয়, একটা গুরুতর সত্য-সিদ্ধান্ত, অতএব সেই সত্যের তথ্য-প্রমাণও একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা অন্যায় হইবে না। কবি 'মানুষ' ও 'বাঙালী' এই দুই শব্দের অর্থ পরস্পর-বিরোধী করিয়াছেন ; কিন্তু 'বাঙালী' আর সকল জাতির মতই,—তাহার দোষ এবং গুণও যেমন আছে, তেমনই তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও আছে—অতএব, সাধারণ অর্থে 'মানুষ' নিশ্চয়ই ;—নহিলে এতকাল সে একটা সমাজ ও সভ্যতা রক্ষা করিয়াছে কেমন করিয়া ? বন্য বা অসভ্যও সে নয়। বহু পূর্ব্বের ইতিহাস যেমনই হৌক -শ্রীচৈতন্যের যুগ ও উনবিংশ শতাব্দী—এই দুইটা যুগে বাঙালী-মনীষা, পৌরুষ ও চারিত্র, মনুষ্যসুলভ সকল উচ্চ গুণেরই পরিচয় দিয়াছে। 'সাত কোটি' সাধারণ বাঙালী, অবশ্য সেই সকল গুণের অধিকারী নয়, কিন্তু একটা জাতিকে বিচার করিতে হইলে তাহার শ্রেষ্ঠগণকে দিয়াই বিচার করিতে হয়—ইহাই সর্ব্বজনগ্রাহ্য রীতি। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে যুগের শেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বজ এমন বহু বাঙালীকে তিনি দেখিয়াছেন, যাঁহারা এই জাতির গৌরব। তাঁহার সমসময়েও এ জাতির হৃদয়বল, ত্যাগ ও উচ্চাশয়তার বহু নিদর্শন তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি কবি রবীন্দ্র ঐ সমাজকে ঐ জাতিকে, যে শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই, এই কবিতাটিতে তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইহার পূর্ব্বে ও পরে বহুবিধ রচনায় তিনি এই জাতিকে—বিশেষ করিয়া তাহার ব্রাহ্মণ্য-সমাজ-বিধিকে আক্রমণ করিয়াছেন ; সেই সকলের মূলে ন্যায় বা সত্য যেমন বা যাহাই থাকুক—ঐ যে একটা সমগ্র জাতির উপরে একজন ব্যক্তির নিরন্তর বিরাগ এবং আত্ম-নীতি-ধর্ম্মের বশে ঐ অবজ্ঞা ও অসহিষ্ণুতা—উহা আর যাহাই হৌক, প্রেমের পরিচায়ক নয়। এইজন্য কবির ঐ দুই পংক্তি একজন নিতান্ত অনাত্মীয়ের মুখে, তাহার

নিজের উচ্চ আদর্শ ঘোষণা এবং একটা কঠিন গালি বলিয়াই মনে হইবে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ এই সমাজকে কখনও আত্মীয় বলিয়া মনে করেন নাই ; করুণা বা অতি উদার বেদনা-বোধের পরিচয় থাকিলেও, তাহা সেই প্রীতি নয় যাহা অপরের পাপভাগ নিজে হাসিমুখে বহন করে। সকল আত্মতান্ত্রিক পুরুষের মত তাঁহার একটা প্রবল সংস্কারক মনোভাব ছিল, তাহার বশে তিনি ঐ সমাজকে ও জাতিকে তাঁহার নিজের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন—সেই কল্যাণ তাঁহারই মনোমত কল্যাণ ; সর্ব্ব বিষয়ে তাহাদিগকে রবীন্দ্রধর্ম্মী হইতে হইবে। শেষে তাঁহার সে কামনা কতক পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছে ; মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি 'কবি-গুরু' না হইয়া 'গুরুদেব' নামের অধিকারী হইয়া একটা বড় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

এই কবিতাটির সমালোচনায় আমি আমার অধিকার কতকটা লঙ্ঘন করিয়াছি—কবিতার ব্যাখ্যা ও তদনুষঙ্গী কবিমানসের পরিচয় ছাড়াও আমি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিধর্ম্মেরও আলোচনা করিয়াছি ; অথচ, কবি রবীন্দ্রকে দেখা ও দেখানোই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু উপায় ছিল না, যেহেতু 'চৈতালী'র এই কবিতাগুলিতে সনেটের আকারে কবির শুধুই কবিমানস নয়, ব্যক্তি-হৃদয়েরও অকপট অভিব্যক্তি হইয়াছে, অতএব আমাকেও সেই ব্যক্তিটির ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছে। তার উপর এই দুইটি কবিতায় কবি যে-ভাব ও যে-চিন্তা ঐ ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্তির হইলেও একটা জাতির পরিচয় সম্পর্কিত ; কাজেই কর্ত্তব্যবোধে আমি এইরূপ একটু পৃথক আলোচনা করিলাম। এককালে আমিও এই কবিতাটি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম কারণ তখন রবীন্দ্রনাথকে স্বজাতি-বাৎসল্যের ও স্বাজাত্য-গৌরবের শ্রেষ্ঠ চারণ কবি বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। পরে রবীন্দ্র-কবির কবিধর্ম্মের যে পরিণতি দেখিয়াছি, তাহাতেও চমকিত হই নাই—কবি তাঁহার ভাব-জীবনে ও ধ্যান-জীবনে নিরন্তর নব নব সোপান অতিক্রম করিবেন, ইহা তো গৌরবের কথা। কিন্তু আজ এতকাল পরে যখন রবীন্দ্র-কাব্যের মূল ভাবগ্রন্থিগুলি ও রবীন্দ্র-কবিমানসের বিকাশধারাটি অতিশয় সাবধানে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি তখন কবির সেই কবিধর্ম্ম ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছি—কোনকালেই সেই ধর্ম্মমন্ত্রের এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নাই ; আদি ও অন্তে যেমন, তেমনই 'চৈতালী'র ঐ কবিতায় কবি সেই একই বিশ্বমানব ও বিশ্ব-দেবতার মন্ত্রারতি করিয়াছেন ; তিনি কখনো স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে এতখানি আত্মহারা হন নাই যে, ঐ সনেট একটা গালি না হইয়া, সুগভীর আত্মগ্লানির জ্বালা হইতে পারে। তাই সেদিন যে ভুল করিয়াছিলাম, আজ তাহা সংশোধন করিতে হইল, কবিকে ভুল বুঝিয়া লাভ কি ? যাহারা আজও কবিকে জাতির দিক দিয়া পূজা করে তাহারাও ভুলই করে—কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 'বিশ্বকবি'ই বটেন।

মানসী

কবিতা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট সনেট। উৎকৃষ্ট এইজন্য যে, এই ক্ষুদ্র পরিসরে কবি শুধুই একটি ভাব-সত্যকে সুনিপুণ বাণী-রূপ দান করেন নাই—তাঁহার নিজের কবিমানসের একটি স্থায়ী বীজকে কবিতাপুষ্পে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। এই যে নারীর মানসী-দেহটাকে কবি ও শিল্পীর চক্ষে দেখা—তাহাকে ভাবের ও নানা সৌন্দর্য্যের ভূষণে ভূষিত করিয়া দুর্ল্ল‌ভ করিয়া তোলা—ইহা প্রেমিকের নারী-পরিচয় নয়—একান্তভাবে কবির, এবং রবীন্দ্রনাথের মত আর্ট-সাধক কবির। নারী সুন্দর দুই অর্থে,—এক প্রেমিকের চক্ষে, আরেক আর্টিষ্টের চক্ষে; এক হৃদয়ের আলোকে, আরেক মনের সৌন্দর্য্য-পিপাসার কল্পনালোকে। এখানে কবি দ্বিতীয়টির কথা বলিয়াছেন।

কবিতা-পাঠ

পুরুষ গড়েছে তোরে ইত্যাদি। ঐ রূপ কবির দেওয়া রূপ। সাধারণ পুরুষও নারীকে বাস্তবের অধিক একটা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখে—সে যৌন-সংস্কারের বশে, যথা—

"It is the sexual instinct in man that makes him see beauty in woman."

—*Schopenhauer*

কবিও শুদ্ধ ভাষায় পরে বলিয়াছেন—

"পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা"

এ কথা খুবই সত্য।

অমর করেছে শিল্পী, ইত্যাদি। ইহার পর কবি শিল্পীর নারী-পূজার কথা বলিয়াছেন, এবং তাহারও পরে, প্রকৃতিও যে নারীর সৌন্দর্য্যরাজির জন্য কত প্রসাধনদ্রব্য যোগাইয়া থাকে তাহাও বলিয়াছেন। অতএব কবিতাটির মূল ভাববস্তু সবদিক দিয়া পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হইয়াছে।

চরণ রাঙাতে কীট—অর্থাৎ 'লাক্ষা'—উহা একজাতীয় কীটের দেহজ আঠা। উহাই হইতেছে আদি অলক্তক।

লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, ইত্যাদি। ঐ 'লজ্জা দিয়ে' কথাটি এখানে এমন একটি বস্তুকে তালিকাভুক্ত করিয়াছে, যাহা নারীর আকর্ষণী শক্তির বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহায়। ঐ লজ্জাই নারীর একটি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ এবং আর সকল সৌন্দর্য্যের উপরে উহা একটি স্বতন্ত্র ও অমূল্য ভূষণ। কবি বলিতেছেন—ঐ সকলই তোমার নগ্ন বাস্তব রূপকে আবৃত করিয়া, এবং তোমাকে একটি অপর মহিমায় মণ্ডিত করিয়া যতটুকু গোপন করিয়াছে, অর্থাৎ তোমাকে ঘেরিয়া একটা অপরিচয়ের রহস্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতেই পুরুষ তোমাকে দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য মনে করে।

পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা ইত্যাদি। শেষ দুই পংক্তি যেমন ভাষায় তেমনই অর্থগৌরবে সমান দীপ্তিময় হইয়াছে। 'অর্দ্ধেক মানবী'—অর্থাৎ, দেহটা কম সত্য নয় —কিন্তু কেবলমাত্র 'দেহ' হইলে তুমি পুরুষকে এমন মুগ্ধ করিতে পারিতে না; কল্পনায় সেই দেহে একটি রূপ যুক্ত হইয়া—দুই-এ মিলিয়া তোমার যে মূর্ত্তি তাহাই আমরা দেখি ও জানি। ঐ 'কল্পনা'—আদৌ কাম-কল্পনা, পরে তাহাই চিত্তের উৎকর্ষ অনুযায়ী প্রেম-কল্পনা বা নিছক সৌন্দর্য্যপিপাসার কল্পনা হইয়া উঠে।

মৌন ও অসময়

কবিতা-প্রসঙ্গ

কবিতা দুইটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা হিসাবে বিশেষত্ব-বর্জ্জিত—সঞ্চয়ন-গ্রন্থে স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়। ইহাদের পরিবর্ত্তে 'চৈতালী' হইতে উৎকৃষ্টতর কবিতা চয়ন করা যাইত। কবিচিত্তে একটা অবসাদ বা শূন্যতাবোধ—একটা সমসাময়িক কবিশক্তিহীনতার অতি সাধারণ আক্ষেপ এই দুই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে; উপমাগুলিও অতিশয় মামুলী। যদিও ইহাতে কবিহৃদয়ের কোন বাস্তব-বেদনার যথাযথ প্রকাশ হইয়া থাকে, তথাপি সেই বেদনা কাব্যরসিক পাঠকের রসচেতনায় সাড়া জাগাইবে না, কারণ তাহা একান্তভাবে কবির নিজ অন্তরের ঘটনা।

কবিতা-পাঠ

বাঁশি যেন নাই…শুধু অশ্রুজল। (মৌন)—সে যে কেমন অবস্থা তাহা শুধু এইরূপ বাক্যের দ্বারা বুঝানো যায় না—কবিতার আকারেই তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। বাঁশির সুর নাই, নিশ্বাস আছে, অথবা গানের রাগিণী নাই, অশ্রুজল বা ব্যথা আছে—এ অবস্থাবোধ হয় ভাবালু (sentimental) মানুষ মাত্রেরই হয়; তফাৎ এই যে, তাহারা কবি নয় বলিয়া সেজন্য আক্ষেপ করে না, এখানে কবির ভাষা আছে বলিয়া সেই আক্ষেপ ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কবিতা দুইটির যদি কোন বিশেষ মূল্য থাকে, তবে তাহা ঐ ভাবাবেগপ্রাণ, অথচ কবিশক্তিহীন নীরব কবিদের অন্তর-বেদনার পরিচয় হিসাবে। কবি তো এই কথাই এ কাব্যের আরম্ভে বলিয়াছেন—

চলে গেছে মোর বীণাপাণি।…
কখনো মনের ভুলে যদি এবে লই তুলে
বাজে বুকে বাজাইতে বীণা,
যদিও নিখিল ধরা বসন্তে সঙ্গীতে ভরা
তবু আজ গাহিতে পারি না।
কথা আজ কথা সার সুর তাতে নাহি আর
গাঁথা ছন্দ বৃথা বলে' মানি,—
অশ্রুজলে ভরা প্রাণ নাহি তাহে কলতান—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

ঐ প্রথম কবিতাটিতে কবির বেদনা আরও সমূলক (authentic) ও অকৃত্রিম বলিয়া মনে হয়, উহার কাব্যরস আরও সার্থক হইয়াছে।

তোমারে হেরিয়া তারা, ইত্যাদি ('অসময়')—ভাব এই যে, এখন প্রাণে কবিতা নাই, অথচ তোমার আগমনে একটা যে ব্যাকুলতা জাগিয়াছে তাহাতে বাহির হইতে একটা উদ্দীপনার বশে কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে কবিতা অকালে-ফোটা পুষ্পমুকুলের মত বর্ণ ও সৌরভে সুসম্পূর্ণ হইবে না। কারণ—

"There must be the internal force and the external stimulus. Neither is enough by itself. A rose will not flower in the dark, and a fern will not flower anywhere".

[*Autocrat of the Breakfast Table*

কুমারসম্ভব গান

কবিতা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-কবি-মানসে—কবিচিত্তের রসপিপাসায়—ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কাব্যের যে এমন একটি রুচি ও ভাবগত গূঢ় প্রভাব কবির সেই কৈশোর হইতে প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে দেখা যায়, এই কবিতা তিনটিতে (পরবর্ত্তী 'মানসলোক' ও 'কাব্য) তাহার একটি চকিত অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বহুতর কবিতায় ও গদ্য-নিবন্ধে কালিদাসের এবং তাঁহার 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা'র (একবার মাত্র 'রঘুবংশে'র) কবি-কল্পনা ও কাব্যজগৎকে বার বার সেই গভীর অনুরাগের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। এখানে তিনি 'কুমারসম্ভব'-এর কবিকে বিশেষ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। পরে কিন্তু—সর্গবিশেষের কাব্য-সৌন্দর্য্য বিস্মৃত না হইলেও, তিনি 'কুমারে'র প্রতি তেমন ভক্তিভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই—তাহার প্রমাণ আছে। উহা তাঁহার কবি-ধর্ম্মের ও কবিমানসের শেষ রূপান্তরকালে ঘটিয়াছিল। বাল্যকালে তিনি ছাত্র-কর্ম্ম-হিসাবে 'কুমারসম্ভবে'র অংশ বিশেষের অনুবাদ করিয়াছিলেন সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন এই পূর্ণ কবি-যৌবনকালে তিনি পুনরায় ঐ কাব্য পাঠ করিয়া যে সনেটগুলি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাব্য অপেক্ষা কবির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধার নিদর্শন আছে ; এই প্রথম সনেটটিতেও 'কুমারসম্ভবে'র মূল-কাহিনীর যে পর পর সেই সাতটি সর্গের একটি শোভন-সুন্দর কবি-কল্পনা-মণ্ডিত রসচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতেও কবি 'কুমারসম্ভব গান' অপেক্ষা সেই গানের গায়কের একটি সুরুচি-সুলভ সঙ্কট-অবস্থার কল্পনা করিয়া তাঁহারই কণ্ঠে আপন হৃদয়ের প্রশস্তি-মাল্য অর্পণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কালিদাসের কাব্যে কবিমানসের সুরুচি-সুলভ সঙ্কোচ কোথাও নাই, এবং কালিদাস যে যুগের কবি সে যুগে—যে আর্ট ও যে জীবনচর্য্যার আদর্শ ভারতে একটা Renaissance-এর সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে দেহ ও আত্মা, ভোগ ও ত্যাগের একটা বলিষ্ঠ ও অকুণ্ঠ সমন্বয়, হিন্দুর প্রতিভাকে পূর্ণ পরিণতির গৌরব দান করিয়াছিল। সে যাই হোক, তিনটি সনেটের মধ্যে, এই সনেটটিতেই

কবিকল্পনার যে একটি রস-চাতুরী আছে, তাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে; তাহাতেই কালিদাসের 'কুমারসম্ভব গান' একটি নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে।

কবিতা-পাঠ

চারি দিকে ঘিরে, ইত্যাদি। এই কয় পংক্তিতে কবি পৌরাণিক কৈলাসপুরীর বর্ণনা হইতেই শিব-পরিবারের একটা Group Photograph তুলিয়াছেন, চিত্রের পশ্চাৎ চরিত্রগুলিও যেমন, পশ্চাৎপটখানিও তেমনই আধুনিক কাব্য-পদ্ধতির ছায়ালোক-সুষমায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কভু স্মিতহাসে, ইত্যাদি। উমার বাল্য-লীলা ও যৌবন-বর্ণনার কালে। 'কভু দীর্ঘশ্বাস'—হরের প্রতি প্রেমসঞ্চারে এবং সেই মনোরথ পূর্ণ না হওয়ার আশঙ্কায়। 'কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস'—মদনভস্ম হওয়ার ব্যাপারে এবং সেই রূঢ় প্রত্যাখ্যানে; অথবা—ঐ 'মদন ভস্ম' ও প্রত্যাখ্যানের কারণেই 'দীর্ঘশ্বাস', এবং পরে তপস্যাশেষে হরকর্তৃক সেই সাদর-সস্নেহ আলিঙ্গনে যুগপৎ অভিমান ও আনন্দের 'অশ্রুজলোচ্ছ্বাস'।

যবে অবশেষে, ইত্যাদি। সর্ব্বশেষে সপ্তম সর্গে বিবাহ ও মিলনের পর কবি যখন 'নব দম্পতী'র গোপন প্রেম-লীলার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

সহসা···অসমাপ্ত গানে। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সাত সর্গ-ই কালিদাসের নিজের রচনা এবং অষ্টম হইতে বাকি সর্গগুলি পরে কোন কবি যোজনা করিয়াছেন এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু তাহাতে 'মহাকাব্য' অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, শাস্ত্রমতে মাত্র সাতটি সর্গে মহাকাব্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এদিকে ঐ অষ্টম সর্গে 'হর-পার্ব্বতী'র যে রতি-সম্ভোগের বর্ণনা আছে, তাহাও অশাস্ত্রীয়—কারণ, "জগতঃ পিতরৌ", অতএব মাতা-পিতার ঐরূপ মিলন-বর্ণনা সন্তানের পক্ষে অতিশয় গর্হিত। তাই কবি প্রচলিত প্রবাদই বিশ্বাস করিয়া উহাকে 'অসমাপ্ত গান' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন—বস্তুতঃ ঐ 'কিংবদন্তী'র উপরেই এই কবিতার সমগ্র রসকল্পনা নির্ভর করিতেছে।

[কিন্তু এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যাইতে পারে। সপ্তম সর্গের পরবর্ত্তী ঐ সর্গগুলি যে কালিদাসের রচিত নয়, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। উহাতে যে সুরুচির বিঘ্ন ও দারুণ অশ্লীলতা আছে তাহা সত্য— কিন্তু রুচি ও রসের সম্বন্ধ সর্ব্বকালে একরূপ নয়। সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে—কাব্যে ও পুরাণে আধুনিক এই রুচির শাসন কুত্রাপি নাই। কালিদাসের কাব্যে অশ্লীলতা অন্যত্রও আছে; আবার ঐ অষ্টম সর্গের কাব্য-রস বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় কাব্যসংস্কারে বিদ্যমান ছিল—জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব পদাবলী ও পরে ভারতচন্দ্রের তো কথাই নাই, ভারতীয় চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে নারী-মূর্ত্তির নিরাবরণ শোভা এবং অনঙ্গ-পূজায় অঙ্গ-গৌরব যেমন পূর্ণ প্রকটিত হইতে দেখা যায়, তেমনই পবিত্র মন্দির-গাত্রে উন্মদ মিথুনমূর্ত্তির লীলাও, দেবতা-ভক্তির কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটাইত না। অতএব, ঐ যে কয় সর্গকে অশ্লীল বলিয়া বর্জ্জন করা হইয়াছে—উহা বহু পরবর্ত্তীকালের রুচি ও রসবিচারের ফল বলিয়াই মনে হয়।]

মানসলোক

কবিতা-প্রসঙ্গ

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-কাব্যে, কাব্যেরও অন্তরালে যে একটি কবি-মানসলোক আছে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহারই ধ্যান করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্য-বিচারে এই কাজটির কোন প্রয়োজন ছিল না—কারণ কাব্যই ছিল বিচার্য্য—কবিমানস বলিয়া কোন পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব রসবিচারে গ্রাহ্য হইত না। এই গুরুতর অভাবটির জন্য আধুনিক কাব্যবিচারে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র একরূপ যোগ্যতাহীন হইয়া পড়িয়াছে—কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যে কেবল শব্দার্থ-ঘটিত রস নয়—ভাগবতী সৃষ্টির যে সুগভীর রহস্য নির্ব্বিশেষের বিশেষ রূপগুলিতে প্রতিভাসিত হয়, তাহার সন্ধান উহার ঐ রসবাদের বহির্ভূত। কবি রবীন্দ্র কিন্তু এখানে ঐরূপ রস-বিচারের ঠিক বিপরীত আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছেন—তিনি কাব্যকে সম্পূর্ণ গৌণ করিয়া কবির পূজা করিয়াছেন। ঐ কুমারসম্ভব, উজ্জয়িনী রাজসভাও যেমন, তেমনই ঐ কাব্যের কাহিনীও মনের মধ্যে ক্ষণপ্রভার মত উদয় হইয়া মিলাইয়া যায়। কেবল উহাতে যে 'শঙ্কর-চরিত' ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই চরিতের উদ্ভাবনায় (Conception) ও তাহার রূপকল্পের উপাদান হিসাবে 'চিরস্থির আষাঢ়ের ঘন মেঘদলে'র 'নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধনীলভাস' এবং 'জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষির তপোলোক' এইরূপ কয়েকটি চিত্র মানসমধ্যে চির-মুদ্রিত হইয়া গেছে—উহাতেই মানস-কৈলাসের নির্জ্জন ভুবন—অর্থাৎ কবিমানসের উচ্চতম শিখর দৃশ্যমান হইয়া আছে। কবি এখানে 'কুমারসম্ভবে'র সঙ্গে কালিদাসের 'মেঘদূতে'র 'আষাঢ়' ও 'ঘন মেঘদল' এক করিয়া লইয়াছেন। এ কবিতায় কালিদাসের কবিমানস বা কুমারসম্ভব, কোনটারই ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, কেবল কবির নিজ অন্তরের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি দুই একটি ইঙ্গিতে প্রকাশ পাইয়াছে। শেষের ঐ যে দুই পংক্তি—

> সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি—
> রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি ॥

—ইহাতে সেই 'বিপুলচ্ছবি', কালিদাসের কবিমানসের সেই শঙ্কর-চরিত-বিম্বিত মূর্ত্তিটিও আর রহিল না, কেবল একটি কবি-আত্মার নির্ব্বিশেষ সত্তা, আর সকলকে অতিক্রম করিয়া, নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু কাব্যের ভিতরেই কবিকে পাইতে হয়—কাব্যের বাহিরে কোথাও নাই—কবি-মানুষের আত্মার কথা স্বতন্ত্র। কালিদাসের ঐ কাব্যগুলি আছে বলিয়াই কালিদাস আছেন, এবং উহার বাহিরে যে-কালিদাস থাকা সম্ভব তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই, থাকার প্রয়োজনও নাই। কাব্য বলিতেও যেমন কবি, তেমনই কবি বলিতেও কাব্যকেই বুঝিতে হইবে। অতএব কালিদাসের কাব্যকে অতিক্রম করিয়া ঐ যে 'চিরকবি'র ধ্যান, উহা রবীন্দ্রীয় ব্যক্তিধর্ম্ম ও কবিমানসের পক্ষেই সম্ভব, কারণ, রবীন্দ্রনাথ সকলের উপরে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মহিমার উপাসক। এখানেও কবির সেই এক সর্ব্বসম্বন্ধ-বন্ধনহীন আত্মার আত্ম-পূজার মন্ত্র কেমন উঁকি দিয়াছে, তাহাই লক্ষণীয়। কবির কাব্য অর্থাৎ তাঁহার কীর্ত্তি

অপেক্ষা কবি অনেক বড়,—এই ভাব-মন্ত্র এখানেও যেমন, তেমনই পরবর্ত্তী কালের কাব্যেও ঘোষিত হইয়াছে, যথা—

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।

[বলাকা]

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস তথা ব্যক্তিধর্ম্মের যে প্রধান লক্ষণ—তাহা এই Intrepid Egoism বা দুর্দ্ধর্ষ আত্মনিষ্ঠা—স্বাতন্ত্র্য-মহিমার জয়গান। পূর্ব্বের কবিতায় আমরা ইহারই একটা অকপট প্রকাশ দেখিয়াছি; বস্তুতঃ সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রস-কল্পনা, ভাবুকতা ও কাব্যকলার অপূর্ব্ব বিকাশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জন্যই রবীন্দ্র-কাব্যে কোনরূপ সঙ্গ-পিপাসা বা সমাজ-প্রীতির যে আবেগ-গভীর হৃদয়ধর্ম্ম তাহার কাব্য প্রেরণা বিফল হইয়াছে—বরং সর্ব্বত্র ঐরূপ সাক্ষাৎ হৃদয়-সম্পর্কের ক্ষুধাকে নিম্নস্তরের পিপাসা বলিয়া, এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য—সকল কামনাকে দেহের ক্ষেত্র হইতে মানসক্ষেত্রে তুলিয়া শোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে—এবং ব্যক্তিকে ও বিশেষকে বর্জ্জন করিয়া বিশ্ব ও ভূমার আরাধনাই একমাত্র ধর্ম্ম হইয়াছে। 'চৈতালী'র এই ছোট ছোট কবিতাগুলিতেও সেই ধর্ম্মমন্ত্রটি কিরূপ সরল ও সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, আমি এখানে তাহার যে সবিশেষ উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রয়োজন ছিল; আমি রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-কবিধর্ম্মের বিকাশ এবং তাহাতে কোন্ মূলমন্ত্র ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে—তাহাও প্রণিধান করাইতে চাই; নহিলে কবি রবীন্দ্রের বিশিষ্ট প্রতিভা এবং রবীন্দ্র-কাব্যের গতি-প্রকৃতি ও তাহার পরিণাম বুঝিতে পারা যাইবে না।

কাব্য

কবিতা-প্রসঙ্গ

কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেও, এই কবিতায় সকল শ্রেষ্ঠ কবির কবি-জীবন ও কাব্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ—কবি তাহাই চিন্তা করিয়াছেন, অতএব উহার সাধারণ 'কাব্য' নামটি যথার্থ হইয়াছে। এই জন্য কবির ব্যক্তি-জীবনকাহিনী হইতে কাব্য বড়, কবির মধ্যে যে মহত্তর পুরুষ বাস করে, ঐ কাব্যে তাহারই পরিচয় নিহিত থাকে; উহাই সত্যকার 'কবি-চরিত'। 'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেক' নামক কবিতায় কবি আরেকভাবে ঐ এক তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। সেখানে কবির মুখে, এখানে ভক্তের মুখে। সেই ব্যক্তি-জীবনের 'আমি'টা হইতে কবি-জীবনের 'আমি'টা স্বতন্ত্র; ঐরূপ একটা ব্যবধান রক্ষা করিতে না পারিলে, এবং তাহারই শক্তিতে বাস্তবের যতকিছু দুঃখ-দুর্গতিকে দূর হইতে

অনাসক্তভাবে দেখিতে না পারিলে কবিরা এই বিষবৃক্ষ হইতেই এমন অমৃতফল চয়ন করিতে পারিতেন না। এখানে ঐ 'কাব্য' বলিতে খাঁটি রসসৃষ্টিই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যে কাব্য আমাদের চিত্তকে সংসারের মলিনতা ও ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বাঁধিয়া রাখে না—প্রাণ-মনকে ঊর্দ্ধে বিহার করিবার শক্তি দান করে, বিষের পরিবর্ত্তে অমৃত আস্বাদন করায়। কালিদাসের কাব্য সেইরূপ কাব্যই বটে; কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে উহাই 'কাব্যে'র শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে—বাস্তব-বিস্মৃতির ঐ রসকল্পনা উৎকৃষ্ট কাব্য হইলেও, বাস্তবের বিষকে কল্পনা হইতে বহিষ্কার করিয়া নয়, তাহাকে অমৃতরসে পরিণত করিবার যে কবিশক্তি তাহাই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ নিজে—ঐরূপ রস বা সৌন্দর্য্য-মন্ত্রের কবি, তাই কালিদাসের সহিত তাঁহার একটি অন্তরের আত্মীয়তা আছে।

কবিতা-পাঠ

তবু কি, ইত্যাদি। প্রথম দুইটি সনেটের সহিত এই সনেট একটা ভাবসূত্রে যুক্ত রহিয়াছে, একই কবিতার পর-পর Stanza-র মতই এই সনেটগুলি মিলিয়া একটি Sonnet-sequence হইয়াছে।

কখনো কি সহ নাই, ইত্যাদি। তুলনীয়—

> For who would bear the whips and scorns of time,
> The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
> The pangs of dispriz'd love, the law's delay,
> The insolence of office, and the spurns
> That patient merit of the unworthy takes,
> who would fardels bear,
> To grunt and sweat under a weary life.
>
> [*Hamlet*

নিদ্রাহীন রাত্রি…বক্ষে শেল গাঁথি—এখানে ঐ গাঁথি ক্রিয়াপদটি সুষ্ঠু হয় নাই—বিশেষতঃ মিলের স্থানে আছে বলিয়া তাহার শৈথিল্য বেশি করিয়া চোখে পড়ে। 'সনেটে'র মত কবিতায় মিল ও শব্দ প্রয়োগের সামান্যতম ত্রুটি রসবোধকে পীড়িত করে। তারপর বাক্যের ঐ অংশটিতে অন্বয়দোষও আছে—"বক্ষে শেল গাঁথিয়া নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে নাই", —ইহার অর্থ ঐ শেল নিজের বক্ষে নিজে গাঁথিয়া নয়—তাহা আপনা হইতেই বক্ষে বিঁধিয়াছে, অর্থাৎ দারুণ যন্ত্রণা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এমনতর ত্রুটি বিস্ময়কর বটে। বুঝিতে পারা যায় ঐকালে কবির কাব্যরচনায় মনের একটা অবসাদ-শৈথিল্য ছিল।

আনন্দের সূর্য-পানে। ঐ 'আনন্দ' রবীন্দ্র-কবিধর্ম্মের একটা বড় মন্ত্র; পরে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে এক অভিনব আনন্দবাদের অফুরন্ত রসোল্লাস দেখিব।

জীবনমন্থন বিষ, ইত্যাদি। 'কবিতা-প্রসঙ্গ' দেখ।

'চৈতালী'-পাঠান্তে ও পর্ব্বশেষে

(১)

'চৈতালী' পাঠ করার পর রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে—রবীন্দ্র-কবিজীবনের একটা যুগ শেষ হওয়ার কথা। আমি এই কাব্যেই একটা পর্ব্ব—দ্বিতীয় পর্ব্ব—শেষ করিয়াছি; কিন্তু ইহা কেবল পর্ব্বশেষ নয়, কবির কবিমানসের বিকাশে এখানে পরিণতির একটা বৃহত্তর ছেদ পড়িয়াছে। সেই 'ভানুসিংহ' হইতে 'কড়ি ও কোমল', এবং 'মানসী' হইতে 'চৈতালী' এই দুই পর্ব্বে যেমন কতকগুলি ভাব-বীজ, ও একটা বিশিষ্ট কবি-প্রকৃতি পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে উত্তরোত্তর সুপ্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি কবিশক্তির বিকাশ-মুখে তাহা উজ্জ্বলতর রসরূপে রূপায়িত হইয়াছে। তাহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কবির ভাবুকতা ও রস-কল্পনা যতই গভীর ও দূরপ্রসারী হউক,. শেষ পর্য্যন্ত, কবির সেই Egoism বা আত্মভাব-পরায়ণতার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্য্যন্ত যে কাব্যধারা, তাহাতে এমন বহু কবিতা আছে—সেই কবিতাগুলির ভাবসৌন্দর্য্যও অতুলনীয়—যাহাতে কবির অকুণ্ঠিত আত্ম-নিবেদনই নানা ছন্দে ব্যক্ত হইয়াছে। এই আত্মনিবেদন অর্থে, কবির নিজস্ব কবিধর্ম্ম, তথা আত্মিক সাধনমন্ত্রের ঘোষণা; ইহারই শেষ পর্য্যায় 'চিত্রা'র 'জীবন দেবতা'য় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতএব, এ পর্য্যন্ত আমরা কবির কাব্যও যেমন, তেমনই তাহার অন্তরালে একটি ব্যক্তি-স্বতন্ত্র কবিমানসকে মুগ্ধচিত্তে অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু এই 'চৈতালী'-কাব্যে সেইরূপ কাব্য-সাধনায় যেন একটা শ্রান্তি বা সমাপ্তির স্পষ্ট আভাস আছে; শুধুই সমাপ্তির অবসর বিনোদন নয়,—কবি অনুভব করিতেছেন, তাঁহার অন্তর-বীণার সেই বীণাপাণি যেন চলিয়া গিয়াছেন, গানের সেই সুর আর তাহাতে বাজে না; 'চৈতালী'র একাধিক কবিতায় বারবার এই অবস্থার বর্ণনা আছে। অপর কবিতাগুলিতেও আমরা কবিমানসের একটি passive বা উদ্যমহীন অবস্থার,—যেন স্বয়মাগত ভাবচিন্তার একটি অবশ ও অকপট প্রকাশ দেখি; এগুলি যেন কবির 'অবকাশ-রঞ্জিনী'। কিন্তু কাব্যপ্রয়াস যেমনই হোক,—'চৈতালী'তে সেই পূর্ব্ব-ভাবধারার কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রন্থি উঁকি দিয়াছে—যেন কবি তাঁহার বিগত কবি-জীবনের একটা সালতামামী করিতেছেন। তাহাতেও দুইটা সুর নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—প্রকৃতি-প্রেমের মর্ত্ত্যপ্রীতি, ও নিজের স্বতন্ত্র ধর্ম্মবোধ বা মনুষ্যত্বের আদর্শ। তাহাতে কোথাও কোন সংশয় নাই, কবিপ্রাণের দিক দিয়াও একটি পূর্ণতাবোধ আছে।

ইহার পূর্ব্বে 'সোনার তরী'তে আমরা কবিপ্রাণের একটা সংশয়—একটা আধ্যাত্মিক-সংকটের আভাস পাইয়াছিলাম। কবি যেন তাঁহার প্রাণের সেই অসীম আকুতি ও মনের অন্তহীন ভাবকল্পনার ভার বহিতে পারিবেন না; বাহিরের আকাশে 'ঘন-বরষা' অথবা তরীর সম্মুখে 'সংশয়ময় ঘননীল নীর' তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে, কিন্তু তাহাতেও সমাপ্তির সন্তোষ ছিল না; ঝড়ে ডুবিবার পূর্ব্বে কিছু বাঁচাইবার, কিম্বা 'নিরুদ্দেশযাত্রা'র সেই দুস্তর সাগরে নির্ব্বিঘ্ন হইবার কামনাই ছিল। 'চৈতালী'তে ঘন বরষার উপদ্রব নাই, বরং বর্ষশেষের শেষ ফসল ও

তাহার পূর্ণ-সফলতার তৃপ্তিসুখ আছে। কবি সত্যই অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য-প্রেরণার একটা বড় পর্ব্ব অবসিত হইয়াছে, তাই প্রাণ তৃপ্ত হইয়াছে,—এইবার তিনি প্রকৃত বিশ্রামের অবকাশ পাইয়াছেন। 'চিত্রা'র কবি এই রকম একটা সমাপ্তির পূর্ব্বাভাস পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার 'জীবন দেবতা'কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ, যা কিছু আছিল মোর···
যত শোভা, যত গান, যত প্রাণ, জাগরণ ঘুমঘোর।···
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবনডোরে।

[জীবন দেবতা

এখানে আর সেই প্রার্থনাও নাই; জীবনদেবতার উদ্দেশে যে একটিমাত্র কবিতা আছে, কাব্যের সেই 'উৎসর্গ' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন—

তুমি এসো নিকুঞ্জ-নিবাসে
এসো মোর সার্থক-সাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল—
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ।

এখন সেই পূর্ণতায় কেবল এক কামনা আছে—সর্ব্বসমর্পণ; ঐ 'সার্থক সাধন' কথাটি বড়ই অর্থপূর্ণ। অতএব, 'চৈতালী'র ঐ 'উৎসর্গ' এবং উহার অধিকাংশ কবিতা এইরূপ একটা সমাপ্তির—কবিজীবনের এক ভাগে একটা পরিণতির সংবাদ দিতেছে।

ইহা যে কত সত্য তাহার একটি প্রমাণ ইহার পরবর্ত্তী কাব্যগুলি—কল্পনা, কথা, কাহিনী ও ক্ষণিকা। এগুলিতে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন কাব্যজগতে—কেবলমাত্র কল্পনাকে সঙ্গিনী করিয়া বিচরণ করিয়াছেন। সেই জগৎ রসের জগৎ, তাহাতে ঐরূপ আত্মভাব-সচেতন কবি-মানসের উৎকণ্ঠা নাই। সেই কাব্যগুলিতে সুন্দরের যে আরতি আছে, তাহা 'মানস-সুন্দরী' বা 'জীবন দেবতা'র মন্ত্রারতি নয়; তাহাতে 'বসুন্ধরা', 'এবার ফিরাও মোরে', 'প্রেমের অভিষেক' বা 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিকে আকুল করিয়া তোলে না, এখন 'বর্ষামঙ্গল', 'মদনভস্ম' ও 'স্বপ্ন' কবিকে সুদূর কল্পজগতে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার রস কবিকে আত্মবিস্মৃত করে। ঐ পৃথক কাব্য-কল্পনার এই জাতীয় কবিতাগুলিই 'অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী'কে আমাদের ধ্যানবস্তু না করিয়া, সাক্ষাৎ 'স্বপ্নসঙ্গিনী' করিয়া তোলে। ইহার পর, 'কথা' ও 'কাহিনী'তে কবি যে কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতদূর সম্ভব—আত্মভাবমুক্ত হওয়ার লক্ষণ আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বশেষে 'ক্ষণিকা'য় কবি যেন পূর্ণমুক্তির আনন্দে, মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের

মতই, একটা বৃন্দাবনী আকাশে লঘুলীলায় সন্তরণ করিয়াছেন; মনের সেই শৃঙ্খল হইতে মুক্তি-লাভের আনন্দে নিজেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি।...
যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।

কিন্তু এখনই এতদূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল, ঐ যে আমি বলিয়াছি, এই পর্ব্বের শেষে, কবিমানসের একটি সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, ইহা শুধুই পর্ব্বশেষ নয়—কবির কবিজীবনেরও একটা অধ্যায়-শেষ তাহারই সহজগ্রাহ্য প্রমাণস্বরূপ, আমি পরবর্ত্তী পর্ব্বের ('কল্পনা' হইতে 'ক্ষণিকা' পর্য্যন্ত) ঈষৎ পরিচয় দিলাম—যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

(২)

এইবার সংক্ষেপে রবীন্দ্রকাব্যের সেই বিগত ধারাটির একটি সমগ্র ধারণা করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, ঐ দুই পর্ব্বে কবিজীবনের প্রায় অর্দ্ধ, এমন কি, মধ্যাহ্নও অতিবাহিত হইয়াছে; উহাতেই একটা বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতির—শুধুই উন্মেষ নয়—পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছে। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' যাহার উদ্বোধন, এবং 'চিত্রা' ও 'চৈতালী'তে যাহার নিবর্ত্তন, তাহা যে একটা বড যুগ তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অপর যুগ হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য কি? সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐ কালের ঐ কাব্যে কবি যেভাবে ক্রমাগত আপনাকে খুঁজিয়াছেন তেমন আন্তরিক উৎকণ্ঠা, এবং তাহার বশে প্রাণ-মনের উদ্দীপ্তি ও অকপট উৎসার পরে আর কোথাও লক্ষিত হয় না। এই প্রথমার্দ্ধের কাব্যসাধনায় তিনি সেই আত্মমন্ত্রটিকে যথাযথ প্রকাশ করিবার ঐকান্তিক আগ্রহে যে বাণী ও যে-ছন্দ এবং যে-স্থর লাভ করিয়াছিলেন তাহাতেই সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের ভিত্তি-নির্ম্মাণ হইয়াছে। পরে কবি তাঁহার কবিধর্ম্মের সহিত কাব্যকলাকে যে-পথে যে-মুখে প্রবর্ত্তিত করুন না কেন, এই কালের এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল—সেই বাণী-সিদ্ধি শুধুই আর্টের জয়লাভ নয়, কবির প্রাণের অগ্নিদীপ্তি তাহাকে একাধারে ভাবোচ্ছল ও রসোজ্জ্বল করিয়াছে। আর্টিষ্ট বা রসস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ইহার পরের অধ্যায়ে যে নিপুণতর বাণী-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মূল্য অন্যরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি, তাঁহার ব্যক্তিস্বতন্ত্র কবিমানসের আদি ও অনাবৃত রূপটি দেখিতে হইলে কবিজীবনের ঐ প্রথমার্দ্ধের সাধনা ও সিদ্ধিলাভ উত্তমরূপে অনুধাবন করিতে হইবে। একথা সত্য যে, কোন মানুষই যেমন তাহার ব্যক্তি-স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না, কবিও তেমনই তাঁহার সেই মূলা কবিপ্রকৃতি হইতে কখনো ভ্রষ্ট হইতে পারেন না। কিন্তু যেহেতু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিণতিও

পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে, অতএব, শেষের কাব্যগুলিই রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিপক্কতম ফসল, এইরূপ একটা যুক্তি, এবং ঐ শেষ বয়সের কাব্যই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি—আধুনিকদের বিশেষ করিয়া, বিশ্ব-মানসলোকের অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা মত, ধর্ম্মমতের মতই সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে; এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব। উপস্থিত আমার বক্তব্য এই যে, বয়সের দিক দিয়াও যেমন খাঁটি কবিপ্রেরণার দিক দিয়াও তেমনই, 'চিত্রা' ও 'চৈতালী' পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিসুলভ কবিশক্তির পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রকৃতি অনুসারে ভাবকে রূপ দিবার, অতিসূক্ষ্ম অনুভূতিকে ছন্দে, সুরে, ও ভাষায় ধরিয়া দিবার যে-শক্তি,—অর্থাৎ আপন প্রাণের সহিত মুখামুখী সাক্ষাৎকারের যে অকুণ্ঠিত গীতোৎসার শ্রেষ্ঠ গীতি-প্রতিভার নিদর্শন, তাহা এইকালের কবিতায় কবি-রবীন্দ্রের অন্তরতম কবি-পুরুষটির যে পরিচয় বহন করিতেছে, তেমনটি পরে আর কোথাও করে নাই। 'প্রভাত-সঙ্গীত' হইতে 'চিত্রা' পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের যে নির্ঝরধারা বহিয়াছে তাহাতেই কবিহৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে আর্টের নিত্যনূতন রূপ-ভঙ্গিমায় কবির অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীর সেই বধূমুখ গুণ্ঠিত হইয়াই আছে। আবার, সাধারণ নর-নারীর যৌবনই যদি জীবনের বসন্তকাল হয়, কবির যৌবনও যে সেই বয়সের সমকালিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের তিনখানি উৎকৃষ্ট বড় কাব্য এইকালেই রচিত হইয়াছিল—'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জ্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'—এই গীতিস্বর-প্রধান নাট্যকাব্যগুলিতে কবিপ্রাণের যে রসোল্লাস ও কাব্যসৃষ্টির যে অন্তর্গূঢ় সৃষ্টি-প্রেরণা আছে—বা মনঃশিলাবিচ্ছুরিত প্রভা আছে, তাহাতেই কবির কবিযৌবন-মহিমা নিঃসংশয় হইয়া আছে। কবিমানসের প্রৌঢ়ত্ব বা প্রবীণত্ব একটা পৃথক মহিমা অর্জ্জন করিতে পারে—রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহা ঘটিয়াছে; কিন্তু কবিপ্রতিভার সেই সৃষ্টিশক্তি,—প্রাণৈষণার দ্বারা কাব্যকেও প্রাণবন্ত করিবার যে শক্তি—তাহা যৌবনেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; রবীন্দ্রনাথেরও তাহা হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতা (আমি এখানে মধ্যবর্ত্তীকালের কবিতাগুলি স্মরণ করিতেছি না) যতই চমকপ্রদ হউক, তাহাতে অতিকর্ষিত মানসের মাণিক্য-দীপ্তি আছে, প্রাণের উচ্ছল রসাবেশের সেই অকপট আকুতি ও কলধ্বনি তাহাতে নাই। কবি নিজেও তাহা জানিতেন—'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' ও 'লীলা-সঙ্গিনী' কবিতা দুইটি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। একটিতে 'যৌবন-বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি'কে স্মরণ করিয়া কবি-প্রাণের হাহাকারকে কোনরকমে চাপা দিবার জন্য একটা কল্পনার ফাঁকিকে আশ্রয় করিয়াছেন—জোর করিয়া বার্দ্ধক্যের নিয়তিকে অস্বীকার করিয়াছেন। অপরটিতে যৌবনের 'লীলাসঙ্গিনী'কে স্মরণ করিয়া, প্রাণের সেই উদ্দীপ্তি—যাহা আর নাই—তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।

বর্ষা-শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন খণে কখন অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

উপরের ঐ পংক্তিগুলিতে সেই লীলাসঙ্গিনীর বিরহই সত্য হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে সেই সত্যকার ভাবোদ্দীপনা (inspiration) নাই, আছে কেবল কথার ভেল্কি, ছন্দ ও ভাষার চারু-চাতুর্য্য, ইহাকেই ইংরেজীতে decadence বলে; শেলী ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তুলনায় সুইন্‌বার্ণ ও রসেটি যেমন—আদি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এই রবীন্দ্রনাথও তেমনই। আরও একটা প্রমাণ এই যে, এখনও রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলি পঠন-পাঠনের জন্য নির্ব্বাচিত হয় তাহার অধিকাংশই এই কালের রচনা।

(৩)

আমি ঐ যে রবীন্দ্র-কবিজীবনের একটা স্পষ্ট ও পৃথক পূর্ব্বভাগ চিহ্নিত করিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে কবিতাগুলির প্রসঙ্গে ও কবিতা-পাঠের অবকাশে তাহার প্রধান লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা ও আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে করিয়াছি; এখানে ঐ ভাগটিকে আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য, আমি পুনরায় সেই ভাবধারার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ কবিমানসের কয়েকটি প্রধান ভাবগ্রন্থি, যথা—(১) এক নূতন বিশ্বাত্মবোধ। ইহার মূলে আছে প্রকৃতি-প্রেম, বা সৃষ্টির নিরন্তর-প্রবাহিত রূপ-স্রোতের একটি সঙ্গীতময় সংবেদনা। 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার'-কবিতায় সেই সৃষ্টির কালস্রোত, এবং 'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার একটিতে, দেশে তাহার বিস্তার, এবং অপরটিতে জীবদেহে তাহার বিবর্ত্তন—কবির সেই বিশ্বাত্মবোধকে সর্ব্বাশ্রয়ী করিয়াছে। 'চৈতালী'তেও কবিমানসের এই ভাবগ্রন্থি সমান দৃঢ় হইয়া আছে—

"...মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে,
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে; ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্ব্ব জন্মে।

এই ভাবগ্রন্থিটি রবীন্দ্র-জীবনদর্শনে আদ্যন্ত অনুস্যূত হইয়া আছে। পরে ভাবের ঐ তত্ত্বটি রসের গূঢ়তর আবেশে মনের গণ্ডিও অতিক্রম করিয়াছে—ঐ বিশ্বচেতনার ইন্দ্রিয়ানুভূতি সীমার সহিত অসীমের লীলানন্দ হইয়া উঠিয়াছে—জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা এক হইয়া গিয়াছে। (২) ব্যক্তি-আত্মার স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা। রবীন্দ্র-কবিধর্ম্মের ইহাও একটা মূল তত্ত্ব। রবীন্দ্র-কাব্যের এই ভাগেই ব্যক্তি-আত্মার ঐ স্বাতন্ত্র্য—intrepid individualism—সুপ্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। পুনরায় কবির শেষ জীবনে ইহাই 'শেষের কবিতা'-প্রমুখ রচনাগুলিতে শাণিত তরবারির মত ঝিকিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই কবি রবীন্দ্রের আধুনিকত্বের দাবিও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যক্তি-আত্মার (Ego) ঐ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মকে 'মানসী' হইতে 'সোনার তরী'তে, এবং 'সোনার তরী' হইতে 'চিত্রা'য় কবি কোথাও ত্যাগ করেন নাই। 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা' এবং চিত্রার 'মৃত্যুর পরে' নামক কবিতায়—ইহার একদিক এবং সর্ব্বত্র প্রেম-কবিতাগুলিতে ও 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' কবিতায় ইহার অপরদিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা কবিমানসের subjectivity বা আত্মমুখী ভাবনাই নয়, একটি দুর্দ্ধর্ষ Ego বা 'অহং'-এর সজ্ঞান অধিকার-ঘোষণা। 'চৈতালী'র একটি পংক্তিতে সেই অধিকারবোধ যেন বিদ্যুৎশিখার মত ঝলসিয়া উঠিয়াছে—

"নিজের সে বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার"

এই যে একটি তত্ত্ব কবির সারা জীবনকে ঐ স্বাতন্ত্র্য-মুক্তি দান করিয়াছে, তদ্দ্বারা নিরঙ্কুশ আনন্দবাদের আর্ট-চর্চ্চাও যেমন, তেমনই দেশ-কালের সকল পরিবেশ-বশ্যতা মোচন করিয়া একটি দৃপ্ত অনাসক্তি রক্ষা করাও কবির পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এই ভাবমন্ত্রটির পূর্ণবিকাশ, ও কাব্যে তাহার অকপট অভিব্যক্তি এই কালেই সম্পূর্ণ হইয়াছে।

উপরের ঐ দুইটি ভাবগ্রন্থিই প্রধান; উহা হইতেই যে আর দুইটি ভাব এই কালের কাব্যে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়াছে, তাহার একটি—

(৩) মৃত্যু সম্বন্ধে কবির একটি বিশিষ্ট মনোভাব:—এই বিশ্ব বা 'অনন্ত সৃষ্টি'র নিত্য-ধারায় মৃত্যু একটা অভিশাপ নয়, উহা সেই একই জীবনধারার তট-পরিবর্ত্তন মাত্র। জন্ম ও মৃত্যু একই মহাজীবনের ছন্দ রক্ষা করিতেছে। এইরূপে কবির মর্ত্ত্যপ্রীতি ও মৃত্যুপ্রীতি এক হইয়া গিয়াছে। 'চৈতালী'র একটি কবিতায় কবি বলিতেছেন—

পরাণ কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, একি তব অন্তঃপুর ?
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য সকলি তোমার।
মনে হয়, যেন তব মিলন-বিহনে,
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।

['মৃত্যুমাধুরী'

এই কারণেই কবি মর্ত্ত্য হইতে বিদায় লইতেও যেমন অতি করুণ গীতিধ্বনি করিয়াছেন, ঐ পার্থিব জীবনের অমরতালাভেও তেমনই আশ্বস্ত হইয়াছেন।

এই তৃতীয় ভাব-বীজ কবিজীবনের ঐ প্রথমার্দ্ধে অঙ্কুরিত ও সুগোচর হইয়া উঠিলেও উহার পূর্ণপ্রস্ফুটিত রসরূপ উত্তরার্দ্ধেই রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

(৪) দ্বিতীয় যে ভাব-গ্রন্থির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই একটি গুরুতর বিষয়ে কবির মনোভাব অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে, বিষয়টির নাম—নর-নারীর প্রেম। উপরে আমি কবিমানসের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা হইতে এ কবির প্রেম-সম্পর্কিত আদর্শ যে কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ যে ব্যক্তি-আত্মার স্বাতন্ত্র্য উহা অপেক্ষা বড় কিছু নাই—প্রেমও উহার নিকটে ক্ষুদ্র। যে-প্রেমে অপরের নিকটে ব্যক্তি-আত্মার আত্মসমর্পণ আছে, যাহাতে মনের এক প্রকার রসপিপাসার পরিবর্ত্তে দেহ ও মনের যুগপৎ মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে, যে প্রেম পরস্পরকে মনে ধ্যান না করিয়া, সংসারের কঙ্কর-কণ্টকময় পথে সাথী হইতে চায়, এবং না হইলে যাহা ব্যর্থ হয়—তেমন প্রেম অতিশয় মলিন-বুদ্ধি ও স্থূল কামনার নিদর্শন। মিলন হইবে দেহে নয়—মনে, কামনার বাস্তব-রাজ্যে নয়—ভাবের বিরহলোকে। কারণ, ঐ বাস্তবের বন্ধনে—দেহের সাক্ষাৎ-সম্পর্কের মধ্যে একটা ক্ষুধা জাগিবেই—তাহা স্বত্বাধিকার-লাভের ক্ষুধা; উহাতে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হয়—নর-নারীর আত্মাকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে। সেই প্রেমই আদর্শ-প্রেম, যাহা প্রেমাস্পদকে মুক্তি দেয়; যে-প্রেমে প্রেমিক ও প্রেমিকা দুইজনে দুইজনকে সেই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে দিয়া, পরস্পরের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকে। আসলে ঐ প্রেম সাধারণ মানবীয় প্রেম নয়—মানুষের অভিধানে যাহাকে প্রেম বলে উহা সেই প্রেম নহে। উহাও একরূপ Platonic Love হইতে পারিত, কিন্তু যেহেতু ঐ প্রেম ব্যতীত অন্যবিধ সম্পর্কে—যেমন বিবাহ সম্পর্কে, অপর কাহারও সহিত মিলনে বাধা নাই, অর্থাৎ, ঐ প্রেম কোন অর্থে-ই একটা বন্ধন নয়—একান্ত মনোগত বলিয়া বাহিরে কোনরূপ একনিষ্ঠার প্রয়োজন নাই, অতএব উহা সেইরূপ Platonic Love ও নয়। উহা আসলে সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিষ্ঠার জয়গান।

রবীন্দ্র-কাব্যের এই প্রথমার্দ্ধে ঐ প্রেমের তত্ত্ব-ঘোষণা ও সার্থক কাব্যরচনা দুইই আছে। ইহার ঠিক পরবর্ত্তী কাব্যধারায় এই সকল আত্মভাবমূলক ভাবনা-কল্পনা যেন হঠাৎ স্থগিত হইয়া গেছে, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই মধ্যবর্ত্তী কালে কবি কতকটা আত্মভাবমুক্ত হইয়া নিছক কাব্যরস, এমন কি, কাহিনী ও নাটকীয় কল্পনা-রসে মগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু পরে—আবার ঐ মানস-ধর্ম্মই আরও তীক্ষ্ণ, ও পরিপক্বরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে এই প্রথমার্দ্ধ কালের সেই স্বাভাবিক উদ্দীপ্তি নাই—তখনকার কবিত্বে নির্ঝরের স্রোতোবেগ নাই—মনের যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত কণ্ঠেরও স্বরলহরী নাই। অতএব, এই আদ্যভাগের পর মধ্য-ভাগটিতে কবিমানসের বিকাশ ভিন্নমুখী হইলেও, শেষের দিকে সেই ভাববীজগুলির পুনরা-বির্ভাবে কবিমানসের বিকাশ একমুখী ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু কাব্যহিসাবে আদি ও অন্তের মধ্যে ঐ প্রভেদ না মানিলে কবির প্রতি অবিচার করা হইবে; তাহাতে কবি-প্রতিভার ঐ স্ফূর্ত্তি—কবিশক্তির ঐ বিশুদ্ধ প্রেরণাকে যথোপযুক্ত গৌরব দেওয়া হইবে না—পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় না দেখিয়া পশ্চিমাকাশের খণ্ড মেঘে অস্তসূর্য্যের বর্ণবিলাসকেই রবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলিয়া গণ্য করা হইবে!

(৪)

আমার এইরূপ আলোচনা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি কবিজীবন ও কাব্যধারায় এইরূপ ছেদ নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞানতঃ একটা অ-শাস্ত্রীয় কাজ করিতেছি। শাস্ত্র যাহাই বলুক, আমি জ্ঞানতঃ অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছুই করিতেছি না; আমি কাব্যের ভিতর দিয়া কবিজীবনের অনুসরণ করিতেছি, কোন একটা শাস্ত্র-বিধি অনুসারে, কবি-মানস ও কাব্যধাবার মত এমন গহন-গভীর বস্তুর মান-চিত্র প্রস্তুত করিতেছি না। কবির ব্যক্তি-মানসের যে একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন কাব্যপ্রেরণার মধ্যেও স্থানে স্থানে প্রকট হইয়াছে তাহা জানি, এবং তাহাকেই প্রাধান্য দান করিলে কবি-জীবন ও কাব্যকে একটা একই সূত্রে বাঁধিয়া দেওয়া সহজ, ইহাও জানি; কিন্তু তাহা রবীন্দ্র-কবির মত এমন রসৈকধর্ম্মী, বৈচিত্র্যকামী কবি-পুরুষের পক্ষে একটা দারুণ বন্ধন হইয়া উঠিবে। আমি যে ব্যক্তি-মানসের পরিবর্ত্তে কবি-মানসের বিকাশ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করিতেছি, তাহাতে ঐরূপ তট পরিবর্ত্তন কিছু অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নহে—বরং তাহা স্বীকার করিয়াই এ কবির কবিমানস ও কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে চাই। এই কার্য্যে আমি যে একটি দুরূহ নীতি অবলম্বন করিয়াছি—পুনরায় তাহা স্মরণ করিতে বলি। বাহির হইতে বা উপর হইতে একটি ঐক্যতত্ত্ব স্থাপন করিয়া, অথবা, কবি নিজেই তাঁহার নানাবিধ আত্মকথায় নিজ কবিজীবন ও কবিতার যে ব্যাখ্যা-সূত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, প্রথমে তাহাই গ্রহণ করিয়া, পরে সেই সূত্রটিকে রবীন্দ্র-কাব্য-মাল্যের ডোর করিয়া যে অতি সুলভ ঐক্যস্থাপনা সম্ভব, আমি তাহা করিব না; যতদূর সাধ্য সংস্কারমুক্তভাবে (কাব্য-সংস্কার ও মানবজীবন সম্বন্ধীয় স্বভাব-সংস্কাব ছাড়া) আমি কবির কাব্যরচনার সাক্ষাৎ-পরিচয় করিতেছি; তাহাতে যতই ভাববিরোধ, চিন্তাবিরোধ, প্রেরণা ও কল্পনার প্রকৃতি-বিরোধ থাকুক না কেন, আমি সেই অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের মধ্যেই কবির কবি চরিত্র, তথা কাব্য-প্রেরণার একটি মূল তত্ত্বে উপনীত হইবার প্রয়াস করিব; সেই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা এখনই করা যাইবে না; কবির কবি-জীবন বা সৃষ্টিশক্তির সকল বিকাশ ও প্রকাশ দেখিয়া লইবার পরে তাহা সম্ভব হইবে। ঐক্যের অভাবই যদি কবির কাব্যলীলার অন্তর্লীন রহস্য হয়, তবে তাহাও একটা বড় তত্ত্ব। কাব্যমাত্রেরই প্রধান প্রেরণা দুইটি—ভাব-প্রেরণা ও রসপ্রেরণা, এই দুইয়ের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য ঘটিলে উৎকৃষ্ট কাব্যের জন্ম হয়। আধুনিক লিরিক কাব্যে ভাবের প্রেরণাই প্রবল, উহা সহজেই একটা বিশিষ্ট কবিমানসের অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি, এ কাব্যে কোথাও ভাব, কোথাও রস মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায়—রবীন্দ্রনাথের মত এতবড় আত্মভাবনিষ্ঠ কবিরও সেই রসপ্রেরণা কালবিশেষে ও কবিতাবিশেষে ভাবকে গৌণ করিয়া তুলিয়াছে, অর্থাৎ ভাবপ্রেরণা রস-প্রেরণার বশীভূত হইয়াছে; এমন বহু স্থানে ঘটিয়াছে; সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ এতবড় আর্টিষ্ট-কবি হইতে পারিয়াছেন। আবার, তাঁহার কাব্যে ঐ কবিমানসেরও অন্তরালে একটি ব্যক্তি-মানস বা ব্যক্তি-পুরুষের নীতি-সংস্কার কোথাও কোথাও উচ্চকণ্ঠে আপনাকে জাহির করিয়াছে। এহেন কবি-পুরুষের কাব্যসৃষ্টিকে কোন একটি বিশেষ মানসধর্ম্মের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ঐ ব্যক্তি-পুরুষটাকেই দেখা হয়—কবি-পুরুষকে দেখা হয় না। ব্যক্তি-মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের

বাহিরে দাঁড়াইয়া ঐরূপ একটা তত্ত্বের সূত্রে যাবতীয় কবিকর্ম্মকে বাঁধিয়া দিতে উৎসুক হইয়াছিলেন; সেই আগ্রহ কবির নয়—ভাষ্যকারের, আত্মচরিত-লেখকের। কিন্তু কবিরূপে তিনি ঐরূপ ঐক্যচিন্তা করেন নাই, কবিতায় কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় দাবি করেন নাই—'জীবন-দেবতা'কে সম্বোধন করিয়া কবি তাহা কবুল করিয়াছেন। তথাপি, কাব্যগুলিতে ঐরূপ ব্যক্তি-চরিত্রের ছায়া যতই সুস্পষ্ট হউক, উহাতে যে একটা স্বতন্ত্র কবি-চরিত আছে, কাব্য-সমালোচনায় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। তাহা যেমন—ঠিক তেমনই অনুসরণ করিতে হইবে।

ঐ কবিমানস সম্বন্ধে আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন; রবীন্দ্রকাব্যে যে কয়েকটি ভাব-বীজের উদ্ভব ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কবিমানস বলিতে স্থূলত: তাহারই সমষ্টি বুঝিতে হইবে; কিন্তু কাব্যের রসসৃষ্টিতে তাহাই কেমন পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে—কোন একই ভাব-বীজ নব নব প্রেরণার বশে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে—আমি তাহাও দেখাইতে ত্রুটি করি নাই। কাব্যপাঠ বা রসনিবেদনের কালে—অর্থাৎ, কবির সহিত প্রকৃত পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে, সেই বিচিত্র রস-রূপ-সন্দর্শনে যেন ব্যাঘাত না ঘটে; যেখানে তাহা ঘটে বা ঘটিয়াছে, সেখানেই কবির কবি-মানস নয়, ঐরূপ একটা ব্যক্তি-মানসই দায়ী, সেই কবিমানস ও ব্যক্তি-মানসে তফাৎ এই যে একটির কারণে কাব্যরসেরই বৈশিষ্ট্য ঘটে; অপরটি কাব্যরসকে অতিক্রম করিয়া আত্ম-প্রচারকে মুখ্য করিয়া তোলে। কবির সেই কবি-মানসকেও তাঁহার ব্যক্তি-মানস কতখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং কবিজীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই প্রভাব কিরূপ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে, তাহারও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি; আমিও উহাকে রবীন্দ্র-কবির কাব্যে সাধারণ অর্থে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা Subjectivity না বলিয়া উগ্র Individualism বা Intrepid Egoism বলিয়াছি, তাহাতে কাব্যের সেই মানবসুলভ হৃদয়ানুভূতি অপেক্ষা ব্যক্তি-মানসের অভিমান উদ্ধত হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তটি এই।

কবি-রবীন্দ্র প্রেমেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-অভিমানকে উচ্চস্থান দিয়াছেন—ঐ স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীনতা না থাকিলে প্রেমও উপাদেয় নয়। এই ভাবমন্ত্রটি 'কড়ি ও কোমল'-এর একটি কবিতায় প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ হইতে দেখি, যথা—

"স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধো না আমায
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

['বন্দী'

ইহার পর 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র প্রেম-কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, তাহাদের প্রেরণামূলে ঐ এক মন্ত্রই আছে—সর্ব্বত্র প্রেমিক-প্রেমিকার সেই প্রখর আত্ম-চেতনা। কিন্তু সে তো প্রথম যৌবনের কবিতা; এইবার বৃদ্ধ কবির 'শেষের কবিতা' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঐ মন্ত্রটি যেন কবিমানসের—'মর্ম্মে বিজড়িত মূল' —একটি দৃঢ় নীতি-সংস্কার। যথা—

ভালবাসার ট্র্যাজেডি ঘটে সেইখানেই, যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না,—নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম। যে মেয়ে

তা' না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত; যে পুরুষ তা' না বোঝে সে যতই টানা হেঁচড়া করে, ততই আসল মানুষটাকে হারায়।"

—শেষের কবিতা, পৃঃ ৮০

ঐ কথাগুলি যে কাহার কথা তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঐ ভালবাসা যে কোন্ বস্তু,—'আসল মানুষটা'ই বা কি, তাহার পক্ষে সাধারণ নর-নারীর প্রেম যে কত ছোট—ঐ কয়টি কথায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "One word is too much profaned—" এমন কথাও তিনি বলেন না। তিনি বলেন, ঐ নামের ঐ বস্তুটাই ছোট,—ব্যক্তি-আত্মার স্বাধীনতা উহাতে নষ্ট হয়; তাই রক্তমাংসের সম্পর্কটাই হেয়। শেলী তাহা বলেন নাই—কেবল, সকল প্রেমই সত্যকার প্রেম নয়, ইহাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যদি কবিমানসের একটা স্থায়ী সংস্কাব হয়, তবে কবি-চরিত-বিচারে যেমনই হোক—কবিতার কাব্যগুণ-বিচারেও কি তাহাকেই প্রামাণ্য করিতে হইবে? অথবা কবির কাব্যে ঐ ধারাটিরই অনুসরণ করিতে হইবে? আমি ঐ মানসধর্ম্মের কথাও স্মরণ রাখিব, এবং উহার ততটুকু অনুসরণ করিব যতটুকু কাব্যের দোষ-বিচাবে আবশ্যক।

কিন্তু ইহার পরেও যে রস-প্রেরণা জয়ী হইয়াছে, তাহাতেই বহু উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট কবিতার জন্ম হইয়াছে। সকল রসসৃষ্টিতে কবিমানসের যে একটি অনিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই তাহার গৌরব; ব্যক্তি-মানসের ছাপ যেখানে যতটুকু থাকুক না কেন, তাহাকেই ধরিয়া যে ধরণের কাব্যবিচার এক্ষণে একটা ফ্যাসন হইয়া উঠিয়াছে—কবি নিজেও তাহার উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহাতে, কাব্যপাঠ না করিয়া কবিকে পাঠ করিতে হয়; অথবা, কবিকেও নয়—কবির সেই সজ্ঞান স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের ব্যক্তি-মানসকে। উহাতেই একটা পূর্ব্বাপর অবিচ্ছিন্ন ধারা আবিষ্কার করা সহজ। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের রস-স্রোতে কবিমানসের যে একটি তরী-বাওয়া আছে, তাহাতে পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—যে কোন দিক্-পবিবর্ত্তন দোষাবহ নয়, বরং তাহাই এ কাব্যের আর্টকে এমন বহু বর্ণ ও বহু আলোকে বিচিত্র করিয়াছে। 'শেষের কবিতা'রই একস্থানে কবি, নায়কের জবানীতে যে একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা যে নিজেরই কবিমানসে কবির একটি চকিত-গভীর দৃষ্টিপাত, তাহাতে সন্দেহ নাই, যথা—

"আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম, তা' হ'লে তার উপর প্রত্যেক চল্‌তি মুহূর্ত্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।" [পৃঃ ২৩

ইহা যে কবির কত বড় গর্ব্ব, তাহা রবীন্দ্র-কবির প্রতি পাঁচ বা দশ-বৎসর অন্তর সেই 'আয়না'খানার মুখ নূতন দিকে ফিরাইয়া দেওয়া—এবং 'চলতি মুহূর্ত্তে'র বা নিয়ত প্রগতিশীল ভাব-জগতের সদ্যতম আলোকরশ্মি তাহাতে প্রতিফলিত করার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখিলে—স্বীকার করিতে হয়। উপরে উদ্ধৃত ঐ উক্তিটি রবীন্দ্র-কবিমানসের পরিচয় হিসাবে অতিশয় মূল্যবান। পরে, কাব্যপাঠশেষে, রবীন্দ্র-কবির কবিমানস তথা কবি-প্রতিভার সমগ্র-পরিচয় স্থাপন করিবার কালে, এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আবশ্যক হইবে। এক্ষণে ঐ উক্তির

সম্পর্কে, আরেকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—উক্তিটি যাঁহার, তিনি আর্টকে জীবনের উপরে স্থান দিয়াছিলেন ; বিশুদ্ধ আর্ট-মন্ত্রের এতবড় সাধক সেকালে আর ছিল না ; তিনিও খাঁটি আর্টপন্থীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"He will realise himself in many forms and by a thousand different ways, and will ever be curious of new sensations and fresh points of view. Through constant change alone, he will find his true unity. He will not consent to be the slave of his own opinions ···what people call insincerity is simply a method by which we can multiply our personalities."

[*Oscar Wilde :* Criticus Artist

তৎসত্ত্বেও ঐ যে একটি ব্যক্তি-মানস, তথা চরিত্র সে সকলের অন্তরালে বিদ্যমান আছে, না থাকিয়া পারে না—তাহার সবিশেষ আলোচনা—কাব্য-বিচারের নয়, কবি-জীবনীর উপযুক্ত বিষয়। কবির কবিশক্তি মন্দীভূত হওয়ার কালে, ব্যক্তি-মানসের ঐ সংস্কারগুলিই শেষের কাব্যগুলিতে অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ আকারে দেখা দিয়াছে, তাহাতে কাব্য অপেক্ষা বাক্যের চমক ও বুদ্ধির বিলাসকলা-কুতূহলই অধিক।

কিন্তু এই 'চিত্রা-চৈতালী'র কালে, এবং ইহার পর, কবি যে ধরণের রস-প্রেরণার বশে যে কাব্যগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কবিকল্পনা একটা ভিন্ন পথে প্রয়াণ করিয়াছে ; তাহার মূল্যবিচারও করিতে হইবে একটা ভিন্ন আদর্শে। এই পরবর্ত্তী কাব্যধারায় কবি নিজের সেই মানসধর্ম্ম বা আত্মগত ভাবনা অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন—'কল্পনা'তেই ইহার আরম্ভ, এবং 'ক্ষণিকা'য় তাহার শেষ—সেখানে ঐ বন্ধন-মুক্তির রসোল্লাস কবিমানসের লীলাকেই একটি অপূর্ব্ব অবলীলায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'চৈতালী' পর্য্যন্ত সেই বন্ধনই—সেই অতি সচেতন মানস-সংস্কারই যে কাব্য-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা কবির সেই একান্ত নিজস্ব কবি-জীবনের রূপে ও রসে যেমন চিন্ময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পূর্ণ-যৌবনের সেই তাজা কবি-প্রাণ যেমন ভাববিধুর হইয়াছে, তেমনটি পরে আর হয় নাই, ইহার পর আমরা রবীন্দ্রকাব্যের আর্ট, বা রসনিপুণতার নিত্যনূতন ঐশ্বর্য্যসম্ভারে মুগ্ধ হইব বটে, কিন্তু হৃদয়-বীণায় সেই একান্ত আত্মবিগলিত গীতিমূর্চ্ছনা আর শুনিব না। ২৪।৫।৫২

বাঙলা সাহিত্যে মোহিতলালের অবিস্মরণীয় দান

প্রবন্ধ ও সমালোচনা

কবি শ্রীমধুসূদন * বঙ্কিম-বরণ * বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস * রবি-প্রদক্ষিণ * কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য * শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র * আধুনিক বাংলা সাহিত্য * সাহিত্য কথা * বাংলার নবযুগ * সাহিত্য বিতান * বাংলা কবিতার ছন্দ * জীবন-জিজ্ঞাসা * বাংলা ও বাঙালী * বাংলা প্রবন্ধ ও রচনা-রীতি * জয়তু নেতাজী

কবিতা

বিস্মরণী

স্মর-গরল

হেমন্ত-গোধূলি

স্বপন-পসারী

ছন্দ-চতুর্দ্দশী

(সনেট-গুচ্ছ)

অনুবাদ

বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়ন

বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন

বিদেশী কাব্য-সঞ্চয়ন (যন্ত্রস্থ)

—: সম্পাদনা :—

অভয়ের কথা ● কাব্য-মঞ্জুষা (ছোট) ● কাব্য-মঞ্জুষা (বড়) [যন্ত্রস্থ]